জুন - জুলাই সংখ্যা ২০২৪

মাসিক ইতিহাস অন্বেষা

(চিন্তাশীল নাগরিকের পথ নির্দেশক)

মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধঃ সম্ভাব্য পরিনাম

চট্টগ্রাম মহানগরের জলাবদ্ধতা সমস্যাঃ সম্ভাব্য সমাধান

- ইসলামী বিশ্ব ও ইহুদী-খ্রীষ্টান ঐক্য
- উত্তরাধিকার আইনে নারীর অবস্থান
- বৌদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্য সহিংসতা
- শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী
- নওয়াব খাজা স্যার সলিমুল্লাহ
- বাংলাদেশে ধর্মীয় কোন্দল
- সিসিলি-ইতালীতে মুসলিম সভ্যতা
- এডামস রিপোর্ট (১৮৩৫-১৮৩৮)

স্মৃতিতে ড. কে এম মোহসীন

যাদের লেখা রয়েছে

- সৈয়দ আশরাফ আলী
- আবদুল হক চৌধুরী
- ড. এম এস জয় প্রকাশ
- অধ্যাপক মোসলেম উদ্দিন শিকদার
- ড. নুরুল ইসলাম মনজুর
- আশফা আহসান হেলেন

ঢাকা থেকে প্রকাশিত গবেষনাধর্মী পত্রিকা মাসিক ইতিহাস অন্বেষার সম্পাদক এস. এম. নজরুল ইসলাম রচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিষয়ক গবেষনাধর্মী ৪টি বই যথাক্রমে সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির সদরে অন্দরে/ খাল কেটে কুমির আনার পরিনাম/ আমাদের উত্থান-পতন: কারন ও প্রতিকার/ ইসলামী পূনর্জাগরনের রূপকার ও রূপরেখা প্রকাশিত হয়েছে।

উক্ত বই সমূহের ভূমিকা লিখেছেন যথাক্রমে ড. এস, এম লুৎফুর রহমান, ড. হাসান মোহাম্মদ, ড. আবু বকর রফিক, ড. আ.ক.ম আবদুল কাদের, ড.বি.এম মফিজুর রহমান আল আযহারী ও এস এম ফুরকানুল্লাহ খলিল।

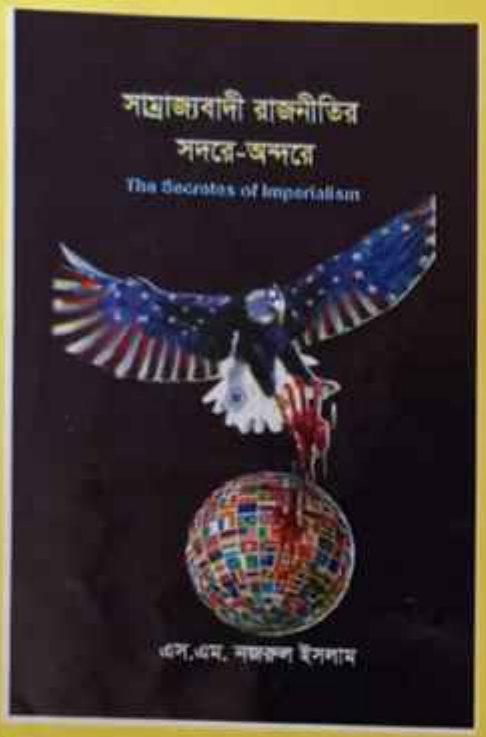

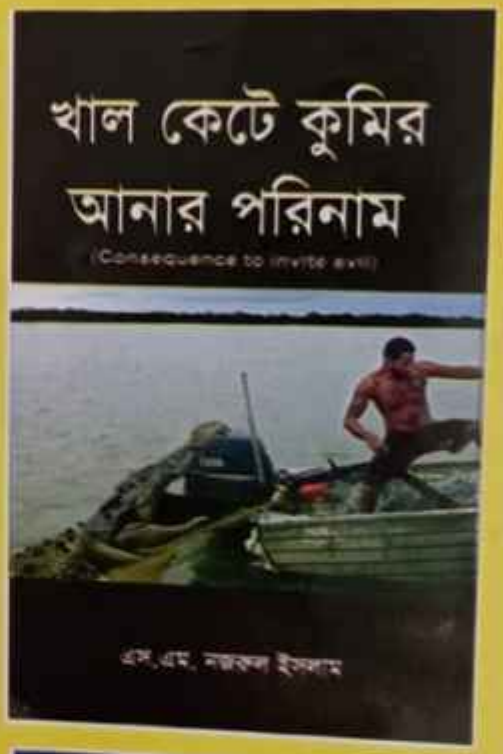

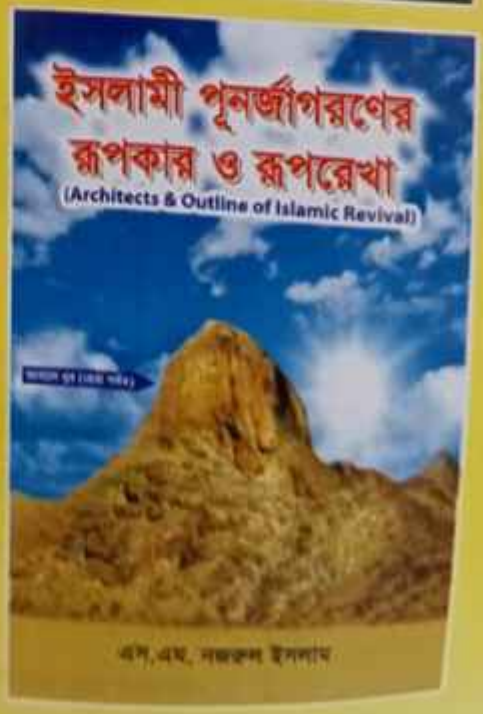

যোগাযোগ ঃ ০১৭১১৭২০৯২৩

মাসিক
ইতিহাস অন্বেষা

২১তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুন-জুলাই ২০২৪

উপদেষ্টা পরিষদ

প্রধান বিচারপতি (অব.) সাইয়েদ জে.আর মোদাচ্ছের হোসেন
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
অধ্যাপক ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী
অধ্যাপক ড. নুরুল ইসলাম মনজুর
প্রফেসর মোসলেম উদ্দিন শিকদার
ডাঃ ফরিদ উদ্দিন আহমাদ

সম্পাদক
এস. এম. নজরুল ইসলাম

সহকারী সম্পাদক
ড. আবদুল মালেক ফরাজী
আছাদুজ্জামান বাবুল

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
জায়েদ এ রেজা

আন্তর্জাতিক সম্পাদক
মাহমুদুল হাসান

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
এম. ওসমান গনি

লেখা পাঠানোর ঠিকানা :
ইউনিসন টাওয়ার
৪৮, নয়াপল্টন (১১ তলা ডান পাশে)
ঢাকা-১০০০।
ই-মেইল : onnesha2004@gmail.com
ফোন : ০১৭১১-৭২০৯২৩

সূচিপত্র

▸ সম্পাদকীয় ২-৫

▸ ইতিহাসের দুঃসময়ে ভারতীয় মুসলমানদের নতুন পথের দিশারী শাহ ওয়ালীউল্লাহ (১৭০৩-৬৩) ৬-৯
ড. নুরুল ইসলাম মনজুর

▸ বানিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রাম মহানগরের জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানের রূপরেখা ১০
এস এম নজরুল ইসলাম

▸ বৌদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্রাহ্মন্য হিংস্রতা তুলনাহীন! ১১-১২
ড. এম, এস, জয় প্রকাশ

▸ অ্যাডামস রিপোর্ট (১৮৩৫-১৮৩৮) ও বাংলার শিক্ষা পরিস্থিতি ১৩-১৯
মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন

▸ ইসলামী বিশ্ব ও ইহুদি-খ্রিস্ট ঐক্য ২০-২৩
মূল : ইয়াসীর নাদিম, ভাষান্তর : শহীদুল ইসলাম ফারুকী

▸ সিসিলি-ইতালিতে মুসলিম সভ্যতা ২৪-২৬
মুহাম্মাদ সিদ্দিক

▸ ইসলাম আধুনিক বিজ্ঞানের জনক ২৭-৩৪
সৈয়দ আশরাফ আলী

▸ বাংলাদেশে ধর্মীয় কোন্দল একটি পর্যালোচনা ৩৫-৩৮
এম ওসমান গনি

▸ উপমহাদেশের মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত নবাব খাজা সলিমুল্লাহ ৩৯-৪০
হাসান বিন নজরুল

▸ চট্টগ্রামের বৌদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য ৪১-৪৩

▸ পাশ্চাত্য সভ্যতার অগ্রগতি ও আমাদের অবস্থান ৪৪-৪৫
আশফা আহসান হেলেন

▸ উত্তরাধিকার আইনে নারীর অবস্থান ৪৬-৪৮
মোঃ নূরুল আমিন

▸ রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন : প্রসঙ্গ বাংলাদেশ ৪৯-৫১

▸ স্মৃতিতে অমলিন প্রফেসর ড. কে.এম মোহসীন (১৯৩৮-২০২১) ৫২-৫৬
অধ্যাপক মোঃ মোসলেমউদ্দীন শিকদার

এস. এম. নজরুল ইসলাম কর্তৃক ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং পিজন প্রিন্টিং প্রেস, ১৮৬ মতিঝিল সার্কুলার রোড, হোটেল আলস হেলাল বিল্ডিং, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।

মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধ ঃ সম্ভাব্য পরিনাম

“ বাঘে ছুঁলে ১৮ ঘা, পুলিশ ছুঁলে ৩৬ ঘা আর বৃটিশ ছুঁলে জন্ম জন্মান্তরের ঘা। ১৮৮৫ সালের পর বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারতীয় হিন্দুদের সহায়তায় বার্মার ইতিহাস, ধর্ম, সংস্কৃতি ও প্রশাসনে রদবদল করে “ডিভাইড এন্ড রুল” পলিসি কার্যকর করে। অতঃপর ধর্মে ধর্মে, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষের বীজ বপন করে যাতে সবাই একে অপরের মুখোমুখী হয়ে আত্মঘাতি গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে অস্তিত্ব সংকটে নিমজ্জিত হয় এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষন অব্যাহত রাখা যায়। তারা কল্পিত- পরিকল্পিত ইতিহাস লিখে জাতিসমূহের মধ্যে স্থায়ী বিরোধ তৈরী করে। একজাতিকে সুবিধা দিয়ে অন্য জাতিকে বঞ্চিত করে, শত্রুতা সৃষ্টি করে। ”

মিয়ানমারের অবস্থান- ২২" ০০' উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯৮" ০০' পূর্ব দ্রাখিমাংশে অবস্থিত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সর্ব উত্তর পশ্চিমের দেশ।

মিয়ানমারের স্থল সীমানা- ৪০৫৩ মাইল। বাংলাদেশের সাথে সীমানা ১৬৮ মাইল। ভারতের সাথে ৯১২ মাইল, চীনের সাথে ১৩২৩ মাইল, থাইল্যান্ডের সাথে- ১৫০১ মাইল এবং লাওস এর সাথে ১৪৮ মাইল। উত্তর ও উত্তর পূর্ব চীন, পূর্ব থাইল্যান্ড, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমে আন্দামান সাগর ও বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে বাংলাদেশ এবং উত্তর পশ্চিমে ভারত।

উত্তর-দক্ষিণে দেশটির দৈর্ঘ্য ১২৭৫ মাইল পূর্ব- পশ্চিমে সর্বোচ্চ প্রস্থ- ৫৮০ মাইল।

মিয়ানমারের আয়তন- ২,৬১,২২৮ বর্গমাইল।

জনসংখ্যা-

২০২৩ সালের হিসাব অনুযায়ী মিয়ানমারের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৬ কোটি । ১৯৩১ সালের বৃটিশ সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী জনসংখ্যা ১৩৫ টি জাতিগোষ্ঠিতে বিভক্ত। যাদের ভাষা সংখ্যা ১২৫ টি। বামার বা বর্মীরা সংখ্যাগরিষ্ট। বামারদের ৭টি বড় অঞ্চল নিয়ে ৭টি বিভাগ এবং ৭টি জাতিগত সংখ্যালঘুদের রাজ্য রয়েছে। এছাড়া রয়েছে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল Nay Pyi Taw (নেপিডো)।

মিয়ানমারের ইতিহাস-

মিয়ানমারের প্রাচীন অধিবাসী ছিল তিব্বতীয় বর্মন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী। তারা পাইয়ু নগর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল, নবম শতকে এই গোষ্ঠীর উপগোষ্ঠী বামার জনগোষ্ঠী আলাদা হয়ে (প্যাগান) বেগান রাজ্য (১০৪৪-১২৮৭) স্থাপন করে। দিগ্বিজয়ী সম্রাস চেঙ্গিস খানের পৌত্র চীন সম্রাট কুবলাই খানের ইউনান প্রদেশের শাসনকর্তার ছেলে সেনাপতি নাসিরউদ্দিন ১২০০০ (বার) হাজার অশ্বারোহী ও তীরন্দাজ সৈন্য নিয়ে ১২৮৭ সালে পাইয়্যু নগর রাষ্ট্র ও প্যাগান রাজ্য দখল করেন। এ বাহিনীতে বিপুল সংখ্যক মুসলমান ও তাতার ছিল। সূত্র- The book of Sir Marco Polo by yule, Page-11, 99) এ সেনাবাহিনীর বর্তমান বংশধরগন পান্থাই চাইনীজ মুসলিম ও বার্মিজ চাইনিজ নামে অভিহিত। ৭ম শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত আরাকান থেকে থাইল্যান্ডের সাবেক রাজধানী অযোধ্যা পর্যন্ত সকল শহরের ধনাঢ্য ব্যবসায়ীরা ছিল আরবী, ফার্সী, তুর্কী ও ভারতীয় মুসলিম। এদেরকে বার্মায় পথি বা কালা বলা হয়।

১৮ শতকে টাংগু রাজবংশ (১৭৫২-১৮৮৫) বৃহৎ বার্মা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ১৮ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কনবাউং বংশ (১৭৫২-১৮৮৫) বার্মার ক্ষমতা দখল করে। এ রাজবংশ ১৭৮৫ সালে আরাকান (রাখাইন) দখল করে। আরাকানের অনেক মুসলিম (রোহিংগা) এবং মগ (মারমা) চট্টগ্রামের বৃটিশ শাসকের আশ্রয় গ্রহণ করে। উল্লেখ্য, নবাব মীর কাসিম বাংলার ক্ষমতা লাভের জন্য হুগলী ও চট্টগ্রাম বন্দর এর মালিকানা ইংরেজদের নিকট হস্তান্তর করে ১৭৬০ সালে। চক্রান্তকারী বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী শরনার্থী মুসলিম ও মারমাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিয়ে বার্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করে বার্মাকে দুর্বল করে ফেলে। এমতাবস্থায় ইংরেজগন ১৮২৪-২৬, ১৮৫২, ১৮৮৫ সালে তিনটি যুদ্ধের মাধ্যমে আরাকান ও বার্মা দখল করে।

বাঘে ছুঁলে ১৮ ঘা, পুলিশ ছুঁলে ৩৬ ঘা আর বৃটিশ ছুঁলে জন্ম জন্মান্তরের ঘা। ১৮৮৫ সালের পর বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারতীয় হিন্দুদের সহায়তায় বার্মার ইতিহাস, ধর্ম, সংস্কৃতি ও প্রশাসনে রদবদল করে “ডিভাইড এন্ড রুল” পলিসি কার্যকর করে। অতঃপর ধর্মে ধর্মে, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষের বীজ বপন করে যাতে সবাই একে অপরের মুখোমুখী হয়ে আত্মঘাতি গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে অস্তিত্ব সংকটে নিমজ্জিত হয় এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষন অব্যাহত রাখা যায়। তারা কল্পিত- পরিকল্পিত ইতিহাস লিখে জাতিসমূহের মধ্যে স্থায়ী বিরোধ তৈরী করে। একজাতিকে সুবিধা দিয়ে অন্য জাতিকে বঞ্চিত করে, শত্রুতা সৃষ্টি করে। ধর্মীয় ফেরকা তৈরী করে, সংস্কৃতিতে ভেজাল মিশ্রন করে। খ্রীষ্টান মিশনারীরা প্রশাসনিক প্রভাব খাটিয়ে এবং অর্থের লোভ দেখিয়ে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহের সদস্যদের খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করে এবং তাদেরকে সংখ্যাগুরুদের সাথে দ্বন্দ্ব সংঘাতের জন্য প্রস্তুত করে। সংখ্যাগুরুদেরকে বিভিন্ন মতবাদে দীক্ষিত করার মাধ্যমে বিভাজন তৈরী করে। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুদের অর্থ দিয়ে চরিত্রহীন করে অতঃপর তাদের দিয়ে নিজ নিজ জাতির সর্বনাশ সাধন

করে। বৃটিশরা মিয়ানমার সহ তাদের সকল উপনিবেশে এসব অপকর্মের বিষবৃক্ষ রোপন করেছে। এজন্যই যেসব দেশ এক সময় বৃটিশ উপনিবেশ ছিল সেসকল দেশের মধ্যে এখনও বিশৃঙ্খলা- হানাহানি ও গৃহযুদ্ধ হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে।

জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেওয়ার পর খুব দ্রুত চীন থেকে বার্মা পর্যন্ত সকল জনপদ দখল করে নেয়। এমতাবস্থায় বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করার পর মুসলমানসহ বার্মার অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলিকে স্বাধীনতা দেওয়ার শর্তে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাজে লাগায়। অপরদিকে সংখ্যাগুরু বামারগন একই ধর্মের জাপানের পক্ষে যুদ্ধে করে। ফলে সমগ্র বার্মায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বনাম বামারদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়। বিশ্বযুদ্ধের পর বার্মার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন বামার জাতিগোষ্ঠীর অংসান। তিনি ছিলেন উদার ও বৃটিশবিরোধী। তিনি বার্মা আরাকানের সকল জাতিগোষ্ঠীকে নিয়ে দেশ গঠনের লক্ষ্যে একটি চুক্তির দ্বারপ্রান্তে উপনীত হন। চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বেই বৃটিশ ষড়যন্ত্রে তিনি নিহত হন। এমতাবস্থায় ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারী বৃটেন বার্মাকে স্বাধীনতা প্রদান করে পাশ্চাত্য পন্থী উ-নুকে সরকার গঠন করার সুযোগ দেয়। সকল ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সাথে প্রতারনা করে তাদের এলাকাও বার্মার অধীনস্থ করে দেওয়া হয়। ইহাই বার্মার গৃহযুদ্ধের প্রধান কারন। বৃটেনসহ পাশ্চাত্যের লক্ষ হল- বার্মা, ভারতের সেভেন সিস্টার ও বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলা, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার নিয়ে একটি আলাদা খৃষ্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এবং এই রাষ্ট্র থেকে ভারত ও চীনকে অস্থিতিশীল করা, বার্মার সংখ্যাগুরু বামার জাতির ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠির উপর জুলুম অবিচার ছাড়াও আরও যেসব কারনে ২০২১ সাল থেকে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে তা নিম্নরূপ-

নাগরিকত্ব নিয়ে চক্রান্ত

১। Last published British census of Burma- 1931 এ ত্রুটিপূর্ণ ভাবে মিয়ানমারের ১৩৫ জাতিগোষ্ঠি থাকার কথা বলা হয়েছে বাস্তবে এ সংখ্যা অনেক কম।

২। ১৯২১ এর ব্রিটিশ সেনসাস ২১ এ বার্মায় ১২৫ টি ভাষাভাষীর বসবাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বার্মার প্রশাসনিক বিভাগ-

জাতিগত নামে মনোনীত রাজ্য- ৭টি

ভৌগলিক নামে সংখ্যাগুরু বামারদের অঞ্চল- ৭টি

NRC তে প্রদত্ত ঘোষনা মোতাবেক বর্তমান মিয়ানমারে আঞ্চলিক সরকার সমূহের ২৯ জন 'জাতি বিষয়ক মন্ত্রী রয়েছে।

১। সরকার কাচিন নৃগোষ্ঠীকে ১২ গ্রুপে বিভক্ত করেছে। কাচিনদের দাবী তাদের গ্রুপ ৬টি।

২। সরকার কারেন নৃগোষ্ঠীকে ৯ গ্রুপে ভাগ করেছে। কারেনদের দাবী তাদের গ্রুপ সংখ্যা- ৫টি।

৩। চীন নৃ-গোষ্ঠীকে সরকার ৫৩ উপগ্রুপে ভাগ করেছে অথচ তাদের মোট জনসংখ্যা সর্বমোট ১০ লাখ।

৪। বৃটিশ সেন্সাস ঘোষিত ১৩৫ নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর মধ্যে চায়নিজ মুসলিম স্থানীয় নাম পান্থই, এংলো বার্মিজ, ইন্ডিয়ান বার্মিজ, গুর্খা, পাকিস্তানী ও রোহিঙ্গাদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।

৫। ২০১৪ সালের সেন্সাস রিপোর্টে ত্রুটিপূর্ণভাবে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন গোত্রের অন্তর্ভূক্ত দেখানো হয়েছে যাতে উক্ত ব্যক্তি নিজ গোত্রের প্রতিনিধি হিসাবে ভোট প্রয়োগ করতে না পারে।

৬। ১৯৮৯ সালের সামরিক সরকার সাংবিধানিক সরকার স্থগিত করে নতুন ভাবে ৬টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নামে ৬টি স্বায়ত্বশাসিত প্রশাসনিক এলাকা গঠন করে। এগুলি হল, দানু, কোকার, নাগা, পালাউংগ, পা-ও এবং, ওয়া এতে এসব এলাকার বৃহৎ গোত্রগুলি পরিচয়হীনতার সংকটে পড়ে।

৭। ১৯৬২ সালের সামরিক সরকার জাতীয় নিবন্ধন কার্ড (NRC) পাওয়ার পূর্বশর্ত হিসেবে "সাময়িক পরিচয়পত্র সনদ (TRC) পাওয়াকে বাধ্যতামূলক করে। ১৯৫১ সালের Residents of Burma Registration Rule এর অধীনে TRC প্রদান করা রেকর্ড কিপারের মর্জির উপর নির্ভর করে।

৮। ১৯৭০ সালে সব রোহিঙ্গাদের N.R.C দেওয়া হয় কিন্তু ১৯৭৪ সালে সরকার সামরিক অভিযান পরিচালনা করে। এসময় সেনাবাহিনী হাজার হাজার রোহিঙ্গার NRC কার্ড কেড়ে নিয়ে তাদেরকে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী বা বিদেশী আখ্যা দেয়।

৯। ১৯৮১ সালের সামরিক সরকার N.R.C এর পরিবর্তে গোলাপী কার্ড বা তদন্ত কার্ড ব্যবস্থা চালু করে। রোহিঙ্গারা তাদের N.R.C কার্ড সরকারের নিকট জমা দিয়ে গোলাপী কার্ড পাওয়ার আবেদন করলে তাদেরকে গোলাপী কার্ডের পরিবর্তে সাদা কার্ড (Temporary Registration Card- T.R.C) দেওয়া হয়। এই কার্ডের নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে। মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে এটি রিনিউ করতে হয়। সাধারণত সাধারণ নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে রিনিউর আবেদন জমা নেওয়া হয়। এ ব্যবস্থায় এসব লোক ভোট দিতে পারে না, তদুপরি এদের অনেকের কার্ড পূনরায় নবায়ন না করে অনুপ্রবেশকারী আখ্যা দেওয়া হয়।

১০। মিয়ানমারে যেসব পরিচয়পত্র চালু রয়েছে সেগুলি হল- N.R.C, T.R.C গ্রীন কার্ড, N.S.C ও G. C. C সরকার তার সুবিধামত Temporary Registration Card (T.R.C) National Searching card (N.S.C) Guest Citizenship card (G.C.C) ও গ্রীন কার্ড ধারীদের ভোট দেওয়ার পারমিশন দেয় অথবা দেয়না। এই চার প্রকারের কার্ডধারীরা পূর্ণ নাগরিক হিসেবে গন্য হয়না।

১১। ২ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ সালে বার্মার পার্লামেন্ট রেফারেম আইন-২০১৫ পাস করে। এতে T.R.C ধারীদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রদান করা হয়। কিন্তু বিলটি প্রেসিডেন্ট স্বাক্ষর করার পর ১১ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখে প্রেসিডেন্ট থিন সেইন ঘোষনা করেন যে, "৩১ মার্চের মধ্যে সকল সাদা কার্ডের মেয়াদ শেষ হবে। ফলে নভেম্বর ২০১৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে সাদা কার্ডধারীর আর ভোট দিতে পারবেনা। এর মাধ্যমে তিনি পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তকেই বাতিল করলেন।

কয়েকমাস পর প্রেসিডেন্ট সংবিধান সংশোধনে একটি রেফারেন্ডাম এর আয়োজনের ঘোষনা দিলেন। প্রেসিডেন্টের পক্ষ বিজয়ী হওয়ার লক্ষ্যে রোহিঙ্গাদের জন্য "সবুজ কার্ড" প্রদানের ঘোষনা দিলেন যাতে তারা ভোট দিতে পারে। ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা ঘোষনা দিলেন সবুজ কার্ডধারীরা নাগরিকত্বের আবেদন করতে পারবে। এ ঘোষনায় ক্ষুব্দ হয়ে মগদের রাখাইন ন্যাশনাল পার্টি, রাখাইনের বৌদ্ধ সংঘ এবং অংসান সুচির এন, এল, ডি পার্টি বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। NLD দলে অবস্থানরত ২০ হাজার সাদাকার্ডধারীদের দল থেকে বহিস্কার করা হয়। অন্য রাজনৈতিক দলগুলিও একই পন্থা অনুসরন করে।

১২। মানচিত্র নিয়ে রাজনীতি

হিউমান রাইটস ওয়াচ এর মতে ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সেনা অভিযানের সময় তাদের ৪০০ গ্রাম ধ্বংস করা হয়। ভূ-উপগ্রহের ছবি বিশ্লেষন করে তারা জানিয়েছে ধ্বংস করা গ্রামগুলির মধ্যে অন্তত একডজন গ্রামের নাম বর্তমান মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে।

১৩। নির্বাচিত অং-সান সূচীকে ক্ষমতাচ্যুত করা বর্তমান গৃহযুদ্ধের কারন হলেও এর মূল প্রোথিত রয়েছে বৃটিশ ও পাশ্চাত্যের চক্রান্তের মধ্যে।

মিয়ানমারের জাতিগত সশস্ত্র সংগঠন সমূহের তালিকা

নাম	সংক্ষিপ্তরূপ	প্রতিষ্ঠাকাল	শক্তি
১। আরাকান আর্মি	এ এ	২০০৯	৩০,০০০ (২০২১)
২। আরাকান আর্মি (কায়ান রাজ্য)	এ এ (কায়ান)	২০১০	১০০ (২০১৬)
৩। অল বার্মা স্টুডেন্ট ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট	এবি,এফ,ডি,এফ	১৯৮৮	৬০০ (২০১৬)
৪। আরাকান লিবারেশন আর্মি	এ, এল,এ	১৯৬৮	৬০-১০০ (২০১৬)
৫। রোহিংগা স্যালভেশন আর্মি	আরসা	২০১৩	২০০ (২০১৮)
৬। বামার পিপলস লিবারেশন আর্মি	বি,পি,এল	২০২১	(অজনা)
৭। ডেমোক্রেটিক কারেন বুডিষ্ট আর্মি ব্রিগেড	ডি কেবিএ-৫	২০১৩	৭০০০ (২০১২)
৮। কাচিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্মি	কে,আই,এ	১৯৬১	১২০০০ (২০১৬)
৯। কারেন ন্যাশনাল ডিফেন্স অর্গানাইজেশন	কে,এন,ডি,ও	১৯৪৭	অজানা
১০। কারেন ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি	KNLA	১৯৪৯	৭০০০ (২০১২)
১১। কারেননি আমি	K A	১৯৪৯	১৫০০ (২০১২)
12| KNU IKNLA Peace Council	KPC	২০০৭	২০০+(২০১৬)
নাম	সংক্ষিপ্তরূপ	প্রতিষ্ঠাকাল	শক্তি
১৩। কুকি ন্যাশনাল আর্মি	KNA(B)	১৯৮৮	২০০+২০১৬
১৪। লাহু ডেমোক্রেটি ক ইউনিয়ন	LDU	অজানা	অজানা
১৫। মন ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি	MNLA	১৯৫৮	৩-৫ হাজার (২০১৬)
১৬। মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটি ক এলায়েন্স আর্মি	MNDAA	১৯৮৯	২-৪ হাজার (২০১৬)
১৭। মিয়ানমার রয়াল ড্রাগন আর্মি	MRDA	২০২২	অজানা
১৮। ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক এলায়েন্স আর্মি	NDAA	১৯৮৯	৩-৪ হাজার (২০১৬)
১৯। ন্যাশনাল সোশালিষ্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যান্ড	NSCN-K	১৯৮০	৫০০ (২০১৬)
২০। পিপলস ডিফেন্স ফোর্স	PDF	২০২১	৫০ হাজার (২০২২)
২০। পিপলস লিবারেশন আর্মি	PLA	২০২১	অজানা
২১। পা-ও ন্যাশনাল আর্মি	PNA	১৯৪৯	অজানা
২২। পা-ও ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি	PNLA	২০০৯	৪০০+(২০১৬)
২৩। রোহিংগা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন	RSO	১৯৮২	অজানা
২৪। শাননি ন্যাশনালিটিস আর্মি	SNA	২০১৬	১০০০+ (২০১৯)
২৫। শান স্টেট আর্মি (উত্তর)	SSA-N	১৯৭১	৮০০০+(২০১৬)
২৬। শান স্টেট আর্মি দক্ষিণ	SSA-S	১৯৯৬	৮০০০+(২০১৬)
২৭। তাংগ ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি	TNLA	১৯৯২	৩৫০০+ (২০১৬)
২৮। ইউনাইটেড ওয়া স্টেট আর্মি	UWSA	১৯৮৯	২৫০০০+(২০১৫)
২৯। ওয়া ন্যাশনাল আর্মি	WNA	১৯৬৯	২০০+(১৯৯৮)
৩০। জুমি রেভ্যুলুশানারী আর্মি	ZRA	১৯৯৭	৩০০০+(২০১৬)
৩১। আরাকান রোহিঙ্গা ইসলামীক ফ্রন্ট	ARIF	১৯৮৬	অজানা
৩২। পিপলস ডিফেন্স টি ম	PDT	অজানা	অজানা

ব্রিটিশ আমলেই মিয়ানমারের খ্রীষ্টান অধ্যুষিত কারেন, কাচিন, চিন জাতিগোষ্ঠীগুলির গেরিলা সংগঠন ছিল। কথা ছিল বৃটেন থেকে স্বাধীন হওয়ার পর বার্মায় ফেডারল সরকার হবে এবং জাতিগোষ্ঠিগুলি নিজ নিজ এলাকায় স্বায়ত্বশাসন ভোগ করবে। এ মর্মে বার্মার স্বাধীনতাকামী নেতা অং-সান একটি চুক্তিপত্র প্রস্তুত করেছিলেন। চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে তিনি নিহত হলে বৃটেন সংখ্যাগুরু বামারদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে দেশত্যাগ করে। পরবর্তীতে বামার জাতিগোষ্ঠী অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর প্রতি বৈরী আচরন শুরু করলে ১৯৪৮ সাল থেকেই কারেন, কাচিন ও চীন জাতিগোষ্ঠী সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে। বার্মা সরকার কখনও এদের দমাতে পারেনি। এদের পরবর্তীতে বিভিন্ন ইস্যুতে বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীও গেরিলা গ্রুপ গঠন করে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এমতাবস্থায় ২০২১ সালে সংখ্যাগুরু বামার জাতিগোষ্ঠীর নেত্রী অং-সান সুচীকে সেনাবাহিনী ক্ষমতাচ্যুত করলে বামার জাতির একাংশ গেরিলাদল গঠন করে। এরপর কারেন, কাচিন- চিন, রাখাইন ও বামারদের গেরিলা দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে পিপলস্ ডিফেন্স ফোর্স বা পি,ডি,এফ গঠন করে দেশজুড়ে সরকারি বাহিনীর উপর হামলা শুরু করে। ইতিমধ্যে পি,ডি,এফ দেশের ৮৬ শতাংশ ভূমির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। পি,ডি,এফ পাশ্চাত্যপন্থী ও মুসলিম বিরোধী। এমতাবস্থায় বার্মার মুসলমানগন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে জান্তা সরকারের পক্ষাবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে।

বার্মা নিয়ে পাশ্চাত্যের চক্রান্তের চারটি প্রধান লক্ষ্য রয়েছে। যথা ১) মিয়ানমার, ভারতের ৭ বোন রাজ্য ও বাংলাদেশের বৃহত্তর চট্টগ্রাম এলাকার খ্রীষ্টানদের নেতৃত্বে ইসরাইলের মত একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। ২) চীনের তলপেটে আঘাত করা। ৩) ভারত ও বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করা। ৪। বার্মাকে ভেঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

চীন গভীর সংকটে

বার্মার বর্তমান সংকটের বিষবৃক্ষ রোপন করেছে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃটেনের পতন ও যুক্তরাষ্ট্রের উত্থানের পর যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ সম্মিলিতভাবে এই সংকট বিস্তারে নিরলস কাজ করেছে। খ্রীষ্টান মিশনারীরা অব্যাহতভাবে বার্মা, বাংলাদেশ ও ভারতে ধর্মান্তর প্রক্রিয়া চালু রেখে নিজেদের দলভারী করেছে এবং বিশৃংখলায় ইন্ধন দিয়েছে। ২০২১ সালের পূর্বে চীন শুধুমাত্র বার্মার ক্ষমতাসীন সরকারকে সাহায্য করত। সম্মিলিত গেরিলাগোষ্ঠী পি.ডি.এফ গঠিত হলে চীন মিয়ানমার সরকার ও গেরিলাগোষ্ঠী উভয়পক্ষের প্রতি সহযোগীতা শুরু করে। এতেও চীনের শেষ রক্ষা হচ্ছেনা। কেননা সম্মিলিত গেরিলাগোষ্ঠী দীর্ঘদিন যাবত পাশ্চাত্যের সহায়তা পেয়েছে, তদুপরি খ্রীষ্টান মিশনারীরা বহুসংখ্যক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে সুযোগ সুবিধা দিয়ে নিজেদের পক্ষে এনেছে। এমতাবস্থায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে চীন যা করতে পারে তা হল-

১। মিয়ানমারের সব জাতিগোষ্ঠীর মধ্য থেকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনবল সংগ্রহ করে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক ও সামরিক প্লাটফরম সৃষ্টি করা যারা পাশ্চাত্যপন্থী গেরিলাগোষ্ঠীকে প্রতিহত করতে পারবে।

২। বর্তমান সামরিক সরকারকে জনবান্ধব হতে বাধ্য করা।

৩। বাংলাদেশ ও এর বাইরে থাকা রোহিঙ্গাদের রাখাইনে পুনর্বাসন করে তাদেরকে শক্তিশালী অবস্থানে প্রতিষ্ঠা করা যাতে তারা পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে চীনের সহযোগী হয়।

৪। মিয়ানমারের সকল জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বশীল কেন্দ্রীয় ফেডারেল সরকার প্রতিষ্ঠা করা। অন্যথায় মিয়ানমার যুগোস্লাভিয়ার ভাগ্য বরন করবে।

ভারতের লুক ইষ্ট পলিসি মিয়ানমারের সংকটের কারনে বাধাগ্রস্থ হবে। মিয়ানমার সীমান্তে ভারতের জবরদখল করা ৪টি রাজ্য রয়েছে সেগুলি হল মিজোরাম, মনিপুর, নাগাল্যান্ড ও অরুনাচল। এসব রাজ্যে অনেকগুলি ভারতবিরোধী গেরিলাদল রয়েছে। শুধুমাত্র মনিপুরেই ৩৪টি গেরিলাগ্রুপ রয়েছে। এসব গেরিলারা মিয়ানমারের গেরিলাদের সাথে অনেকভাবে যুক্ত। মিয়ানমারে যদি গেরিলারা সফল হয় তাহলে ভারত তার জবরদখল করা ৭টি রাজ্য হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ভারত বার্মা সরকারকেই সহযোগীতা করছে। কোনভাবেই ভারত এ সংকট থেকে বের হতে পারবে বলে মনে হয় না।

ভারতের সংকট-

ভারতের লুক ইষ্ট পলিসি মিয়ানমারের সংকটের কারনে বাধাগ্রস্থ হবে। মিয়ানমার সীমান্তে ভারতের জবরদখল করা ৪টি রাজ্য রয়েছে সেগুলি হল মিজোরাম, মনিপুর, নাগাল্যান্ড ও অরুনাচল। এসব রাজ্যে অনেকগুলি ভারতবিরোধী গেরিলাদল রয়েছে। শুধুমাত্র মনিপুরেই ৩৪টি গেরিলাগ্রুপ রয়েছে। এসব গেরিলারা মিয়ানমারের গেরিলাদের সাথে অনেকভাবে যুক্ত। মিয়ানমারে যদি গেরিলারা সফল হয় তাহলে ভারত তার জবরদখল করা ৭টি রাজ্য হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ভারত বার্মা সরকারকেই সহযোগীতা করছে। কোনভাবেই ভারত এ সংকট থেকে বের হতে পারবে বলে মনে হয় না।

বাংলাদেশের সংকট

পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নিজ দেশের স্বার্থের চেয়ে ভারতের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করে। তদুপরি বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে খাদের কিনারায় অবস্থান করছে। মিয়ানমারের জান্তা সরকার যেরূপ জনসমর্থনহীন বাংলাদেশ সরকার ও প্রশাসন সেরূপ গণসমর্থনহীন। এরপরও দেশের অখন্ডতা অটুট রাখতে বাংলাদেশ যা করতে পারে তা হল-

১। চীনের সহায়তা নিয়ে দ্রুত রোহিঙ্গাদের রাখাইনে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা। বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার পর যদি তাদের রক্ষণাবেক্ষন ও শিক্ষার ভার নিজ দায়িত্বে নিত তাহলে রোহিঙ্গারা হত বাংলাদেশের সম্পদ কিন্তু আমাদের ভুলনীতির কারনে বেশীরভাগ রোহিংগা এখন পাশ্চাত্যের সম্পদে পরিণত হয়েছে। এমতাবস্থায় রোহিঙ্গাদের দ্রুত রাখাইনে পাঠানোর ব্যবস্থা করা জরুরী।

২। কক্সবাজার, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটির সামরিক বেসামরিক প্রশাসনের নীতিনির্ধারনী পর্যায়ে দেশপ্রেমিক, দক্ষ ও কুটনৈতিক জ্ঞান সম্পন্ন কর্মকর্তাদের দায়িত্ব প্রদান করা আবশ্যক যাতে তারা প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নিষ্ঠার সাথে পালন করে। রোহিঙ্গাদের সাথে সম্পর্ক তৈরী করতে পারে এবং বিদেশী চক্রান্ত নস্যাত করতে পারে।

৩। রোহিঙ্গাদের মধ্যে যারা ক্যাম্পে রয়েছে তাদের মধ্য থেকে শিক্ষিত ও ধর্মীয় মুল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তদুপরি বহির্বিশ্বে যেসব জ্ঞানী রোহিঙ্গা নেতা রয়েছেন তাদের সাথে ভাল সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

৪। তিন পার্বত্য জেলায় বিদেশী মদদপুষ্ট যেসব গোষ্ঠী রয়েছে তাদের অপতৎপরতা তাৎক্ষনিক দমন করা প্রয়োজন।

৫। অর্থনৈতিক,রাজনৈতিক বা অন্য কোন কারনে বাংলাদেশ যদি অস্থিতিশীল হয় সেক্ষেত্রে ভারতের যেসব রাজ্যের স্বাধীনতাকামী দলের নেতাদেরকে আমরা ভারতের হাতে তুলে দিয়েছি তারা এদেশে প্রতিশোধমুলক হামলা চালাতে পারে। এজন্য সরকারকে সজাগ থাকতে হবে। এছাড়াও ভারতের বিদ্রোহপ্রবন রাজ্যসমূহের বিদ্রোহ দমনে ভারত যদি বাংলাদেশ ভূখন্ড ব্যবহার করে তবে যুদ্ধ বাংলাদেশে প্রবেশ করবে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার অগ্রগতি ও আমাদের অবস্থান

আশফা আহসান হেলেন

গোলামী অর্থ কারো প্রতি দাসত্ব স্বীকার করা। আর মানসিক গোলামী হচ্ছে এর চেয়েও মারাত্মক গোলামী। কারণ তা সমগ্র মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রণ করে কারো গোলাম (দাস) হয়ে থাকতে নির্দেশ দেয় কারণে বা অকারণে। ব্যক্তির একক গোলামী ধীরে ধীরে ব্যাধি সংক্রমিক হয়ে সমগ্র জাতিকে এই ব্যধিতে আক্রান্ত করতে পারে এবং এই ব্যাধি থেকে তারাই মুক্ত যারা বিপুলভাবে মানসিক শক্তির অধিকারী। দেখা গেছে কোন জাতি যখন মানসিক শক্তিতে বিপুলভাবে উন্নতি লাভ করে তখন অন্যান্য জাতি স্বভাবতই তার চিন্তাদর্শের প্রতি ঈমান অন্য অর্থে দাসত্ব পোষন করে। তখন সেই উন্নত জাতির ভালো মন্দ, ন্যায় অন্যায় সবই দুর্বল মানসিকতা সম্পন্ন জাতিদের নিকট প্রধান মানদন্ড বলে বিবেচিত হয়। কারণ মানসিক শক্তির আধার তখনই হওয়া সম্ভবপর যখন কোন জাতি চিন্তা, জ্ঞান ও গবেষণার প্রতিযোগিতায় উর্ধে অবস্থান করে বৈষয়িক প্রগতিতে সমৃদ্ধি অর্জন করে। এক্ষেত্রে বর্তমানে পাশ্চাত্যের জাতিকে, সভ্যতাকে সর্বোৎকৃষ্ট বলে ধরা হয়। বর্তমানে খ্রীষ্ট সভ্যতা, নীতিকে সব কিছুরই মানদন্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ঠিক তেমনি পূর্বে মুসলমানরা যতদিন সত্যানুসন্ধিৎসা ও জ্ঞান সাধনার পথে অগ্রসর হচ্ছিল দুনিয়ার সমগ্র জাতি তাদের অনুসরণ ও অনুবর্তন করেছিল। তখন মুসলমান সভ্যতায় ইসলামের সকল উপাদানই বিশ্বের সকল জাতির নিকট একমাত্র মানদন্ডরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। সময়ের সাথে ধীরে ধীরে মুসলমান চিন্তানায়ক ও গবেষকের আবির্ভাব কমবার সাথে সাথে দুনিয়ার নেতৃত্ব থেকে মুসলমান সভ্যতাও ধীরে ধীরে মুছে যেতে থাকলো এবং অপর দিকে সেই দুর্বল মুহুর্তের সুযোগটুকু পাশ্চাত্য জাতি গ্রহণ করে এবং জ্ঞান গবেষণা, বিজ্ঞানে প্রভুত উন্নতি লাভ করে। চার পাঁচ শতক পর্যন্ত মুসলমানেরা তাদের পূর্বপুরুষদের বিছানো সুখ শয্যায় যখন নিদ্রিত তখন পাশ্চাত্য জাতি উন্নয়ন দ্বারা পাশ্চাত্য শক্তির অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সারা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ল।

এভাবে মুসলমান সভ্যতা ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য সভ্যতা দ্বারা অধিকৃত হলো এবং তাদের সভ্যতা সাংস্কৃতি সারা বিশ্বের সভ্যতা ও বিশুদ্ধতার মানদন্ডে পরিণত হলো। ততদিনে মুসলমানেরা আবার সচকিত হয়ে উঠলেও তাদের দল এতই দুর্বল ছিল যে, প্রতিরক্ষার মোকাবিলায় তারা পরাজয় বরণ করলো। এভাবে পৃথিবীর বুকে নেতৃত্বদানকারী মুসলমান সভ্যতাও বিশুদ্ধতার প্রধান মানদন্ড হিসেবে তার স্থান হারাল। এখন আলোচনার বিষয় হলো বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা, সত্যতা, বিশুদ্ধতা, ন্যায়ের প্রধান মানদন্ডের স্বরূপ জানা। পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্ম হয় ধর্মের সাথে সংঘর্ষের মাধ্যমে। যে দর্শন ও বিজ্ঞানের কোলে পাশ্চাত্য সভ্যতা লালিত হয়েছে পাঁচ ছয় শতক ধরে তা শুধু নাস্তিকতা, ধর্মদ্রোহিতা ও বস্তুতান্ত্রিকতায় পরিপূর্ণ। জগতের প্রতিটি বিষয় বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখা ও বিশ্লেষণ করাই পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রধান নীতি। যার ফলে জীবন হয়ে পড়ে আবেগ শুন্য যান্ত্রিকতায় পরিপূর্ণ। এই সভ্যতা বিশ্ব প্রকৃতির বিষয়াদী সম্পর্কে ধর্মীয় মতবাদ বর্জন করে বৈজ্ঞানিক পন্থায় নিজস্ব পথে চলা বাধ্যতামূলক করে। তারা বিজ্ঞানকে প্রকৃতবাদেরই সমর্থক বলে ঘোষনা করেন। সতের শতকের দর্শনশাস্ত্রে খোদাপরস্তি ও প্রকৃতিবাদ উভয়ই পাশাপাশি চলছিল। এরা বিশ্ব প্রকৃতির রহস্য উদঘাটনে খোদায়ী মতবাদ পরিহার করে যে সব শক্তি ও বিধি এই ব্যবস্থাপনাটি পরিচালনা করছে সেগুলো অন্বেষণ করায় ইচ্ছুক ছিলেন। মূলতঃ এই খোদায়ী মতবাদ পরিহার করাটাই ছিল নাস্তিকতা ও প্রকৃতিবাদের বীজতুল্য। এই বীজই পরবর্তীকালে মুক্ত চিন্তার বৃক্ষরূপে বিকশিত হয়। যদিও আঠার শতকের এ সত্য প্রতিভাত হয় যে, খোদার সত্তাকে অগ্রাহ্য করে বিশ্ব প্রকৃতির রহস্য ও তার বিধি বিধান কিছুতেই অনুসন্ধান করা সম্ভব নয়। তারপরও দার্শনিক ও বিজ্ঞানিরা তাকে একজন নিয়মতান্ত্রিক সম্রাটের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দান করেনি।

পরবর্তীতে জীবতত্ত্ব, শরীর তত্ত্ব, ভূতত্ত্ব এবং প্রাণী তত্ত্বের আবিস্কার উদ্ভাবনী ফলিত বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ এবং বৈষয়িক উপকরণের প্রাচুর্য সকলের মনে এই ধারণা পূর্ণ দৃঢ়তার সংগে বদ্ধমূল করে দেয় যে, বিশ্ব প্রকৃতি আপনা থেকে সৃষ্টি হয় এবং তা বিবর্তন ও উৎকর্ষের পর্যায় অতিক্রম করে চলে যাবে। এর কোন সুনির্দিষ্ট চালক নেই। বিবর্তণ, ইচ্ছাশক্তি, অনুভূতি, চেতনা, বুদ্ধিবৃত্তি ইত্যাদি হচ্ছে এই বিবর্তিত বস্তুরই গুণগত বিশেষত্ব। মানুষ, পশুপাখি সবই যন্ত্রমাত্র, যাদের কোন স্বাধীন ইচ্ছার অস্তিত্ব নেই এবং এদের মধ্যে নিয়ম শৃংখলার বিচ্যুতি ঘটলে বা প্রাণশক্তি ফুরিয়ে গেলে মৃত্যু হয় যার সাথে সাথে তাদের গুণ বৈশিষ্ট্য ও বিলীন হলে পুনর্জীবন বা হাশর লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার বা সন্দিহান করে যে সভ্যতা, যে সভ্যতা পরকালকে অবিশ্বাস করে, ইহকালের জীবনের জবাবদিহিতার চিন্তা অস্বীকার করে, ইহকালের জীবন ক্ষণস্থায়ী ও পরকালের অনন্ত জীবনকালকে হেয় করে ইহকালের রস, রং, রূপ গ্রহণ করে, ন্যায় নীতির বিবর্জিত পথে চলার নির্দেশ দেয় সেই সভ্যতা থেকে ভালো কিই বা আমরা আশা করতে পারি। যদিও সেই গড্ডালিকা প্রবাহে বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ জাতি গা ভাসিয়ে চলছে বা অনুসরণ করছে। অথচ ইসলামী সভ্যতা খোদাভীতি, সরলতা, সত্যবাদীতা, সত্যানুসন্ধিৎসা, সচ্চরিত্র, দায়িত্বজ্ঞান, বিশ্বস্ততা, লজ্জাশীলতা, পরহেজগারী ও পবিত্রতায় পরিপূর্ণ। সকল মানবনীতির সমাবেশ রয়েছে মুসলমান সভ্যতায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ যে শতকে এই নয়া সভ্যতা আর বস্তুতান্ত্রিকতা, ধর্মদ্রোহিতা ও নাস্তিকতার চরম প্রান্তে গিয়ে পৌছে, ঠিক সেই শতকেই মরক্কো থেকে শুরু করে দূর প্রাচ্য অবধি গোটা মুসলিম জাহান পাশ্চাত্য জাতিগুলোর রাজনৈতিক ক্ষমতা ও শাসনতান্ত্রিক প্রাধান্যের অক্টোপাসে এমনভাবে বন্দী হয়ে পড়ে যে তারেদকে তখন আপন দুনিয়ার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে বাধ্য হয়ে পাশ্চাত্য জ্ঞান অর্জন করতে হয়। আর যুগে যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতার গোলামীতে মুসলমান জাতি এমনভাবে মানসিক গোলামীর ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় যে ইসলামী পদ্ধতিতে চিন্তাধারার কাঠামো পর্যন্ত আজ বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তানায়কের আবির্ভাব না হবে ততক্ষণ এই নাজুক পরিস্থিতির অবসান ঘটবে না। আজ

ইসলামের এক নবজাগরণের প্রয়োজন দেখা গিয়েছে। কারণ ইসলাম ও পাশ্চাত্য হচ্ছে দুই বিপরীত তরনীর মত। যে ব্যক্তি একটিতে আরোহন করে তাকে অন্যটি ত্যাগ করতেই হবে। আর উভয়টিতে সে আরোহন করবে সে দ্বিধাবিভক্ত হবে। আর কুরআনের নির্দেশিত চিন্তাগবেষণার পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক নিদর্শনাদির পর্যবেক্ষণ এবং তার রহস্যাবলীর অনুসন্ধান করে ইসলামী চিন্তাধারার ফলস্বরূপ একটি নতুন দর্শন শাস্ত্রের ভিত্তি রচনা করতে হবে এবং খোদা বিমুখ মতবাদ পরিহার করে খোদায়ী মতবাদের উপর চিন্তা ও গবেষণার ইমারতকে সুদৃঢ় ভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন তা দুনিয়ার সর্বত্র পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতার বদলে ইসলামের আধ্যাত্মবাদী সভ্যতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার রেলগাড়ীর বর্তমান ড্রাইভার হচ্ছে পাশ্চাত্যবাদীরা এবং তারা তা যেদিকে চালনা করছে সেদিকে সকলকে চলতে হচ্ছে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। এক্ষেত্রে গতির পরিবর্তনের জন্য চেয়ারকে এদিকে ওদিকে না ঘুরিয়ে ইঞ্জিনটি করায়ত্ব করে ড্রাইভারের স্থান দখল ব্যতিরেকে উপায় নেই। কিন্তু বর্তমানে এই ইঞ্জিনটি ধর্মদ্রোহীদের করায়ত্তে। তাই আজ মুসলিম বিশ্বে বিরাজ করছে ধর্ম পালনের ক্রাইসিস এবং জয়গান চলছে বস্তুবাদের।

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চিন্তাবীদ ও গবেষক জনাব আব্দুল করিম বিআজার শিরাজী মুসলিম মহিলা ও তাগুতী (খোদাদ্রোহী) মহিলার মধ্যে নিম্নের পার্থক্য একেঁছেন ঃ-

মুসলিম মহিলা ও তাগুতী (খোদাদ্রোহী) মহিলার মধ্যে তুলনা

মুসলিম মহিলা ও তাগুতী (খোদাদ্রোহী) মহিলার মধ্যে তুলনা

মুসলিম মহিলা	তাগুতী মহিলা
১। মানবীয়, আধ্যাত্মিক, শৈল্পিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার অধিকারী	১। পাশবিকতা ও কুরুচিপূর্ণ কার্যকলাপে স্বাধীন।
২। খোদায়ী বিধান মোতাবেক বিবাহে আবদ্ধ হয়। আর এই বিবাহ সম্পন্ন হয় অংশীদারদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট চুক্তির মাধ্যমে, যার ভিত্তি হলো দয়ার্দ্রতা, ভালবাসা ও স্নেহ।	২। প্রেম, অর্থ ও বস্তুগত সামগ্রীর পথ ধরে একটি ঠুনকো চুক্তি যা সমঝোতার মধ্য দিয়ে জীবন চলে।
৩। হিজাব পরিধান করে এবং সে কারণে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা লাভ করে এবং অন্তর দয়া, ভালোবাসা ও নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগে পরিপূর্ণ।	৩। নৈতিক বাঁধন শিথিল এবং এর ফলে খুব দ্রুত প্রেমের পথে পা বাড়ায়, কিন্তু তা বেশীদিন স্থায়ী হয় না।
৪। স্বামী ও পরিবারের জন্যে নিজেকে নিবেদিত রাখে।	৪। সকলের জন্যই নিবেদিত।
৫। ইসলামী শালীন পোশাক পরিধানকারী একজন মহিলা হলো ঝিনুকের মধ্যে রক্ষিত মুক্তা।	৫। আর তাগুতী মহিলা হলো নকল ধাতুর গহনা যা সর্বত্রই উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে।
৬। আদর্শ মুসলিম মহিলা তার প্রথম প্রেম- ভালোবাসা নিবেদন করে স্বামীর জন্যে।	৬। আর তাগুতী মহিলা বহুজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার পর তার সর্বশেষ ভালোবাসাটুকু দেয় স্বামীকে।
৭। ইসলাম স্বামীকে স্ত্রীর প্রতি তার দয়া ও ভালোবাসার নিদর্শন হিসাবে একটি দেনমোহর এবং স্ত্রীর সারা জীবনের খোরপোষ দানকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে।	৭। পশ্চিমা স্ত্রীরা কোন দেনমোহর পায় না এবং স্ত্রীর যাবতীয় খরচ স্ত্রীকেই বহন করতে হয়।
৮। ইসলামী সমাজের মহিলারা গৃহস্থালী, ব্যবস্থাপনা ও সন্তানাদি লালন-পালনকে তাদের প্রথম কর্তব্য বলে মনে করে এবং অবসর সময় সামাজিক কর্মকান্ডে ব্যয় করে।	৮। পশ্চিমা মহিলারা সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ও অর্থ উপার্জনকে তাদের প্রাথমিক কর্তব্য মনে করে এবং গৃহস্থালী ব্যবস্থাপনা ও সন্তানাদি লালন-পালনকে অবসরকালীন কাজ বলে মনে করে।
৯। একজন মুসলিম মহিলা রান্না করে, সেলাই করে বা কোন কিছু তৈরী করে তার নিজের জন্যে, স্বামীর জন্যে ও পরিবারের জন্যে।	৯। অপরদিকে একজন তাগুতী মহিলা কাজ করে রেস্তোরা, কারখানা ও অফিসে অন্যের জন্যে।
১০। মুসলিম মহিলা এবং তার পরিবার নিজেদের বাসায় রান্না করা খাবার খায়।	১০। তাগুতী মহিলারা কৃত্রিম খাদ্য গ্রহণ করে যা রান্না হয় রেস্তোরায়।
১১। নিজের জন্যে এবং নিজের পরিবারের জন্যে রান্নাবান্না, সেলাই ও অন্যান্য দ্রব্যাদি তৈরী করে একজন মুসলিম মহিলা তার স্বামী ও অন্যদের প্রতি তার ভালোবাসা বৃদ্ধি করে।	১১। তাগুতী মহিলা অন্যের রান্না করা খাবার এবং তৈরী করা দ্রব্যাদি ব্যবহার করে। পরিবারের সকলকে তারা নিজস্ব শিল্পশৈলিতা থেকে বঞ্চিত করে।
১২। একজন মুসলিম মহিলা তার সৃষ্টিধর্মী কর্মকান্ড ও সীমিত প্রসাধনী ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবারের অনেক খরচ বাঁচাতে পারে।	১২। তাগুতী মহিলা যা আয় করে তা ব্যয় করে প্রসাধনী ও কাপড় চোপড় খাতে, আহার করে বাইরে এবং সেবাযত্ন করে কুকুর ও বিড়ালের।
১৩। একজন আদর্শ ইসলামী মহিলা সন্তানাদি লালন পালন করে নিজ হাতে।	১৩। আর তাগুতী মহিলা অন্যের মাধ্যমে সন্তান-সন্ততি লালন- পালন করে তাদেরকে মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করে।
১৪। গৃহস্থালী কাজ কর্মের সৃষ্টিধর্মী ব্যবস্থাপনা এবং স্বামীর শান্তি ও কল্যাণের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে একজন মুসলিম মহিলা সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্যম ও শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে।	১৪। পশ্চিমা দোষে দুষ্ট কোন মহিলা তার স্বামীর নৈতিক শক্তি ও উদ্যম বৃদ্ধি করাকে নিজের কাজের আগে অগ্রাধিকার দিতে প্রস্তুত নয়।
১৫। কোন মুসলিম মহিলাকে সচরাচর একাকীত্বে ভুগতে হয় না, কেননা সে স্বামী, সন্তানাদি, পিতা-মাতা ও পরিবারবর্গকে তার পাশেই দেখতে পায়।	১৫। পাশ্চাত্য সভ্যতায় স্বামী- স্ত্রী ও পিতা-মাতা প্রত্যেকেই নিজস্ব জীবন নিয়ে ব্যস্ত থাকে আর এই একাকীত্ব ঘুঁচাতে মহিলারা কুকুর, বিড়াল ও মাদকদ্রব্য নিয়ে ব্যস্ত থাকে।
১৬। ইসলামী সমাজের একটি পরিবারের মধ্যে পিতা- মাতাকে সকলের চেয়ে বেশী মর্যাদা দেয়া হয়েছে এবং পরিবারে যেন একে অন্যকে সাহায্য করে তার নেতৃত্ব দেন পিতামাতা।	১৬। তাগুতী মহিলার পিতামাতার সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না এবং সেখানে পারস্পরিক সহায়তারও কোন সুযোগ নেই।
১৭। মুসলিম মহিলাদের এমন শিক্ষা দেয়া হয়, যাতে করে তারা সন্তান-সন্ততিকে ভালোভাবে গড়ে তুলতে পারে, তাহলেই সন্তান সমাজের কল্যাণ করতে সক্ষম হবে।	১৭। তাগুতী মহিলারা এমন ধরনের শিক্ষা অর্জন করে যার মাধ্যমে সে নিজে কিছু একটা হতে পারে এবং অধিক অর্থ উপার্জন করতে পারে।

বাংলাদেশে ধর্মীয় কোন্দল একটি পর্যালোচনা

এম ওসমান গনি

ইন্নাদদীনা ইনদাললাহিল ইসলাম। অর্থাৎ ইসলামই মহান আল্লাহর দরবারে একমাত্র মনোনীত গ্রহণ যোগ্য জীবন বিধান। হজরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ পয়গাম্বর (আঃ) এর ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং রাসুল হিসাবে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে আল্লাহ ছোবহানু ওয়াতায়ালা মানব জাতির জন্য পথ নির্দেশক এবং পারিচালক হিসেবে প্রেরণ এক অন্যন্য সাধারণ ঘটনা। এখানে এসে আল্লাহতায়ালা মানব জাতির জন্য ভবিষ্যতে নবী বা প্রদর্শক প্রেরন সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলেন এবং পাক কুরআনকে মানব জাতির জন্য সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ হেদায়াতের গ্রন্থ হিসাবে ঘোষনা ও অবতীর্ণ করলেন। বিদায় হজ্জের ভাষণের শেষ প্রান্তে উর্দ্ধাকাশের আলোক দেশের সর্বশেষ বাণী চিরন্তনী নাজিল হলো, বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের তরফ থেকে তোহফা স্বরূপ তার মাহবুব রাসুলে মকবুল (সঃ) এর উপর। আল্লাহ বলেন- আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দ্বীনাকুম। ওয়াতমামতু আলাইকুম নেয়মাতী ওয়ারাদিতু লাকুমুল ইসলামা দিনা। অর্থাৎ "আজ তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণতা দান করলাম ও আমার নেয়ামত তোমাদের উপর বর্ষণ করলাম এবং দ্বীন হিসাবে ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম।"

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালা মুসলমানদেরকে সম্মানীত করলেন এবং ইসলামকে তার মনোনীত জীবন বিধান হিসাবে ঘোষনা প্রদান করলেন। উক্ত আয়াত নাজিল হওয়ার পর ইহুদী-খৃষ্টান পন্ডিতেরা আফসোস করে বলেতে থাকলেন- "আহ এরকম ঘোষনা যদি আমাদের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে আসতো তবে কতোইনা ভালো হতো।" এই কোরআন রাসুল (সঃ) এর ২৩ বছরের নবুয়তী জিন্দেগির একটি নিখুত জীবনালেখ্য তথা খোদায়ী বানী চিরন্তনী ও পথ নির্দেশিকা হিসাবে মানব জাতির নিকট এখনও অবিকৃতভাবে মওজুদ রয়েছে। মিল্লাতে ইসলামিয়ার জন্য এর চেয়ে আর কি সৌভাগ্যের বিষয় হতে পারে। আশ্চর্য্যের বিষয় বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার সাথে সাথে পাক কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব, বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, ও গ্রহণযোগ্যতা সাধারণ-অসাধারণ, মুসলিম- অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষের নিকট দিন দিন বেড়েই চলেছে। এ পর্যন্ত কোরআনের কোন বক্তব্য যুগের সাথে কিংবা বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক কেউ প্রমান করতে পারেনি। ডঃ মরিস বুকাইলি তার Science- Quran & Bible গ্রন্থে বলেন, "বাইবেলে ৫০ হাজার errors আছে। অথচ কোরআনে একটি বাক্য, শব্দও আমি পাইনি যা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যহীন।"

খৃষ্টান যাজক ডাঃ সেলতাই বলেন, "কোরআনের মত অনন্য সাধারণ গ্রন্থ কোন মানুষ রচনা করতে পারে না, এটি একটি জীবন্ত মোজেজা। সে মোজেজা মৃতকে জীবিত করার চাইতেও বিস্ময়কর।" প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক গীবন বলেন,-' জীবনের প্রতিটি শাখার কার্যকরী বিষয় কোরআনে মওজুদ রয়েছে। আনন্দের কথা এমন একটি বিস্ময়কর সত্য কিতাব ও বিধানের অনুসারী আমরা। কিন্তু আমরা কি ঐশী গ্রন্থের মান মর্যাদা রক্ষা করতে পেরেছি? বর্তমানে পৃথিবীতে মুসলমানদের অবস্থা কি নড়েবড়ে ও ক্ষয়িষ্ণু নয়? কিন্তু কেন এমন বেহাল অবস্থা আমাদের ? এর জন্য দায়ী কে? হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মের কথা বাদই দিলাম। কেননা এ ধর্মগ্রন্থগুলো মানব সৃষ্ট ও এর বক্তব্য গুলা পুরোহিতরা লিখে নিয়েছে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী। আহলে কিতাব ধারী খৃষ্টান-ইহুদীরাও তাদের নবীর অবর্তমানে তাদের ধর্মীয় কিতাবকে বিকৃত, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন, সংশোধন ও পরিমার্জন করে আসল কিতাবের কিছুই বাকি রাখেনি সেখানে। অথচ এইসব বিকৃত ধর্মগ্রন্থ ও জীবনাদর্শের জন্য মানুষ জীবনপণ লড়াই করছে, এমনকি সেসব ধর্মের মান মর্যাদা বৃদ্ধি ও প্রচার-প্রসারের জন্য নিরলসভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে যাচ্ছে দুনিয়া ব্যাপী।

দুর্ভাগ্যের বিষয় মুসলমানেরা আজ বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার পরিবর্তে নিজেদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলা খেলছে দিবা নিশী। আত্মঘাতী ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষে বহু জনপদ বিরান হয়ে গেছে। খুব ছোটখাট বিষয় নিয়ে পরস্পর মারাত্মক যত সব বিবাদ বিসম্বাদে জড়িয়ে পড়ছে। একদল অপর দলকে কোন ক্রমেই সহ্য করতে পারছেনা। এদের মধ্যে সুন্নী, কড়া সুন্নী, ওহাবী, গোলাপী, মাইজ ভান্ডারী, তবলীগী, শিয়া, মাজহাবী, লা মাজহাবী, গোলটুপী, চানটুপী, লম্বা টুপি, চেপ্টাটুপি, কেয়ামী, লা কেয়ামী, লম্বা কোর্তা, বোঁটে কোর্তা, লম্বা দাঁড়ি, বেটে দাঁড়ি, মাজারপূজারী, কবর পূজারী, পীর পূজারী, পাকিস্তানী পীর, বাঙ্গালী পীর, দরগাহ পুজারী, আটরশি, বাররশি, দেওয়ানবাগী, তবলাবাজী, তরীকাপন্থী, সূফীপন্থী, মারফতী, লা- তরীকা, দেওবন্ধী, লালবাগী, কামরাঙ্গী, আলিয়া, নুরানী, সরকারী, বেসরকারী, বেদাতী, বেনামাজী, হাককা নামাজী, হাটকা নামাজী, ৩৬০ কা নামাজী সহ শতশত দল উপদলে বিভক্ত এই উপমহাদেশের বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলমানেরা।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যে সব ধর্মীয় কোন্দল রয়েছে বাংলাদেশে সেগুলি ছাড়াও ধর্মের নামে অন্য যতসব নোংরামী রয়েছে তা ভাবতেই অবাক লাগে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত-ই বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ইসলামী কেয়াস ও ইজতিহাদের সর্বসম্মত জামায়াত। কিন্তু বাংলাদেশে দেখা যায় এটি একটি কোটারী শক্তির খেলার গুটিতে পরিণত হয়ে গেছে। আজ যারা নিজেদেরকে আহলে সুন্নাতের অনুসারী

হিসাবে দাবী করছে তাদের মধ্যে সুবিধাবাদ জিন্দাবাদ ও মিষ্টি খাওয়ার সুন্নাত ছাড়া রাসূলে মাকবুল (সাঃ) এর আসল সুন্নাতের কোন পাবন্দী দেখা যায় না। বরং ক্ষেত্র বিশেষে তাদের বাড়াবাড়ি চরম নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব করে। এরা এমন সব বিষয় নিয়ে সাধারণ অশিক্ষিত মানুষকে বিভ্রান্ত করে, যে সব বিষয় তাদের জানা না থাকলেও কিছু যায় আসে না। বরং অনেক সময় এসব বাড়াবাড়ি শিরক বিদায়াতের সমপর্যায়ে চলে যায়।

তারা বিতর্ক করে নবী করিম (সাঃ) মাটির মানুষ না নুরের মানুষ। অলীদের স্থান কার কোথায়, কে কোন তবকায়? ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা মনে করি কুরআনের ও হাদিসের সুস্পষ্ট বাণী থাকার পরও যারা এ বিষয়টি নিয়ে কোন্দল সৃষ্টি করে, তারা কিছুতেই সহীহ পথে আছে বলা যাবেনা। কেননা মনগড়া কোন বক্তব্য কিংবা আবেগের বশবর্তী হয়ে কোন সিদ্ধান্ত দেয়া ইসলাম সম্মত নয়। আমাদের বিশ্বাস আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর পর যিনি সবচেয়ে বেশী সম্মানীয় তিনিই হলেন আমাদের প্রিয়নবী হজরত মুহাম্মদ (সঃ)। এদের মধ্যে কোন কোন মৌলভী রাসূল (সঃ) কে আল্লাহর সমতুল্য এমনকি গায়েব জানেন বলেও উক্তি করে থাকেন। কেউ কেউ রাসুল (সঃ) কে আল্লাহর জাত নুর দিয়ে সৃষ্টির কথাও বলেন। এক্ষেত্রে ভান্ডারীরা এগিয়ে। তারা আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন, আল্লাহ নাকি তার সমস্ত ক্ষমতা রাসূল (সঃ) কে দিয়ে গায়েব হয়ে যান। আর রাসূল (সঃ) সেই ক্ষমতা ভাগাভাগি করে অলি দরবেশদের মাঝে বিলি বন্টন করেন।

এতসব গাজাখোরী বক্তব্যের পিছনেও লক্ষ লক্ষ বদনসীব বনি আদমকে ঘুরতে দেখা যায়। এমনকি ইংরেজী শিক্ষিত গাফেল বহু এদের ফাঁদে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ নিজেদের সেক্যুলার রাজনৈতিক চিন্তা ধারার কারণে যারা ইসলামকে দ্বীন হিসেবে তথা জীবন ব্যবস্থা হিসাবে মেনে নেয়নি তাদের পরিণাম হবে ভয়াবহ। ইসলামের সত্যিকার রূপ রস গন্ধ থেকে বিধর্মীদের ওরা বিভ্রান্ত করছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ওরা রাজনৈতিক ভাবে সেক্যুলার ও ধনতন্ত্রী রাজনীতির সমর্থক। অনেক সময় ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে ওরা গায়ের ঝাল মিটায়। ওরা তাদের অনুসারী ছাড়া অন্যদেরকে কাফের নামেও আখ্যয়িত করতে দ্বিধা করেনা নিজেরা ভ্রান্ত পথে থেকে সত্যপন্থিদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ওরা কাফের মুশরিকদের হাতকেই শক্তিশালী করে প্রকারান্তরে।

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায় এদের অবস্থান সবচেয়ে শক্তিশালী। ওরা সাম্রাজ্যবাদের দালাল। ওদের অর্থপুষ্ট হয়ে কোন এনজিও সংগঠন এদেশ ও জাতি বিধ্বংসী তৎপরতায় লিপ্ত। এদের একটি ছাত্র সংঘঠনও রয়েছে। চট্টগ্রামে এদের তৎপরতা লক্ষ করা যায়। এদেরকে বামপন্থী সেক্যুলার সংগঠনের চামচা ও দালাল বললে অত্যুক্তি হবেনা। কেননা এরা ওদের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সাহায্য সহযোগিতায় টিকে আছে। এদের বক্তৃতা বিবৃতি ও দেয়াল লিখন দেখে সহজেই অনুমান করা যায় ওরা কাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য মাঠে নেমেছে। ওদের উদ্দেশ্যই বা কি। এরা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায় নাকি ইসলাম প্রতিষ্ঠা আন্দোলনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাই এদের লক্ষ্য। এরাও এদের মুরুব্বীদের দেখাদেখি ইসলামকে খন্ডিত করে অবিমিশ্রিভাবে বিকৃত উপায়ে জনসাধারণের কাছে উপস্থাপন করে। ওদের বানানো ইসলামে আজানের আগে সালাত ও সালাম পড়া ও নবী করিমের নাম নিলে মুখে চুমু খাওয়াকে ওরা ফরজের মত গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। এদের বিধানকে সত্যপন্থীরা পৃথিবীর কোথাও মেনে নেয়নি। তারপরেও ওরা ওদের মিশন চালিয়ে যাচ্ছে কিছু ইসলাম বিদ্বেষী, রাজনৈতিক দল ও মাজার পূজারীদের সহযোগীতায়। আমার ছোট ছেলেটি এরকম দু'অংশে বিভক্ত, কোথাও কোথাও তিন অংশে বিভক্ত আজান শুনে জিজ্ঞেস করেছিল, আসল আজান কোনটি? তাকে আমি বলেছিলাম, মাঝখানের অংশটিই প্রকৃত আজান। দুই দিকে সালাতুসসালাম পাঠ করা হয়। আমার সন্তানের প্রশ্ন, কেন এরকম আজান দু'একটি মসজিদে দেয়া হয়? তার কোন সদুত্তর আমি দিতে পারিনি। উদ্বেগের বিষয় এমন একদিন আসবে হয়তোবা একশ্রেণীর জাহেল মুসলিম নামধারী কুলাঙ্গার মূল আজানকে বাদ দিয়ে প্রথম অংশ অথবা শেষ অংশকে আজান হিসাবে প্রচার করা শুরু করবে। নাউজুবিল্লাহ।

এটি আরেকটি বড় ফেতনা এ জাতির জন্য। ইসলামকে বিভক্ত করা ও তার অনুসারীদের মধ্যে দ্বন্দ সংঘাত সৃষ্টির সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার এটি একটি অংশ বলে আমরা মনে করি। রাসূল (সঃ) এর প্রতি আঙ্গুলে চুমু খেয়ে মহব্বত দেখানোর যে লোক দেখানো প্রবণতা তা পৃথিবীর কোথাও কোন মুসলিম সমাজে চালু নেই। অথচ এ চরম একটি মুস্তাহাব আমলকে ফরজের সমতুল্য মান্য করার প্রবণতা জাহেলিয়াত বৈ কিছুই নয়। আল্লাহ ও রাসুল প্রেমিক কোন মানুষই ইসলামকে বিকৃত হতে দেখে চুপ থাকতে পারে না। রাসুল (সঃ) নতুন বিধান সৃষ্টিকারীদের উপর লানত দিয়েছেন। সুতরাং ইসলামের নতুন বিকৃতি দৃষ্টি গ্রাহ্য নয় কোন ক্রমেই। কেননা ইসলামের মূল সৌন্দর্য অবিকৃত থেকেই যুগে যুগে সত্য পন্থী মানবগোষ্ঠীকে হেদায়াতের আলোতে উদ্ভাসিত করেছে। এখানে সংযোজন বিয়োজনের কোন প্রয়োজন নেই। এটি স্বয়ং সম্পূর্ণ আল্লাহ প্রদত্ত সত্য দ্বীন তথা জীবন ব্যবস্থা। ইহুদীবাদ, খৃষ্টবাদ কিংবা শিরকীবাদের যাতাকলে ইসলামকে

তারা বিতর্ক করে নবী করিম (সাঃ) মাটির মানুষ না নুরের মানুষ। অলীদের স্থান কার কোথায়, কে কোন তবকায়? ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা মনে করি কুরআনের ও হাদিসের সুস্পষ্ট বাণী থাকার পরও যারা এ বিষয়টি নিয়ে কোন্দল সৃষ্টি করে, তারা কিছুতেই সহীহ পথে আছে বলা যাবেনা। কেননা মনগড়া কোন বক্তব্য কিংবা আবেগের বশবর্তী হয়ে কোন সিদ্ধান্ত দেয়া ইসলাম সম্মত নয়। আমাদের বিশ্বাস আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর পর যিনি সবচেয়ে বেশী সম্মানীয় তিনিই হলেন আমাদের প্রিয়নবী হজরত মুহাম্মদ (সঃ)। এদের মধ্যে কোন কোন মৌলভী রাসূল (সঃ) কে আল্লাহর সমতুল্য এমনকি গায়েব জানেন বলেও উক্তি করে থাকেন। কেউ কেউ রাসুল (সঃ) কে আল্লাহর জাত নুর দিয়ে সৃষ্টির কথাও বলেন। এক্ষেত্রে ভান্ডারীরা এগিয়ে।

নিপতিত হতে আমরা দিতে পারিনা। এজন্য আলেম ওলামাসহ সকল মুসলমানদের এগিয়ে আসা উচিত।

কওমী লাইন ও তাবলীগ জামাতের বিষয়ে কোনক্রমেই অংক মেলানো যায় না। এদের অবস্থা সেসব অভিযাত্রীদের মত যারা এভারেস্ট শৃঙ্গে উঠবার চেষ্টাও করবে না। কোন বাস্তব কর্ম পরিকল্পনাও নেবেনা। কিন্তু এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় করার আশা পোষন করেন মনে মনে। এটি একটি হাস্যকর চিন্তাচেতনা। বৃটিশ বেনিয়াদের ভারত উপমহাদেশ থেকে তাড়ানোর মনোবৃত্তি নিয়ে জিহাদের তামান্নায় উদ্ভাসিত হয়ে যেসব মুসলিম মনীষীরা দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আজকে তাদের উত্তসূরীরা সে আদর্শ উদ্দেশ্যের বিপরীতে হীন নীচ হয়ে মূলস্ত্রীম থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে গিয়ে ইসলামের সার্বজননীতাবাদকে উৎখাত করে ব্যক্তি জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নাকি লিপ্ত রয়েছে।

কুরআনুল করিমের কিছু কিছু আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে অধিকাংশ অর্থ ও তাৎপর্য প্রকারান্তরে আমলে না নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বাদ দিয়ে মুসলিম দেশসমূহে ওনারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বাদ দিয়ে কিসের তাবলীগ প্রচার করছেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। চলমান বিশ্ব থেকে মুখ ঘুরিয়ে, সমসাময়িক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড থেকে নিজেদের গুটিয়ে রেখে ওনারা নিজেদের সুবিধামত তাবলীগ নেছাব বানিয়ে ইসলামকে কয়েকটি চিল্লার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ইসলামের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলোকে ধামাচাপা দেয়ার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। ব্যক্তিগত জীবনে এদের অনেকে শান শওকতের সাথে জীবন যাপন করে থাকেন। আবার অনেকের ইসলামের প্রকাশ্য দুশমনদের সাথে দহরম মহরম ইসলামপ্রিয় মানুষদের ভাবিয়ে তোলে। ইসলামকে বাদ দিয়ে আদিয়ানে বাতেলার অনুসারী হয়েও এই জামাতের নেতা কিংবা সমর্থক হওয়া যায়। অথচ রাসূল (সঃ) কে প্রেরণের মুখ্য উদ্দেশ্য হল বাতিল জীবন আদর্শের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করা। পাক কোরআন ঘোষণা করছে, "আমি রাসুল (সঃ) কে হেদায়াত ও সত্য জীবন ব্যবস্থা সহকারে প্রেরণ করেছি যাতে করে বাতিল জীবন ব্যবস্থার উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে, যদিও বা মুশরিকদের তা পছন্দ হয়না।" (সুরা আল ইমরান)। আমরা মনে করি যারা ধর্ম ও রাজনীতির উপর বিভক্ত রেখা টেনে ইসলামকে খন্ডিতভাবে উপস্থাপন করতে অপপ্রয়াস চালাচ্ছে তারা হয় ইসলামকে না বুঝে অথবা ইচ্ছে করে অন্য কারো অসৎ উদ্দশ্য বাস্তবায়নের মনোবৃত্তি নিয়ে এপথে এগুচ্ছে। এরা নিজেদেরকে আবেদ মনে করে। এমনিক ইসলামের খাটি খাদেম হিসেবেও প্রচার করতে দ্বিধা করেন না। অথচ এদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ইসলাম বিরোধীদের হাতকেই শক্তিশালী করে। কেননা ইসলামী আদর্শপুষ্ট সংগঠনসমূহের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির পরিবর্তে যদি অনৈক্য ও বৈরীতা প্রকাশ্য রূপ নেয় তাহলে আমরা তাকে কি ধরনের ইসলামপ্রীতি বলতে পারি? তাবলীগের ভাইয়েরা আশা রাখি বিষয়টি চিন্তা করে দেখবেন।

দুনিয়াজোড়া ইসলামের দুশমনেরা ইসলামকে হীন ও জীর্ণ-শীর্ণ হিসেবে দেখতে চায়। তারা ইসলামের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে বরদাশত করতে চায়না। কেননা। ইসলাম মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্বকে উৎখাত করে এক আল্লাহর প্রভুত্বের ছায়াতলে মানবজাতিকে নিয়ে আসতে চায়। দুর্ভাগ্যের বিষয় দুশমনদের এই ষড়যন্ত্র অনেকক্ষেত্রেই কৃতকার্য হয়েছে।

ওনারা এমন একটি দেশকে নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছেন যে দেশে মুসলমানদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলছে দুশমনেরা। ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ভাঙতেও যে দেশের লোকদের বুক কাঁপেনা। ওসব নেতৃবৃন্দের নিজ দেশের মুসলমানদের করুণ অবস্থা দেখেও টু শব্দটি করার মুরোদ নেই। এদের কেউ কেউ কংগ্রেসের দালালী করতেও দ্বিধা করেনা। অখন্ড ভারতের স্বপ্নও দেখে এদের অনেকে। মুশরিকী সমাজ ব্যবস্থা ও কুফরী আর শিরকে ভরা দেশের নাগরিক হয়ে নিজেদের স্বাধীনচেতা ভাবতে যাদের কলিজা কাঁপে তারা কি করে ইসলামের রওনক বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিবে ভাবতেও তা অবাক লাগে। নিজেরা হীন নীচ হয়ে বন্দী দশার মত জীবন যাপন করেন আর স্বাধীন মুসলিম দেশের মুসলমানদের তাবলীগ শেখান। যে তাবলীগ মুসলমানদের ইসলাম প্রতিষ্ঠা আন্দোলন থেকে সরিয়ে রাখে ও ইসলামের দুশমনদের হাতকেই শক্তিশালী করে সে তাবলীগ কার জন্য এবং এটি কিসের আলামত ?

আমরা জানতে পেরেছি, তাদের হেডকোয়ার্টার নাকি ইসরাইলে। মুসলমানদের এক নম্বর দুশমনদের দেশে তাদের প্রধান কার্যালয় কেন, বিশ্ব মুসলিম জানতে চায় ?

তারা মুসলমানদের মাঝে হীনমন্যতা সৃষ্টি ও জিহাদের জযবা বিলীন করে প্রকারান্তরে ইসলামের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শত্রুদের হাতকেই শক্তিশালী করেন। আমরা ইসলাম প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের সহযোগী হতে চাই। কংগ্রেসী ইসলাম কিংবা দিল্লী মার্কা ইসলাম ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করি আমরা। আজ কাফের মুশরিকদের সাথে তাল মিলিয়ে ও সমঝোতা করে ওনারা যে তাবলীগের কথা বলেন সেটাতো রাসূলে মাকবুল (সঃ) তরীকা ছিলনা। বরং বাসূল (সঃ) কে কাফের মুশরিকরা যখন বলেছিলেন, হে মুহাম্মদ (সঃ), আপনি কাবাঘরের একাংশে আপনার উম্মতদের নিয়ে আরাধনা করুন আর অন্য অংশ আমাদের জন্য ছেড়ে দিন। প্রত্যুত্তরে রাসূল (সঃ) বলেছিলেন, হে আরবের কাফের মুশরিকরা জেনে রেখো মুহাম্মদ (সঃ) এর ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে যদি চন্দ্রও এনে দাও তারপরেও মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর উলুহিয়াত ও রুবুবিয়াতের বাণী প্রচার তথা ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে বিন্দুমাত্র ক্ষান্ত হবেন না। অর্থাৎ ইসলামকে খন্ডিত করে কোন সমঝোতা তোমাদের সাথে হবে না। ঐসময় নাযিল করা হয় সূরা কাফিরূন। যেখানে বলা হল " বল, হে কাফের সম্প্রদায় তোমরা ইবাদত করনা, যার ইবাদত আমরা করি।" অর্থাৎ ইসলামকে নিয়ে মুসলমানদের সাথে কাফেরদের অবিমিশ্র কোন মতবাদ গ্রহণযোগ্য হবে না। এক ও অখন্ড ইসলামই আমাদের কাম্য।

ইসলামের মূল স্পিরিট থেকে মুসলমানদের দূরে সরিয়ে রেখে সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শক্তির ক্রীড়নক হিসেবে ওরা কাজ করছে কিনা তা খতিয়ে দেখার দরকার রয়েছে। একটি বিষয় আমাদের আশ্চর্য লাগে যখন দেখি এই জামাতের কোন লোক যখন বিদেশে যেতে চায় বিশেষ করে ভারত, আমেরিকা, বৃটেন, অস্ট্রেলিয়া এমনকি ইসরাইল পর্যন্ত

সাথে সাথে মুহূর্তের মধ্যেই ওনারা ভিসা পেয়ে যান। ঐ সব দেশের সাথে ওনাদের এত খাতির কেন তা আমাদের বুঝে আসে না। যেসব দেশ প্রকাশ্যে মুসলমানদের সাথে দুশমনী করে, মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত যাদের হাত, যারা কোন মুসলমানকে তাদের দেশে সহজেই ভিসা দিতে চায়না তারা কেন এই জামায়াতের লোকদের এতই খাতির করে, মমতা দেখায় তা ভাববার বিষয় বৈকি! আসলে প্রাশ্চাত্য খ্রিষ্টজগত ও প্রাচ্য মুশরিকী সমাজ ইসলামের রাজনৈতিক উত্থানকে ভয়ের চোখে দেখে থাকেন। যে কারণে দিল্লীমার্কা জামায়াতকে দিয়ে তারা মুসিলম সমাজ থেকে রাসূলে মাকবুল (সঃ) এর জিহাদী কাফেলা যারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রত, যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর তাদেরকে কোণঠাসা করে দুনিয়াব্যাপী ইসলাম প্রতিষ্ঠা আন্দোলনে বাঁধা সৃষ্টি করে তাদের হীন ও নোংরা স্বার্থ চরিতার্থ করতে চায়। এজন্যই তাদের সাথে এত দহরম-মহরম আর ভালোবাসা প্রদর্শন করে শত্রুরা।

বাংলাদেশের তুরাগ নদীর পাড়ে এদের বৃহত্তম সমাবেশ হয়। এই জামাতে ইহুদী মালিকানাধীন কিছু কোম্পানী সকল রকম সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে বলে আমরা জানতে পেরেছি। মুসলিম বিদ্বেষী সংস্থা ও ব্যক্তিরা এই সম্মেলনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ দেখা যায়। অবাক লাগে যখন দেখি এই জামাতকে হজ্জের সাথে তুলনা করা হয়। কোথায় হজ্জ একটি ফরজ ইবাদত, আর কোথায় তুরাগ নদীর পারের কতগুলো অসচেতন ও লক্ষ্যবিহীন মানুষের সমাবেশ। এরকম মানুষ নামের চল্লিশ লক্ষ কেন, চল্লিশ কোটি নিস্তেজ, চেতনাহীন মানুষও যদি একত্রিত হয় তাতে ইসলামের কি লাভ হবে? এত বড় সমাবেশ থেকে দুশমনদের বিরুদ্ধে একটি হুশিয়ারী পর্যন্ত উচ্চারিত হয়না। দেশে বিদেশে মুসলমানদের কি করুণ অবস্থা! মুসলমানেরা আজ নিজ দেশে পরবাসী হয়ে বসবাস করছে। তাদের সুখ দুঃখের আনন্দ- বেদনার একটি বাক্যও ঐ কেন্দ্রে উচ্চরিত হয় না। এদের আশেপাশে এমন লোককেও দেখা যায় যারা সারাজীবন ধরে ইসলামের গোড়া কেটে চলেছে। মূলতঃ আল্লাহর খাস বান্দা ৩১৩ জন দরকার। জিন্দা দীল মুজাহিদ কাফের বেঈমানদের সামনে মাথা নোয়ায় না। দ্বীনের স্বাক্ষী হয়ে নিজের জীবন বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হয়না। আজকে ইসলামকে তার স্বরূপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্য কিছুকে ইসলাম বলে চালিয়ে দেয়ার দুঃসাহস দেখায় যারা আমরা তাদেরকে ধিক্কার দেই। আমাদের স্মরন রাখতে হবে রাসূলে খোদা (সঃ) এর সাথে কাফেরদের দ্বন্দের মূল কারনই ছিল নেতৃত্বের। আরবের কাফেররা রাসূল (সঃ) কে ধন- সম্পদ, সুন্দরী- নারী সবকিছুই দিতে রাজী ছিল এই শর্তে যে রাসূল (সঃ) ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে নিজেকে বিরত রাখবেন আমরা হেকমতের বিরোধী না। কেননা দ্বীন প্রচারে হেকমত ও উত্তম যুক্তির কথা কুরআনে বলা হয়েছে। হেকমতের নামে শত্রুর হাতকে শক্তিশালী করা ও সত্যপন্থী মুসলিম জনতার সাথে বৈরীতা জনগণ মেনে নিতে পারছে না।

ইতিহাস সাক্ষী রাসূল (সঃ) ইসলামী আন্দোলন সংগ্রাম থেকে একচুল পরিমাণও সরে দাঁড়ায়নি। আর একটি বিষয় আমাদের বিস্ময় সৃষ্টি করে, আর তা হল ওরা এদেশের খাঁটি ইসলামী সংগঠনকে মোটেই সহ্য করতে পারেনা। অথচ ইসলামী আন্দোলনের তরফ থেকে ওদের বিরুদ্ধে কোনদিন কোন বক্তব্য রাখতে তথা টু শব্দটি করতে আমরা দেখিনি। তারপরও তারা কেন ইসলাম প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের প্রধান নেয়ামত সুসংগঠিত ও সুশিক্ষিত দলটিকে সহ্য করতে পারে না তা আমাদের বোধগম্য নয়। অথচ সে দলটিকে ইসলামের দুশমন ভারত, ইসরাইল, আমেরিকা ও বৃটিশরা তাদের এক নম্বর শত্রু মনে করে। তাহলে কি ওরা ঐ সকল দেশকে খুশী করার জন্য এদের বিরোধীতা করে? এই বাংলাদেশে যে পদ্ধতিতে তারা জনগনকে ইসলাহ্ করতে চায় তা কি আদৌ সম্ভব? নিজ নিজ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বলয়ে থেকে ওদের খাঁটি সমর্থক হওয়া পানির মত সহজ হওয়ায় অনেকেই এ জামাতে শরীক হয়ে ধন্য হতে চায়! তবে তাতে ঐ সকল লোকদের মধ্যে মৌলিক কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। কেননা কোরআনের সকল আয়াত ও বাণী মুসলমানদের জন্য অনুকরণীয়, অবশ্যই পালনীয় ও গ্রহণীয় বিধান। একে বিভক্ত করার ঘৃণ্য প্রয়াস কোন মুসলমান কস্মিনকালেও কল্পনা করতে পারেনা। কেননা কোরআনকে খন্ডিত করা তথা বিভক্ত করা কুফরী। কোরআন বলে, তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর, অপর অংশের সাথে কর কুফরী? যদি তাই কর তাহলে দুনিয়া ও পরকালে তোমাদের জন্য ভয়াবহ আজাব অপেক্ষা করছে।"

যুগের চাহিদা মোতাবেক ছহী ও মোকাম্মেল দ্বীনের আদর্শে ইসলামের অখন্ড চিত্র ধারন করে বিভক্তি রেখা ছিন্ন করে সকলে মিলে ইসলামের আদর্শ পূজারীদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ছাড়া দ্বীন ও তাবলীগের তেমন কোন উপকার যে হবেনা তা যেন বিশ্ব তাবলীগ জামাত সহ অন্যান্য সকল নেতৃবৃন্দ বাস্তবতার নিরীখে অনুভব করতে পারেন। আর ওনারা যদি সত্যিই ইসলামের স্বার্থে কাজ করে থাকেন তাহলে শত্রুমিত্র চিহ্নিত করে সত্যপথযাত্রীদের সাথে একত্রিত হয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখবেন। এটাই মুসলিম সমাজ কামনা করে।

যুগের চাহিদা মোতাবেক ছহী ও মোকাম্মেল দ্বীনের আদর্শে ইসলামের অখন্ড চিত্র ধারন করে বিভক্তি রেখা ছিন্ন করে সকলে মিলে ইসলামের আদর্শ পূজারীদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ছাড়া দ্বীন ও তাবলীগের তেমন কোন উপকার যে হবেনা তা যেন বিশ্ব তাবলীগ জামাত সহ অন্যান্য সকল নেতৃবৃন্দ বাস্তবতার নিরীখে অনুভব করতে পারেন। আর ওনারা যদি সত্যিই ইসলামের স্বার্থে কাজ করে থাকেন তাহলে শত্রুমিত্র চিহ্নিত করে সত্যপথযাত্রীদের সাথে একত্রিত হয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখবেন। এটাই মুসলিম সমাজ কামনা করে।

অ্যাডামস রিপোর্ট (১৮৩৫-১৮৩৮) ও বাংলার শিক্ষা পরিস্থিতি

মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন

ভূমিকা : স্কটিশ মিশনারী উইলিয়াম অ্যাডাম উনিশ শতকের ত্রিশের দশকে বাংলা ও বিহারের শিক্ষা পরিস্থিতি অনুসন্ধান পূর্বক ব্রিটিশ সরকারের নিকট যে বিবরণ পেশ করেন তা সাধারণভাবে 'অ্যাডামস রিপোর্ট' হিসেবে পরিচিত। ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৮ সাল এই দীর্ঘ তিন বছর ধরে গভীর অভিনিবেশ সহকারে অ্যাডাম যে রিপোর্ট প্রস্তুত করেন তা বাংলা-বিহারের শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যবান পরিসংখ্যান ও গবেষণার জন্য সুদীর্ঘকাল যাবত সর্বমহলে প্রশংসিত হয়ে আসছে। প্রধানত দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষার উপর তদন্তকৃত অ্যাডামস রিপোর্টের ব্যাপৃত গবেষণাকাল শুধু তিন বছরই নয়; বরং উনিশ শতকের শুরু থেকে পরবর্তী চার দর্শক পর্যন্ত এদেশের শিক্ষা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য এ রিপোর্ট থেকে জানা যায়। অ্যাডাম শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা বিহারের আর্থ সামজিক অবস্থাও অতি যত্নসহকারে তুলে ধরেছেন। ব্রিটিশ শাসনের বাংলায় উনিশ শতকের প্রথমার্ধে শিক্ষা- সংস্কৃতির তথা সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যে তথ্য- উপাত্তের স্বল্পতা রয়েছে এ রিপোর্টে তার শুন্যতা পূরণে গবেষকদের যথেষ্ট সহায়তা করে। বলা যায়, আধুনিককালে উইলিয়াম অ্যাডামই প্রথম বাংলা তথা ভারতীয় শিক্ষার উপর বিস্তৃত তদন্তের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন। সমসাময়িক যুগে শিক্ষাক্ষেত্রে অ্যাডামস রিপোর্টের ন্যায় এতো বৃহৎ বিশ্লেষণমূলক রিপোর্ট বাংলায় আর প্রকাশিত হয়নি। লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে তৈরি এ রিপোর্টে উনিশ শতকের বাংলা ও বিহারের শিক্ষার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

কিন্তু অ্যাডামস রিপোর্ট খুবই দুস্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। অ্যাডাম রচিত ৩টি রিপোর্ট সর্বপ্রথম ক্রমান্বয়ে ১৮৩৫, ১৮৩৬ ও ১৮৩৮ সালে বাংলা সরকার কর্তৃক পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়। পরে দুর্লভ হয়ে পড়লে সরকার খ্রিস্টান মিশনারি ও ইউরোপীয় শিক্ষাবিদ রেভারেন্ড জেমস লঙ কর্তৃক Calcutta Home Secretariat Press থেকে প্রকাশিত হয়। এটিই পরবর্তীকালে অ্যাডামস রিপোর্ট' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৪১ সালে শিক্ষাবিদ অনাথ নাথ বসুর (১৩০৬-১৩৬৮ বঙ্গাব্দ) সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যাডামস রিপোর্ট পুনরায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তী পঁয়ষট্টি বছরের মধ্যে রিপোর্টটি আর মুদ্রিত হয়নি। অ্যাডাম রিপোর্টে প্রধানত গ্রাম- বাংলার প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান আলোচনা ও শিক্ষার উন্নতির গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন। শিক্ষাব্যবস্থার মূল ভিত্তি প্রাথমিক শিক্ষা। গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষা এখানো দেশের বিরাজমান সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুতরাং রিপোর্ট নতুনভাবে উপস্থাপন, উপলব্ধি ও এর গোটা বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুবই প্রয়োজনীয়। বাংলা ভাষায় এই রিপোর্টের পূর্ণাঙ্গ ও অনুবাদ কোনো গবেষণা এখনো পর্যন্ত হয়নি।

অ্যাডামস রিপোর্ট প্রস্তুতকালে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থায় প্রধাণত ফার্সি ও আরবি, সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষার প্রচলন ছিল। খ্রিস্টান মিশনারিদের কিছু প্রতিষ্ঠানে ইংরেজিও চালু হয়েছিল। এসকল ভাষার মধ্যে ফার্সির গুরুত্ব ছিল তুলনামূলক বেশি। কারণ এটি ছিল আইন- আদালতের ভাষা। ভাষাটি মুসলিম সমাজে বেশ জনপ্রিয় ছিল। পাশাপাশি বাঙালি হিন্দুরাও জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে ফার্সি শিক্ষাগ্রহণ করতেন। ১৮৩৫ সালে অর্থাৎ অ্যাডামসের প্রথম রিপোর্ট তৈরীর সূচনাকালে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম করা হয়। ১৮৩৭ সালে ইংরেজিকে রাজভাষা হিসেবে ঘোষনা করা হয়। ইংরেজি চালু হওয়ার পূর্বে দেশীয় তথা প্রাচ্য- পাশ্চাত্যপন্থীদের মধ্যে ব্যাপক বিতর্ক হয়। অষ্টাদশ শতকের শেষপ্রান্ত থেকেই মিশনারিগণ বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার প্রচার শুরু করেন। মিশনারিদের প্রভাবে ও দেশীয় একশ্রেণীর জনগণের উৎসাহে উনিশ শতকের প্রথম থেকে বাঙালি হিন্দু সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার শুরু হয়। বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার এসব ঘটনাবহুল প্রেক্ষাপট ও যুগান্তকারী পরিবর্তনের সময়ে অ্যাডামস রিপোর্ট প্রকাশিত হয় এবং অ্যাডাম সমসাময়িক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দেশীয় জনগনের শিক্ষার উন্নয়নে মূল্যবান মন্তব্য পেশ করেন। এদিক থেকেও রিপোর্টের আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রবন্ধে অ্যাডামের সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক তদন্ত কমিশন গঠনের পটভূমিও বর্ণনা করা হয়েছে। রিপোর্টে বিহারের শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা থাকলেও পত্রিকার সীমিত পরিসরের জন্য সে অঞ্চলকে বাইরে রাখা হয়েছে। উইলিয়াম অ্যাডাম স্কটল্যান্ডের ডানফার্মলেইনের অধিবাসী ছিলেন। ১৭৯৯ সালে তার জন্ম হয়। প্রথম জীবনে St. Andrews এর ছাত্র অ্যাডামস ১৮১৫ সালে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটিতে যোগ দেন। পরে ব্রিস্টল ও গ্লাসগোতে তিনি সোসাইটির কার্যাবলী সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১৮১৭ সালের জুন মাসে ব্যাপ্টিস্ট মিশনের ব্রিটিশ কমিটি তাকে ভারত পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তিনি ঐ বছরের অক্টোবরে দুজন মিশনারি মি. এবং মিসেস সাটনের সাথে লিভারপুল থেকে সমুদ্রপথে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। ১৮১৮ সালের ১৯ মার্চ তারা ভারতে অবতরন করেন। ১৮১৯ সালের জানুয়ারীতে স্থানীয় মিশনারী- কন্যা মিস Phonebe Grant এর সঙ্গে অ্যাডামের বিয়ে হয়। ভারতের আসার পর তাকে প্রথমে শ্রীরামপুর মিশনে নিয়োগ দেয়া হয়। পরে তাকে Mr. C. C Arotoon এজ সাথে কাজে যোগাদানের জন্য সুরাট গমন করতে হয়। কিন্তু সুরাটে মিশনারি কাজের অনিশ্চয়তার জন্য তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। অতঃপর অ্যাডাম কলকাতায় বাংলা ও সংস্কৃতি চর্চা শুরু করেন যাতে সুষ্ঠুভাবে মিশনের কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। এই সময়ে ভারতীয় হিন্দুজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়ের

(১৭৭৪-১৮৩৩) সাথে অ্যাডামের পরিচয় ঘটে যা তার জীবনে নতুন যুগের সূচনা করে। অ্যাডাম রামমোহন ও ড. ইয়েটসের সাথে অনুবাদের কাজে যুক্ত হন। তিনি খ্রিস্টধর্ম সংক্রান্ত চারটি গ্রন্থ Gospels বাংলায় অনুবাদ করেন। রামমোহন অপর দুই মিশনারি উইলিয়াম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪) ও এলারটনের অনুবাদে তেমন সন্তুষ্ট ছিলেন না। কারণ তাদের কাজে অনেক ভুল ছিল। তাই রামমোহন Dr. Yates এবং অ্যাডামকে গসপেলগুলো সঠিক অনুবাদের জন্য অনুরোধ করেন। এভাবে অ্যাডামের সাথে রামমোহনের বন্ধুত্ব স্থাপন হয় এবং অ্যাডাম তার প্রভাবে unitarian মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠেন। ১৮২১ সালের সেপ্টেম্বরে Calcutta Unitarian Committee গঠিত হলে রামমোহন রায়, এন কার (Kerr) প্রমুখের সাথে অ্যাডামও সমিতিতে যুক্ত হন। তিনি এই সময়ে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি থেকে দূরে সরে আসেন। এছাড়াও ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিদের ধর্মীয় মতবাদের সাথে অ্যাডামের Unitarian মতবাদের পার্থক্য দেখা দিয়েছিল। অ্যাডাম এ সময়ে সাংবাদিকতার সাথেও জড়িত হন। তিনি ১৮২৫ সালে প্রথম Bengal Chronical এবং পরে ১৮২৭ সালে Calcutta Choronicle এর সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। এছাড়াও India Gazette নামে একটি জনপ্রিয় পত্রিকা অ্যাডাম প্রকাশ করেন। এভাবে বাংলা, সংস্কৃত ভাষার চর্চা, মিশনারি ও সাংবাদিকতার কাজের মাধ্যমে অ্যাডাম কলকাতায় পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন।

অ্যাডাম এদেশের জনগণের শিক্ষার ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে আগ্রহী ছিলেন। India Gazette নামে একটি জনপ্রিয় পত্রিকা অ্যাডাম প্রকাশ করেন। এভাবে বাংলা ও সংস্কৃতি ভাষার চর্চা, মিশনারি ও সাংবাদিকতার কাজের মাধ্যমে অ্যাডাম কলকাতায় পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন।

অ্যাডাম এদেশের জনগণের শিক্ষার ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে আগ্রহী ছিলেন। শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে কিভাবে সাধারণ জনগণের উন্নতিসাধন করা যায় সে বিষয়ে তিনি গভীর করে চিন্তা করেছিলেন। সমসাময়িক সংবাদ কৌমুদি (২২ ফেব্রুয়ারী ১৮৩২) থেকে জানা যায় যে, তিনি Hindu Free School চালানোর জন্য দান/অনুদান প্রদান করেছিলেন। কিন্তু অ্যাডামের চিন্তার পরিপূর্ণ প্রতিফলন ঘটানো এতো সহজ কাজ ছিল না। আগেই বলা হয়েছে যে, ভারত আগমনের সময়ে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিবর্তনের জন্য নানা মহল থেকে চেষ্টা হয়েছিল। এক্ষেত্রে দেশীয় শিক্ষার পরিবর্তে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা ছিল উল্লেখ্য। অ্যাডাম যখন বাংলায় আসেন ঠিক সেই মুহূর্তে অর্থাৎ ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে বেসরকারি উদ্যোগে এদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আধুনিক শিক্ষা শুরু হয়। পাশাপাশি রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২), ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) বাঙালি সমাজে নতুন শিক্ষা সম্পর্কে উৎসাহ দান করেছিলেন। এছাড়াও খ্রিস্টান মিশনারীগণ অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদ থেকে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের কাজ চালাচ্ছিলেন। Calcutta School Book Society এবং Calcutta School Society'র প্রচেষ্টাও এক্ষেত্রে উল্লখ্য। অপরদিকে ব্রিটিশ সরকার ১৮১৪ সাল থেকে এদেশে প্রাচ্য তথা দেশীয় শিক্ষাকে উৎসাহ দিয়ে আসছিলেন। ১৮২৩ সালে H.T Prinsep (১৭৯২-১৮৭৮) এবং H.W Wilson (জ. ১৭৮৬৯)- এর নেতৃত্বে গঠিত General Committee of Public Instruction এর সদস্যগণও প্রথমে দেশীয় শিক্ষার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। রাজা রামমোহন রায়ের এবং তার ন্যায় পাশ্চাত্যপন্থীগণ জেনারেল কমিটির ঐ সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেন এবং রামমোহন রায় লর্ড আমর্হাস্টকে এ ব্যাপারে তার বহুল আলোচিত চিঠিও প্রেরণ করেন। মূলত এ সময় থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যপন্থীদের বিতর্কের সূত্রপাত হয়। ১৮৩৩ সালে শিক্ষা বিতর্কে নতুন মোড় দেখা দেয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট জেনারেল কমিটির অনুদান এক লাখ থেকে দশ লাখ টাকায় বৃদ্ধি করে ভারতবাসীর শিক্ষাবিস্তারে ব্যয় করার নির্দেশ দেয়। এই অর্থ শিক্ষা বিস্তারে কিভাবে ব্যয় হবে তা নিয়ে কমিটির সদস্যদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়। জেনারেল কমিটির সদস্যগণ প্রথম প্রাচ্যপন্থী থাকলেও পরে দেশীয় জনগণের একাংশ, খ্রিস্টান মিশনারি, ব্রিটিশ বণিকশ্রেণী ও এক শ্রেণীর ইংরেজ কর্মকর্তাদের চাপে দশজনের মধ্যে পাঁচজন সদস্য পাশ্চাত্যপন্থী হয়ে পড়েন। ফলে দশ লাখ টাকা ভারতবাসীর কোন শিক্ষার জন্য ব্যয় হবে তা নিয়ে শিক্ষা কমিটির সদস্যদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি হয়। এই বিতর্কের ফলে ভারতের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে স্পষ্ট ও সুনির্ধারিত নীতি গ্রহণের চূড়ান্ত সময় উপস্থিত হয়।

পরিস্থিতির এই রঙ্গমঞ্চে তিন ব্যক্তির প্রবেশ ঘটে, যারা ভারতবাসীর শিক্ষানীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। প্রথমজন হলেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক যিনি ১৮২৮ সালে গভর্নর জেনারেল হয়ে ভারত আগমন করেন। দ্বিতীয়জন সুপ্রিম কাউন্সিলের লেজিসলেটিভ সদস্য টমাস ব্যবিংটন মেকলে (১৮০০-১৮৫৯) এবং তৃতীয়জন হচ্ছেন উইলিয়াম অ্যাডাম যিনি তাদের পূর্ব থেকেই ভারতে ছিলেন। অতঃপর শিক্ষা পরিস্থিতির অরাজকতা ও বিতর্কের অবসানে বেন্টিংক উদ্যোগ গ্রহণ গ্রহণ করেন। তিনি মেকলেকে জেনারেল কমিটির সভাপতি নিযুক্ত করে শিক্ষা বিতর্কের নিরসন ও নতুন শিক্ষা প্রণয়নের ব্যাপারে তার সহযোগিতা কামনা করেন। মেকলে ছিলেন চরম পাশ্চাত্যবাদী। তিনি ১৮৩৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি প্রাচ্য শিক্ষার তীব্র সমালোচনা করে ও ইংরেজি মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রর্বতনের আহ্বান জানিয়ে লর্ড বেন্টিংকের নিকট তার বিখ্যাত Minute পেশ করেন।

অ্যাডাম এ সময়ে শিক্ষা পরিস্থিতির উপর ভিন্নমত পোষন করেন। তিনি ইতিমধ্যে এদেশীয় জনগণের ভাষা, রীতি ও ঐতিহ্যের সাথে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নিজেকে সকল বিতর্কের উর্দ্ধে রেখে মত প্রকাশ করেন যে, শিক্ষাকে যদি নৈতিক উন্নতির বাহন হিসেবে ব্যবহার করতে হয় তাহলে কেবল ইংরেজির মধ্যে তাকে আবদ্ধ রাখা অনুচিত হবে। কারণ, প্রস্তাবিত ইংরেজি শিক্ষার ফল শুধু মধ্য ও উচ্চবিত্তগনই ভোগ করতে পারবেন। নিম্ন বা গ্রামীন দরিদ্রশ্রেণী তথা সাধারণ জনগন এর দ্বারা উপকৃত হবে না। অ্যাডাম বলেন যে, সংস্কৃত কিংবা আরবি শিক্ষার পেছনে অর্থ ব্যয় না করে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলো ভুল করছে। শিক্ষানীতিতে অবশ্যই দেশীয় জনগণের প্রচলিত ভাষা বজায় রাখতে হবে যা অনাদিকাল ধরে বাংলা, বিহার তথা ভারতে চলে আসছে। তার এ চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ১৮২৯ সালে লর্ড বেন্টিংকের নিকট অভিমত ব্যক্ত করেন যে, একটি নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে দেশের জনগণের শিক্ষার উপর একটি ব্যাপকভিত্তিক ও গভীর সমীক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে তার

আবেদনের সাড়া পাওয়া যায়নি। পুনরায় ১৮৩৪ সালে তিনি বেন্টিংকের কাছে দেশের শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তদন্তের দাবি জানান। অ্যাডামের মতে, সরকারের পক্ষ থেকে কিছু করার পূর্বে জানা দরকার যে, দেশীয় ব্যবস্থা তার নিজের জন্য কতটুকু করতে পেরেছে। এবার অ্যাডামের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ১৮৩৫ সালের ২ জানুয়ারী বেন্টিংকের অনুরোধে অ্যাডাম তার প্রস্তাবের চূড়ান্ত খসড়া সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করেন। বেন্টিংক অ্যাডামের প্রস্তাবে সম্মত হন এবং ২০ জানুয়ারী ১৮৩৫ সাল অ্যাডামসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে এ বিষয়ে প্রথাগতভাবে একটি কার্যবিবরনী প্রেরন করেন। তদন্ত কমিশনার নিযুক্ত করেন। জেনারেল কমিটির তত্ত্বাবধানে এই নিয়োগদান সম্পন্ন হয় এবং অ্যাডামকে ভ্রমণাদির খরচ ব্যতীত মাসিক ১ হাজার টাকা বেতন প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়। বেন্টিংকের ভাষায় "এই কাজের জন্য অ্যাডাম হচ্ছেন প্রভূতভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি।" তিনি আরো বলেন যে, এই ভদ্রলোক সতের বছর পূর্বে মিশনারি হিসেবে ভারতবর্ষে আগমন করেন, পরে Indian Gazette এর সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। ভাষায় উপর দক্ষতা এবং দেশীয় জনগনের আন্তযোগাযোগ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তাকে অভূতপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছে। অ্যাডাম সম্পর্কে বেন্টিংকের এই বক্তব্যের সম্পর্কে সন্দেহ করা যায় না। এরপরই অ্যাডাম তার অনুসন্ধানের কাজ শুরু করেন। টানা তিন বছর তিনি এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে তিনি বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন জেলা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং নানা শ্রেণীর মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ করে শিক্ষা পরিস্থিতির প্রকৃতস্বরূপ অনুধাবনে সক্ষম হন। দীর্ঘ তিন বছরের সাধনা ও পরিশ্রমের পর তিনি ১৮৩৫, ১৮৩৬ ও ১৮৩৮ সালে বাংলা ও বিহারের শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে পরপর ৩টি রিপোর্ট সরকারের নিকট দাখিল করেন। সরকারের কর্মকর্তা জিএইচ হাটম্যান কর্তৃক প্রকাশিত ৩টি রিপোর্টের প্রকাশকাল ছিল- যথাক্রমে ১ জুলাই ১৮৩৫, দ্বিতীয়টি ২৩ ডিসেম্বর ১৮৩৬ এবং ২৮ এপ্রিল ১৮৩৮। পরে ১৮৬৮ সালে সরকারের নির্দেশে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি বেভারেন্ড জেমস লঙ কর্তৃক Calcutta Home Scretariate Press থেকে রিপোর্টগুলো একখন্ডে Adm's Reports on Vernacular Education in Bengal and Behar, Submitted Government in 1835, 1836 and 1838: with a brief view of its present condition শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশিত হয়। ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে উইলিয়াম বেন্টিংককে লেখা অ্যাডামের চিঠি ২ জানুয়ারী ১৮৩৫) এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে লেখা বেন্টিংক এর Minute টি উল্লিখিত আছে। প্রথম প্রকাশিত কোনো রিপোর্টে এগুলো ছিল না। আবার ১৮৩৬ সালে প্রকাশিত অ্যাডামের দ্বিতীয় রিপোর্টে ৪৮ পৃষ্ঠার একটি পরিসংখ্যানের তালিকা যা পরিশিষ্টরূপে বর্ণিত আছে তা লঙের রিপোর্টে নেই। ১৯৪১ সালে অনাথ নাথ বসু কর্তৃক সম্পাদিত রিপোর্টে ঐ ৪৮ পৃষ্ঠার পরিশিষ্ট সংযুক্ত আছে।

১৮৬৮ সালে জেমস লঙ কর্তৃক প্রকাশিত অ্যাডামস রিপোর্টে ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত যথা- প্রথম অধ্যায় : লঙের লেখা ভূমিকা ৩০ জুলাই, ১৮৬৮ (পৃষ্ঠা ১-৪৬ পর্যন্ত)। এই ভূমিকার আলোচনা ঐতিহাসিক এবং এতে ১৮১৪ থেকে ১৮৬৮ সাল অবধি বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার নানাদিক ও পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় : ১৮৩৫ সালের ২০ জানুয়ারী লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংককে লেখা অ্যাডামের চিঠি (পৃষ্ঠা ১-৯)

তৃতীয় অধ্যায় : অ্যাডামের চিঠির প্রেক্ষাপটে উইলিয়াম বেন্টিংকের পেশ করা Minute (২০ জানুয়ারী ১৮৩৫, পৃষ্ঠা ১০-১৩)।

চতুর্থ অধ্যায় : অ্যাডামের প্রথম রিপোর্ট,স্বাক্ষরিত স্থান ও তারিখ, কলকাতা, ১ জুলাই ১৮৩৫ (পৃষ্ঠা ১৪-৮৪ পর্যন্ত)।

পঞ্চম অধ্যায় : অ্যাডামের দ্বিতীয় রিপোর্ট, স্বাক্ষরিত স্থান ও তারিখ, মুরশিদাবাহ, ২৩ ডিসেম্বর ১৮৩৬ (পৃষ্ঠা ৮৫-১৪২ পর্যন্ত)।

ষষ্ঠ অধ্যায় : অ্যাডামের তৃতীয় রিপোর্ট, স্বাক্ষরিত স্থান ও তারিখ, কলকাতা, ২৮ এপ্রিল ১৮৩৮ (পৃষ্ঠা ১৪৩-৩৪২ পর্যন্ত)।

অ্যাডামের প্রথম রিপোর্ট :

প্রথম রিপোর্টের শিরোনাম ছিল First Report on the State of Education in Bengal. মোট একাত্তর পৃষ্ঠার রিপোর্টের শুরুতেই অ্যাডাম তার অনুসন্ধানের লক্ষ্য সম্পর্কে বলেন যে, কোনো দেশ, সরকারের পক্ষ থেকে কি কাজ প্রত্যাশা করে জানার আগে এটা জেনে নেয়া প্রয়োজন সেই দেশ বা দেশের জনগন নিজের মঙ্গলার্থে কি করছে কিংবা এখানো করছে। তিনি বলেন যে, একটি দেশের শিক্ষার অগ্রগতি নির্ভর করে প্রথম কিভাবে বা কি পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তার উপর, দ্বিতীয়ত জনসংখ্যার অনুপাতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার উপর তৃতীয়ত সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অঞ্চল ও জনসংখ্যা ভেদে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্যাসের উপর। অ্যাডাম এই দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্য অনুসন্ধান ও সংগ্রহ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেন।

অ্যাডাম প্রথম রিপোর্টের তথ্য ও পরিসংখ্যান বেন্টিংককে চিঠি লেখার অনেক আগেই সংগ্রহ করেছিলেন এবং রিপোর্টে এসব তথ্য উপাত্তের সাথে তার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন। রিপোর্টটি মূলত অ্যাডামের এই দেশে অবস্থানের দীর্ঘ ১৭/১৮ বছরের অভিজ্ঞতার ফসল। তার মতে, প্রধানত ৫ টি মূল উৎসের উপর ভিত্তি করে প্রথম রিপোর্ট তৈরি করা হয়।

১. ড. ফ্রান্সিস বুকাননের (পরে হেমিল্টন) রিপোর্টসমূহ,
২. জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন বা জনশিক্ষা পরিচালকের সংরক্ষিত উপাত্তসমূহ,
৩. ওয়াল্টার হেমিল্টনের ইস্ট ইন্ডিয়া গেজেটিয়ার (২য় খন্ড, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৮২৮),
৪. মিশনারী, বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়ের রিপোর্টসমূহ,
৫. টমাস ফিশারের স্মৃতিকথা (১৮৩২ সালের ১৬ আগস্ট অ্যাফেয়ার্স অব ইন্ডিয়া কোম্পানীর উপয়া হাউস অব কমন্সের সিলেক্ট কমিটির পক্ষ থেকে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল তার পরিশিষ্টে এটি সংযুক্ত আছে)

এছাড়া রিপোর্ট তৈরিকালে অন্যান্য প্রয়োজনীয় উৎসও ব্যবহার করা হয়েছিল। উল্লিখিত উৎসের ভিত্তিতে প্রথম রিপোর্টের মূল আলোচ্য বিষয়গুলো ছিল নিম্নরূপঃ

ক) বাংলার বিভিন্ন জেলার জনসংখ্যা,
খ) দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ) প্রাথমিক বিদ্যালয় কিন্তু দেশীয় নয়,
ঘ) জ্ঞান ভিত্তিক দেশীয় বিদ্যালয়, বিশেষত ধর্ম প্রভাবিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,
ঙ) দেশীয় বালিকাদের বিদ্যালয়,
চ) ইংরেজি বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়।

অ্যাডাম বাংলার শিক্ষা পরিস্থিতি আলোচনার জন্য দেশের জনসংখ্যার বিষয়টি গুরুত্বপূর্নভাবে তুলে ধরেন। কারণ শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা,অনুপাত নির্ণয়ের জন্য জনসংখ্যার পরিসংখ্যান জানা একান্তভাবে প্রয়োজন। অ্যাডাম উল্লেখ করেন যে, ১৮০১ সালের পূর্বে ভারতের কোথাও জনসংখ্যার প্রকৃত অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়নি। লর্ড ওয়েলসলির শাসনামলে সর্বপ্রথম বোর্ড অব রেভেন্যু কর্তৃক বিভিন্ন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরদের কাছে জনসংখ্যা ও সম্পদের হিসাব জানতে চেয়ে বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়। এর প্রত্যুত্তরে বিভিন্ন জেলা থেকে যে পরিসংখ্যান পাঠানো হয় তার সূত্র ধরে সংশ্লিষ্ট কাজের সমাধা করা হয়। এই সময়ে ঢাকা, জালালপুর (সম্ভবত জামালপুর), চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, বাকেরগঞ্জ, ত্রিপুরা, যশোর, নদীয়া, মেদেনীপুর, হুগলি, সিলেট, মুর্শিদাবাদ, বীর ভূম প্রভৃতি জেলার জনসংখ্যার গণনা করা হয়। পরবর্তীকালে ১৮০৭-১৮০৯ সালে ফ্রান্সিস বুকানন রংপুর, দিনাজপুর ও পূর্ণিয়ায় এবং ১৮১৩-১৪ ও ১৮২২ সালে বিভিন্ন জেলার ম্যাজিস্ট্রেটগণ ১৮০১ সালের সূত্র ধরেই জনসংখ্যার হিসাবে নির্ণয় করেন। এসব সূত্রের ভিত্তিতে অ্যাডাম প্রথম রিপোর্টে যেসব জেলার জনসংখ্যা উল্লেখ করেন তার পরিসংখ্যান ১নং সারনিতে তুলে ধরা হলো।

১নং সারণির পরিসংখ্যানে বাংলার প্রধান জেলাগুলোর জনসংখ্যার চিত্র ও হিন্দু মুসলিম তারতম্যের অবস্থা জানা যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, কলকাতা শহরের মোট দুই লাখ অধিবাসীর মধ্যে এক লাখ লোক প্রতিদিন আশপাশের অঞ্চল থেকে শহরে আসা-যাওয়া করতো। সারণিতে লক্ষ্যনীয় যে- রংপুর, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও যশোরে মুসলিম জনসংখ্যা হিন্দুদের তুলনায় বেশি রয়েছে। তবে চট্টগ্রামে শুধুমাত্র বাঙালি অধিবাসীদের সংখ্যা উল্লিখিত হয়েছে। অবাঙালি মগ বা উপজাতিদেরকে এখানে ধরা হয়নি। এছাড়া দেখা যায় যে, ঢাকা- জামালপুর ব্যতীত বাকি জেলাগুলোতে হিন্দু, সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ অবস্থায় রয়েছে। অ্যাডাম ওয়াল্টার হ্যামিলটনের সূত্রে দেশের মোট জনসংখ্যার পরিসংখ্যানে বলেন যে, বাংলা- বিহারে মোট ৪ কোটি অধিবাসীর বসবাস। আর এই ৪ কোটি অধিবাসীর জন্য প্রায় ১ লাখ দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। অ্যাডামের এই বক্তব্য নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। তবে পরবর্তীকালে ১৮৮২ সালে গঠিত প্রথম সর্বভারতীয় শিক্ষা কমিশনের বক্তব্য অ্যাডামের মতকে অনেকটা সমর্থন করে। অ্যাডাম বলেন, এই এক লাখ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তথ্য তিনি জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের এক সদস্যের Minute থেকে সংগ্রহ করেন। ঐ মিনিটে বলা হয় যে, বাংলা ও বিহারে প্রতিটি গ্রামের বিদ্যালয়ের পেছনে প্রতিমাসে এক টাকা ব্যয়ের প্রয়োজন হবে। এভাবে বছরে সকল বিদ্যালয়ের পেছনে ১২ লাখ টাকার কিছু কম খরচের প্রয়োজন হবে। এর ভিত্তিতে অ্যাডাম ধারণা করেন যে, **[বাংলা- বিহারের বিদ্যালয়ের সংখ্যা এক লাখ এবং জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতি ৪শ' জনের জন্য ১টি বিদ্যালয় রয়েছে। অ্যাডাম আরো উল্লেখ করেন যে, সরকারিভাবে বাংলা-বিহারের গ্রামের সংখ্যা ১৫০.৭৪৮ টি এবং সকল গ্রামে সম্পর্ণভাবে না হলেও বেশিরভাগ গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। যদি এটাও স্বীকার করা হয় যে, এক তৃতীয়াংশ গ্রামে বিদ্যালয় নেই, তবুও ১ লাখ গ্রামে একটি করে বিদ্যালয় বিদ্যমান রয়েছে।]** অ্যাডাম বলেন যে, মোট জনসংখ্যার ১১/৩০ অংশ অনুর্দ্ধ ১৪ বছর বয়সী এবং এই সংখ্যার ৩/৭ অংশ যাদের বয়স ৭-১৪ বছরের মধ্যে তারা বিদ্যালয়ে গমন করে। এভাবে অ্যাডামের হিসাবে গমন ও পরিত্যাগের মাধ্যমে একটি বিদ্যালয়ে যাবার উপযুক্ত বয়সধারী ছাত্রের মধ্যে শেষ পর্যন্ত প্রায় অর্ধাংশ লেখাপড়া চালিয়ে যায়। এর ফলে অ্যাডামের হিসাবে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় প্রতি ৪শ জনের মধ্যে ৬৩ জন এবং বিদ্যালয় পরিত্যাগের মাধ্যমে গড়ে ৩১ অথবা ৩২ জন ছাত্র টিকে থাকে।

অ্যাডাম প্রথম রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, কলকাতায় ২১১ টি বিদ্যালয় ছিল যাদের মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪৯০৮ জন। প্রতিটি বিদ্যালয়ে গড় ছাত্রসংখ্যা ২৩ জনের কিছু বেশি ছিল এবং ৯৪৮ জন অধিবাসীর জন্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১টি। দুই লাখ জনসংখ্যার অধিবাসী এই শহরে বিদ্যালয়ে যাবার বয়সী মোট কিশোর বা বালকের সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের কম বালক দেশীয় বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতো। অ্যাডাম কলকাতায় অবস্থিত নানা ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বর্ণনা করেছেন। এগুলো পরিচালিত হতো নানা প্রতিষ্ঠান, সম্প্রদায় বা সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তির মাধ্যমে। দেশীয় বিদ্যালয়গুলোর একটি অংশ কলকাতা স্কুল সোসাইটির

স্মরণি- ১

বাংলার বিভিন্ন জেলায় হিন্দু- মুসলিম জনসংখ্যার তুলনামূলক তথ্য ১৮০১ থেকে ১৮১৪

সাল	জেলা/শহর	মোট জনসংখ্যা	হিন্দু	মুসলিম
১৮০১	চব্বিশ পরগণা	১,৬২,৫০০	*	*
১৮১২	কলকাতা (শহর)	২,০০,০০	১,১৮,২০৩	৪৮,১৬৩
১৮০১	মেদিনিপুর	১,৫০,০০০	*	১/৭
১৮০১	হুগলি	১,০০,০০০	৩/৪	১/৪
১৮৩১-১৪	বর্ধমান	১,৪৪৪৪৮৭	৪/৭	১/৬
১৮০১	যশোর	১২০০০০	৭/১৬	৯/১৬
১৮০১	নদীয়া	৭৬৪৪৩০	*	২৮৬৬৬১
১৮০১	ঢাকা শহর ও জামালপুর	৯৩৮৭১২	১/২	১/২
১৮০১	বাকেরগঞ্জ	৯২৬৭২৩	৫/৮	৩/৮
১৮০১	চট্টগ্রাম	১২০০০০০	২/৭	৩/৫
১৮০১	ত্রিপুরা	৭৫০০০০	৪/৭	৩/৭
১৮০১	ময়মনসিংহ	১৩০০০০০	২/৭	৫/৭
১৮০১	সিলেট	৪৯২৭৪৫	৩/৫	২/৫
১৮০১	মুর্শিদাবাদ (শহর)	১০২০৫৭২	২/৩	১/৩
১৮০১	বীরভূম	৭০০০০০	৩০/৩১	১/৩১
১৮০১	রাজশাহী	১৫০০০০০	২/৩	১/৩
১৮০৯	রংপুর	২৭৩৫০০০	১১৯৪৩৫০	১৫৩৬০০০
১৮০৮	দিনাজপুর	৩০০০০০০	৯০০০০০	২১০০০০০

তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো। **[এগুলোতে বাংলা ভাষা, ভূগোল, নীতিবিদ্যা ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া হতো। এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার কাঠামো বেশ উন্নত ছিল বলে অ্যাডাম উল্লেখ করেন। ১৮২৫ সালে কোম্পানীর কোর্ট অব ডাইরেক্টরস স্কুল সোসাইটিকে প্রতি বিদ্যালয়ের জন্য ৫শ টাকা অনুদানের ব্যবস্থা করে যার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের মধ্যে দেশীয় শিক্ষার উপযুক্ত শিক্ষক তৈরি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।]**

দেশীয় বিদ্যালয় যেগুলোতে শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে ছিল বাংলা সেগুলোতে নানা বর্ণের হিন্দু ও মুসলিম ছাত্ররাও পড়াশোনা করতো। তবে মুসলিম পরিচালিত এ ধরনের বাংলা বিদ্যালয় তখন ছিল না বলে এ্যাডাম উল্লেখ করেন। তিনি বলেন চব্বিশ পরগনায় অনেক দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল যেগুলোর সব তথ্য সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

কলকাতায় কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল খ্রিস্টান মিশনারি বা ইউরোপীয়ানদের দ্বারা পরিচালিত যেগুলোকে অ্যাডাম প্রাথমিক তবে দেশীয় বিদ্যালয় নয় উল্লেখ করেছেন। এসব বিদ্যালয়ে প্রধানত ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হতো। যেসব মিশনারি প্রতিষ্ঠান এসব বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করতো সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো চার্চ মিশনারি সোসাইটি, বেঙ্গল অক্সিলারি (Auxilary) মিশনারি সোসাইটি, ক্যালকাটা ডায়োসেশন কমিটি, ইত্যাদি। এর মধ্যে চার্চ মিশনারি সোসাইটির অধীনে কলকাতা শহরে ও আশপাশের গ্রামে ১৩ টি বিদ্যালয় ছিল যেগুলোর ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬০০ জন। এছাড়াও শুধু খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র দুটি বিদ্যালয় ছিল যেগুলোর ছাত্রসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭০ ও ৩৯ জন। এছাড়া বেহালায় একটি বিদ্যালয় ছিল যেটির সাথে চার্চ মিশনারি সোসাইটির যোগাযোগ ছিল। সেখানে ১শ জন ছাত্র অধ্যয়ন করতো। মিশনারিদের বিদ্যালয়ে পুরনো ও নতুন বাইবেল, ব্যাকরণ, ভূগোল, অংকশাস্ত্র ইত্যাদি পড়ানো হতো। ডায়োসেশন কমিটির তত্ত্বাবধানে ১১টি বিদ্যালয় ছিল যেগুলোর ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬৯৭ জন। এ সকল বিদ্যালয়েও খ্রিস্টধর্মের ইতিহাস, ইংরেজি, বাংলা পড়ানো হতো। মিশনারিদের বিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রায় সবাই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত। এক ধরনের দেশীয় বিদ্যালয় ছিল যেগুলো হিন্দু অথবা মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত হতো এবং এগুলো ছিল ধর্ম প্রভাবিত। অ্যাডাম এ জাতীয় বিদ্যালয়কে Indigenous School of Learning বলে অভিহিত করেছেন। হিন্দু বিদ্যালয়সমূহে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিক্ষা দেয়া হতো। অনেক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের থাকা- খাওয়া ও পোশাক প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। হিন্দু জমিদারগণ এ ব্যাপারে আর্থিক সহায়তা দান করতেন। অ্যাডামের মতে বাংলার প্রত্যেক জেলায় এ জাতীয় ১শ'টি বিদ্যালয় বিরাজমান ছিল। এসব বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ১০ হাজার ৮শ' জন এবং ছাত্র-শিক্ষক মিলিত সংখ্যা ছিল ১২ হাজার ৬শ' জন। অ্যাডাম হিন্দু মহাবিদ্যালয়ের কথাও বর্ণনা করেন যেগুলো ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিচালিত ছিল। তার মধ্যে কলকাতার হিন্দু কলেজ (১৮১৭) ছাড়া আরো বাংলার ৩টি কলেজের বর্ণনা অ্যাডাম প্রথম রিপোর্টে উল্লেখ করেন। এ সকল উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাহিত্য, আইন, ব্যাকরণ, দর্শনশাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্রসহ হিন্দু ধর্মীয় তত্ত্ব পড়ানো হতো।

অ্যাডাম মুসলমানদের বিদ্যালয় ও জ্ঞান অর্জন সম্পর্কে বলেন যে, মুসলমানরা শিক্ষাকে শুধু জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেননি, তারা শিক্ষাকে নৈতিক ও ধর্মীয় চিন্তার উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন। এ লক্ষ্যে মুসলিম বিদ্যালয়ের পন্ডিতগণ ছাত্রদেরকে শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যাচর্চাকেই তাদের জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করতেন বলে অ্যাডাম প্রথম রিপোর্টে উল্লেখ করেন। ছাত্রের সাফল্য ও উন্নতি সম্পূর্ণরূপে তার ব্যক্তিগত পরিশ্রমের উপর নির্ভর করতো। শিক্ষক বা ছাত্র কোন পক্ষের উপরই তেমন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল না। ছাত্রদের উপস্থিতি এবং নিয়োগ প্রদান উভয়পক্ষের মধ্যস্থতার বা সমঝোতার উপর নির্ভর ছিল। শিক্ষা পদ্ধতিতে বিশেষ কোনো বিধি মেনে চলা হতো না। ছাত্র- শিক্ষকের সামান্য মতাবিরোধেই ছাত্রের শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটতো বা ছাত্ররা শিক্ষক পরিবর্তন করতো। মুসলিম পরিচালিত বিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্য কোনো বেতন ধার্য ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে মুসলিম ছাত্ররা শিক্ষকের বাড়ীর স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে বাস করতো এবং অনেক শিক্ষক ছাত্রের সম্পূর্ন ভরনপোষণের ভার গ্রহণ করতেন। তার

> শিক্ষকদের মাসিক বেতন ছিল তিন টাকা। শিক্ষার্থীরা দুই থেকে আট আনা পর্যন্ত বেতন প্রদান করতো। এছাড়াও প্রতিটি ছাত্র শিক্ষকগনকে মাস শেষে চাল, তেল ডাল লবণ এবং সবজি প্রদান করতো যাতে অন্তত একদিনের আহার সরবরাহ হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদ্যালয় পৃষ্ঠপোষনকারী পরিবার শিক্ষকদের ভরনপোষণের দায়িত্ব নিতো। যে সকল ছাত্র যতদিন গাছের পাতায় লিখতো তারা চার থেকে আট আনা পারিতোষক এবং যখন তারা কাগজে লেখার যোগ্যতা অর্জন ...

পরিবর্তে শিক্ষার্থী শিক্ষকের ব্যক্তিগত সেবা বা বাড়ির গৃহস্থালীর কাজ করতো। প্রাথমিক মুসলিম ছাত্ররা ফার্সী ভাষার উপর জ্ঞানলাভ করতো। পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিক্ষকের নিকট আরবি সাহিত্য ধর্মতত্ত্ব, আইন ইত্যাদি বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জন করতো। এভাবে শিক্ষালাভ করে মুসলিম ছাত্ররা মুন্সী' উপাধি লাভ করতো। পাশাপাশি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আইন-আদালতে চাকরি লাভের যোগ্যতাও তারা অর্জন করতো। প্রথম রিপোর্টে কলকাতা ও আশে পাশে মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়

সম্পর্কে তেমন বিবরণ পাওয়া যায় না। অ্যাডাম এখানে মুসলমানদের জন্য শুধু কলকাতা মাদ্রাসার কথা উল্লেখ করেন যেটি ওয়ারেন হেস্টিংসের দ্বারা ১৭৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। অপরদিকে মি. ওয়ার্ডের সূত্রে অ্যাডাম বলেন, ১৮১৮ সালে কলকাতায় ২৮টি হিন্দু বিদ্যালয় ছিল যেগুলোর ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৭৩ জন। অ্যাডাম প্রথম রিপোর্টের বর্ণনায় দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়ের বর্ণনা করেন, যেগুলো খ্রিস্টান মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত ছিল। মিশনারি, প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শ্রীরামপুর মিশন, চার্চ মিশনারি সোসাইটি নারী শিক্ষার বিস্তারে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। নারী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে কলকাতায় তখন Ladies Society নামে একটি সমিতি হয়েছিল যাদের অধীনে দশটি বালিকা বিদ্যালয় পরিচালিত ছিল। তার মধ্যে সার্কুলার রোডের একটি বিদ্যালয়ে ৫০ জন ছাত্রী অধ্যয়ন করতো। অ্যাডাম বলেন, এই সময়ে মিস বুক (পরের মিসেস উইলসন) নামে একজন ইউরোপীয়ান মহিলা নারী শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি চার্চ মিশনারি সোসাইটিতে যুক্ত ছিলেন। ১৮২৪ সালে এই সোসাইটির অধীনে কলকাতায় ২৪টি বালিকা বিদ্যালয় ছিল যেগুলোর ছাত্রীসংখ্যা ছিল ৪০০ জন।
****

শিক্ষকদের মাসিক বেতন ছিল তিন টাকা। শিক্ষার্থীরা দুই থেকে আট আনা পর্যন্ত বেতন প্রদান করতো। এছাড়াও প্রতিটি ছাত্র শিক্ষকগনকে মাস শেষে চাল, তেল ডাল লবণ এবং সবজি প্রদান করতো যাতে অন্তত একদিনের আহার সরবরাহ হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদ্যালয় পৃষ্ঠপোষনকারী পরিবার শিক্ষকদের ভরনপোষণের দায়িত্ব নিতো। যে সকল ছাত্র যতদিন গাছের পাতায় লিখতো তারা চার থেকে আট আনা পারিতোষক এবং যখন তারা কাগজে লেখার যোগ্যতা অর্জন করতো আট আনা থেকে এক টাকা পর্যন্ত মাসিক বেতন বিদ্যালয়ে প্রদান করতো। প্রতিটি বিদ্যালয়ের গড় ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩০ জন। জনবহুল অঞ্চলে ছিল আরো বেশি এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছিল অনেক কম। শিক্ষকগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ, নয় শূদ্র। সাধারণত ছাত্ররা ছয় বছর বয়সে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতো এবং চার- পাঁচ বছর বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণ করতো। হুগলিতে মুসলিম সমাজেরও কিছু দেশীয় বিদ্যালয় ছিল। এগুলোতে নির্বাচিত বা বাছাইকৃত ছাত্রদের ভর্তির সুযোগ ছিল। এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের একাংশ ছিলেন স্বাধীন এবং একাংশ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। অ্যাডাম বলেন, এখানের মুসলিম পরিচালিত বিদ্যালয়ে ছাত্রদের লেখাপড়ায় নানা সমস্যা ছিল। বাছাইপর্ব প্রায়ই সঠিক হতো না। শিক্ষকগণ ব্যক্তিগত পছন্দসই ছাত্রকে শিক্ষা প্রদানের অগ্রাধিকার দিতেন এবং শিক্ষা প্রদান বা পদ্ধতিও ছিল ত্রুটিযুক্ত ও নিম্নমানের। তবে অ্যাডামের বর্ণনায় জানা যায় যে, এ অঞ্চলের পাণ্ডুয়াতে একদা মুসলিম জমিদারগন শিক্ষাক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং এখানে এমন একজন স্বচ্ছল মুসলিম কৃষকের অভাব ছিলনা। যারা কিনা সাধারণের উন্নতির জন্য বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষন করেনি। কিন্তু বর্তমানে দারিদ্রতার জন্য এই শ্রেণীর মানুষ ও বিদ্যালয় পাওয়া দুর্লভ। অপরদিকে হিন্দু বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা হুগলিতে ছিল যথেষ্ট। শহরে এ ধরনের প্রায় ১৪টি মহাবিদ্যালয় ছিল যেখানের মূল পাঠ বিষয় ছিল তর্কশাস্ত্র। হেমিল্টনের মতে, ১৮০১ সালে হুগলিতে মোট ১৫০টি বিদ্যালয় ছিল। যেগুলোতে হিন্দুধর্ম ও আইন সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হতো। ত্রিবেণী শহরেও এ ধরনের ৮টি মহাবিদ্যালয় ছিল যার একটিতে পন্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন অধ্যাপনা করতেন। তিনি ১০৯ বছর বেঁচে ছিলেন। **[কিন্তু মুসলিম বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল তুলনামূলক কম। অ্যাডাম তার মধ্যে হাজী মুহম্মদ মহসীনের (১৭৩২-১৮১২) দানকৃত অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করেন। ইংরেজ সরকারের অনুগত উমসি উদ-দিন ছিলেন এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। ১৮২৪ সালে এ প্রতিষ্ঠানে ২৫ জন শিক্ষার্থী ছিল যারা প্রধানত ফার্সি শিক্ষা গ্রহণ করতো। এছাড়াও হুগলিতে কয়েকটি মাদ্রাসা ছিল কিন্তু বর্তমানে সেগুলোর কোনো অস্তিত্বই নেই বলে অ্যাডাম উল্লেখ করেন।]**

হুগলিতে দেশীয় বালিকাদের জন্য বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ছিল যেগুলো খ্রিস্টান মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত হতো। ১৮১৮ সালে রবার্ট মে সেখানে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। চুচুঁড়াতে বাঙালি মেয়েদের একটি বিদ্যালয়ে প্রায় ২৫ জন ছাত্রী অধ্যয়ন করতো এসব বিদ্যালয়ে প্রধানত খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা প্রদান করা হতো। হুগলির অনুরূপ বর্ধমানেও নারী শিক্ষা প্রধানত মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত ছিল। কলকাতা লেডিস সোসাইটি, ব্যাপ্টিস্ট ফিমেল সোসাইটির মতো কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নারী শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করতো। এসব সোসাইটির প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায় ১শ জন মেয়ে শিক্ষার্থী ছিল। বর্ধমানে হিন্দু বা মুসলিমন ধর্ম সম্পর্কিত কোনো বিদ্যালয় ছিল না। এখানের দেশীয় বিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান অ্যাডাম বিস্তারিত উল্লেখ করেননি।

যশোর জেলার বিবরণেও দেশীয় বা ধর্ম প্রভাবিত বিদ্যালয়ের অবস্থা সম্পর্কে তেমন জানা যায় না। এখানে শ্রীরামপুর মিশনারি কর্তৃক ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। যেগুলোর ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭১ জন। প্রথম সারণিতে ১৮০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ঢাকা শহর ও জামালপুরের লোকসংখ্যা বর্ণিত হয়েছে। লোক গণনা অনুসারে শুধু ঢাকা শহরে জনখ্যা ছিল দুই লাখ। তার মধ্যে ১৩০/২৭৫ ভাগ হিন্দু ১৪৫/২৭৫ ভাগ মুসলিম ছিল। কিন্তু নানা কারণে ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা পরবর্তীকালে হ্রাস পায়। ১৮৩০ সালের আদমশুমারীতে দেখা যায়, এ শহরের লোকসংখ্যা মাত্র ৬৬৯০৯ জন। তার মধ্যে ৩১,৪২৯ জন হিন্দু ৩৫,২৩৮ জন মুসলিম, ৩২২ জন অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। অ্যাডাম এই জনসংখ্যার হ্রাসের পেছনে কটন শিল্পের ব্যবসা বিনষ্টের কথা উল্লেখ করেন। বলাবাহুল্য যে, ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবেই বাংলায় এ ধরনের ব্যবসা হ্রাস পাচ্ছিল যা এদেশের অর্থনৈতিক মন্দার একটি কারণ ছিল।

অ্যাডাম বলেন, ঢাকা ও জামালপুরের অধিবাসীগণ সাধারণত বাংলা ভাষায় কথা বলতো। ঢাকা জেলায় বিত্তবান হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত অসংখ্য দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। তবে প্রকৃত ছাত্র ও বিদ্যালয়ের সংখ্যা রিপোর্টে জানা যায় না। হেমিল্টনের সূত্রে অ্যাডাম ঢাকায় হিন্দুধর্ম প্রভাবিত বিদ্যালয়ের উল্লেখ করেন। মুসলমানদের নিজস্ব কোনো বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব তিনি লক্ষ্য করেননি, যদিও ঢাকা ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল। ঢাকায় মিশনারিদের দ্বারা ৮টি বালিকা বিদ্যালয় ছিল যেগুলোতে মোট ২৪৯ জন ছাত্রী অধ্যয়ন করতো। এছাড়াও মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত অন্যান্য বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ছিল। ১৮০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী চট্টগ্রামে ৩/৫ ভাগ মুসলিম ও ২/৫ ভাগ হিন্দু ছিল। তবে আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, অবাঙালি মগ বা

চট্টগ্রাম জেলার বর্ণনায় অসংখ্য দেশীয় বিদ্যালয়ের কথা জানা গেলেও এর প্রকৃত সংখ্যা ও শিক্ষার্থীর সম্পর্কে রিপোর্টে বিস্তারিত বিবরণ নেই। চট্টগ্রামে শ্রীরামপুর মিশন দুটি বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষন করতো। অ্যাডাম এখানের কিছু প্রতিষ্ঠানকে হিন্দুস্তানী বিদ্যালয় হিসেবে উল্লেখ করেন যেগুলোর বেশিরভাগ ছাত্র ছিল মুসলিম। এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে আরবি-ফার্সি ও হিন্দুস্তানী ভাষা শিক্ষা দেয়া হতো। এছাড়াও মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত কয়েকটি বিদ্যালয় প্রসঙ্গে অ্যাডাম আলোচনা করেন। Meer Hinja (সম্ভবত হামজা যার নামে শহরে এখনো বর্তমান

উপজাতীয়গণ এই পরিসংখ্যানে অন্তভূক্ত হয়নি। এছাড়া দীর্ঘকাল ধরে এখানে ছিল বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বসবাস। অ্যাডাম উল্লেখ করেন যে, ১৭৮৫ সালে আরাকান বার্মার দখলে আসলে অনেক মগ চট্টগ্রাম অঞ্চলে অভিগমন করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। ১৮২৪ সালে পুনরায় এক যুদ্ধের মাধ্যমে আরাকান ব্রিটিশ ভারতের অন্তভূক্ত হয়। আরাকানের এই অভিবাসী মগরাও ছিল বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভূক্ত। **[অ্যাডাম বলেন, বাঙালিদের পাশাপাশি মগ জনগোষ্ঠীও ছিল নেটিভ বা দেশীয়দের অন্তভূক্ত। মগ পুরুষগণ বাঙ্গালিদের মতোই পোশাক পরিধান করতো। কিন্তু মহিলারা আরাকানি বা পাহাড়ি পোশাকে সজ্জিত থাকতো। অ্যাডাম মগদের সামাজিক অন্যান্য প্রসঙ্গে আলোচনা করলেও তাদের শিক্ষা সম্পর্কে কোনো বক্তব্য উল্লেখ করেননি।]**

চট্টগ্রাম জেলার বর্ণনায় অসংখ্য দেশীয় বিদ্যালয়ের কথা জানা গেলেও এর প্রকৃত সংখ্যা ও শিক্ষার্থীর সম্পর্কে রিপোর্টে বিস্তারিত বিবরণ নেই। চট্টগ্রামে শ্রীরামপুর মিশন দুটি বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষন করতো। অ্যাডাম এখানের কিছু প্রতিষ্ঠানকে হিন্দুস্তানী বিদ্যালয় হিসেবে উল্লেখ করেন যেগুলোর বেশিরভাগ ছাত্র ছিল মুসলিম। এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে আরবি-ফার্সি ও হিন্দুস্তানী ভাষা শিক্ষা দেয়া হতো। এছাড়াও মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত কয়েকটি বিদ্যালয় প্রসঙ্গে অ্যাডাম আলোচনা করেন। Meer Hinja (সম্ভবত হামজা যার নামে শহরে এখনো বর্তমান হামজারবাগ) ও মৌলবি আলী মেচতুলাল খান সমকালে চট্টগ্রামে মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ১৮২৭ সালে জেলা কালেক্টরের রিপোর্টে জানা যায় যে, মীর হিনজা একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য জমি দান করেন। এটি ১৭৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে মৌলবি আলী মেচ এই মাদ্রাসার ৫০ জন ছাত্র ও ৩ জন শিক্ষকের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা করেন। শিক্ষকদের একজন আরবি- ফার্সি শিক্ষা দিতেন। পরে এই মাদ্রাসার ছাত্রসংখ্যা ১৫০ জনে উন্নীত হয়।

ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত ময়মনসিংহে প্রায়ই বন্যা হতো বলে উল্লেখ আছে। এখানে প্রতি ৫ জনে ৩ জন ছিল মুসলিম। কিন্তু মুসলমানদের জন্য কোনো বিদ্যালয় ছিল না। তবে প্রত্যেক পরগনায় হিন্দুদের জন্য প্রচুর শিক্ষা পতিষ্ঠান ছিল। হেমিল্টনের সূত্রে অ্যাডাম বলেন, সিলেটে হিন্দু বা মুসলিম ধর্ম, আইন ইত্যাদি সম্পর্কীয় কোনো বিদ্যালয় ছিল না। তবে জেলার কোনো কোনো অঞ্চলে কিছু ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান ছিল যেখানে ছাত্ররা পড়ালেখার শুধু প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করতো। এছাড়া মুসলিম সুফী শাহজালাল (রঃ) এর সমাধিস্থলের পাশে একটি মাদ্রাসার কথা উল্লেখ করলেও অ্যাডাম বর্ণনা করেন যে, সেটি বর্তমানে সরকারি- বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে নানা সমস্যায় জর্জরিত আছে। অ্যাডামের প্রথম রিপোর্টে জানা যায় যে, ১৮০১ সালে মুর্শিদাবাদের ২/৩ ভাগ অধিবাসী ছিল হিন্দু ও ১/৩ ভাগ ছিল মুসলিম। এই সময়ে এখানে মুসলমানদের জন্য বিদ্যালয় ছিল ১টি। আর হিন্দুদের ধর্ম ও আইন শিক্ষার জন্য ২০টি শিক্ষায়তন ছিল। ১৮২৬ সালে মুর্শিদাবাদের নিজামত পরিবারের শিক্ষার জন্য জন্য একটি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজ সরকার প্রতি মাসে ১৫০০ টাকা এ কলেজে অনুদান প্রদান করতেন। এছাড়া মুর্শিদাবাদে মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়ে ৩০ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করতো। ১৮০১ সালে রাজশাহী জেলায় মোট অধিবাসীর ১/৩ ভাগ ছিল মুসলিম ও ২/৩ ভাগ ছিল হিন্দু। প্রথম রিপোর্টে এই সময়ে রাজশাহীর দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষার পরিস্থিতি সম্পর্কে অ্যাডাম বিস্তারিত আলোচনা করেননি। দ্বিতীয় রিপোর্টে এ জেলার শিক্ষা সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত বর্ণনা দেন যা আলোচ্য প্রবন্ধের সংশ্লিষ্ট স্থানে বর্ণিত হবে। অ্যাডাম বলেন, ১৮৩৪ সালে এক ইংরেজ ভদ্রলোকের তত্ত্বাবধানে এখানে একটি বিদ্যালয় পরিচালিত ছিল এছাড়া এ জেলার হিন্দু ধর্মীয় বিধান ও আইন সম্পর্কিত প্রচুর বিদ্যালয় ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। অপরদিকে মুসলমানদের জন্য নিজস্ব কোনো বিদ্যালয় অ্যাডাম লক্ষ করেননি।

ড. বুকাননের বিবরণ সূত্রে অ্যাডাম বলেন, ১৮০৯ সালে রংপুরের অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ট। রংপুরের ২৭৩৫০০০ জন অধিবাসীর মধ্যে ২০৬৬০০০ জন ছিল কৃষিজীবী। কৃষকদের অধিকাংশ ছিল হিন্দু এবং কিছু অংশ মুসলিম। এই জেলায় অসংখ্য হিন্দু বিদ্যালয় ছিল এক তথ্যে অ্যাডাম বলেন যে, জেলার ৯টি মহকুমায় মোট ৪১টি সংস্কৃতি বিদ্যালয় ছিল যেখানে হিন্দু ধর্মতত্ত্ব, ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র আইন, জ্যোতিবিদ্যা ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া হতো। অপরদিকে অ্যাডাম মুসলমানদের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করেননি। রংপুরের ন্যায় দিনাজপুরেও মুসলমানদের শিক্ষার চিত্র একই ছিল। দিনাজপুরের হিন্দুদের উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৬টি প্রতিষ্ঠান ছিল। হেমিল্টনের মতে, ফার্সি বিদ্যালয়গুলোতে ছিল হিন্দু আধিক্য যদিও দিনাজপুরের মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ট।

প্রথম রিপোর্টের উপসংহারে জানা যায়, অ্যাডাম আসাম, আরাকান, রেঙ্গুনের দক্ষিণাংশ, দিল্লি আগ্রা ইত্যাদি শিক্ষার অনুসন্ধানের আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সেসব অঞ্চলে কাজ করলে বাংলা সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য যথাসময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। এই ভেবে তার ঐ পরিকল্পনা স্থগিত রাখেন।

বৌদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্রাহ্মন্য হিংস্রতা তুলনাহীন!

ড. এম, এস, জয় প্রকাশ

মূল প্রবন্ধ Brahmin Violence against Buddhism in India has no parallel.

লিখেছেন- ড. এম, এস, জয় প্রকাশ এবং প্রকাশিত হয়েছে- Lisa gournal এ (এপ্রিল জুন ২০০৮) সংখ্যায় লন্ডন থেকে পৃষ্ঠা ৪৯-৫২। অনুবাদ করেছেন এম, এ, তাহের (ইতিহাস গবেষক রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও প্রবন্ধকার)

সম্পাদকের মন্তব্যের ভাষান্তর বন্ধনীর মধ্যে তুলে ধরা হলো। বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি ভারতে এবং সমস্ত দক্ষিন এশিয়া জুড়ে, চীন, কোরিয়া, জাপান এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। ইহা পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম ধর্ম। তবু শুধু ভারতেই এ ধর্ম বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়েছে ? কেন? ভারতের হিংস্র বিরোধিতার কারনে। ইতিহাস বিদেরা এ সত্যকে ইচ্ছাকৃত ভাবে অবহেলা করেছে। ১৯৫১ সালে ড. বি, এম আম্বেদকরের বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ এবং অতি অল্প সময় পর তার মৃত্যুতে ভারতের নিম্ন বর্নীয়রা ঐ দীর্ঘ কালিন সত্য ঘটনাকে উৎঘাটিত করে প্রচারের চেষ্টা চালায়। তারা দেখলো কিভাবে আত্মরক্ষার্থে অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ধর্মালম্বীদের কে নির্বিচারে সুসংগঠিত ভাবে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে, বৌদ্ধ মন্দির গুলির ধ্বংস সাধন করেছিল। কিভাবে এ বিশাল জনগোষ্ঠি অহিংস ধর্মালম্বী হয়েছিল এবং কিভাবে পরিত্যাগ করল। পরিত্যাগ করে গ্রামীন জীবনে ফিরে গেল অস্পৃশ্য হয়ে বরন করে নিল বর্ণবাদের দাসত্ব ও নিগৃহিত জীবন।

লেখক এম, এস জয় প্রকাশ এমন একজন যারা সুদীর্ঘকাল ব্যাপি চলা এ ভয়ংকর সন্ত্রাসের ফলে পতিত অস্পৃশ্য শ্রেণীর প্রতিবাদে সোচ্চার কণ্ঠ। লেখক জয় প্রকাশও একজনক শক্তিশালী প্রতিবাদি ঘোষক)।

আফগানিস্তানে তালিবান নেতৃত্ব কর্তৃক নির্মমভাবে বৌদ্ধ মূর্তি ধ্বংসের বিরুদ্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। আশ্চর্যের বিষয় নাৎসীবাদি ব্রাহ্মন পরিচালিত ভারতীয় সরকার নাৎসী ব্রাহ্মনদের সমর্থনে তালিবানদের এ কাজকে নিন্দা জানায় কিভাবে? বর্তমান ভারতীয় নাৎসী ব্রাহ্মণদের পূর্বপুরুষে যেখানে শুধু বৌদ্ধমুর্তি গুলি ই ধ্বংস করেনি তারা নৃশংসভাবে ঐ ধর্মালম্বীদেরকে হত্যা করেছিল ইহা ওদের জন্যে আত্মবিমুখিতার সামিল। একজন পক্ষপাতিহীন ইতিহাসের ছাত্র/গবেষকের পক্ষে মন্তব্য করা সঠিক হবে যে ভারতীয় ব্রাহ্মনদের তালিবানের কাজের সমালোচনা করার কোনই মানবিক অধিকার নেই। শতশত বৌদ্ধ মুর্তি, স্তুপা, এবং বৌদ্ধবিহার, কলেজ ৮৩০ থেকে ভারতে ধ্বংস করা হয়েছে ব্রাহ্মন্যবাদের পুনরুত্থানের নামে। দেশী বিদেশী লিখিত বিবরণ ও প্রত্নতাত্বিক নিদর্শন প্রমান করে ভারতীয় ব্রাহ্মন্যবাদিরা পৌনঃ পুনিক ভাবে বৌদ্ধ ধর্মের ধ্বংস সাধন করেছে।

শংকরাচার্যের ভূমিকা

শংকরাচার্যরা সহ অনেক রাজা ও শাসকের মত ব্রাহ্মণ নায়কেরা বৌদ্ধ মুর্তি ধ্বংস করে ও বৌদ্ধ মতবাদকে সমুলে নিপাত করে গর্ব অনুভব করত। আজ তাদের অধঃস্তনেরা বাবরী মসজিদ ধ্বংস করল এবং অতি নিকট ভবিষ্যতে আরো কতগুলি মসজিদ ধ্বংস করবে তার একটা ফিরিস্তি প্রচার করেছে। আর এব্যাপারে কলংক নিয়ে তারা আফগানিদের কাজের নিন্দা প্রকাশ করে।

মহামতি অশোক কর্তৃক নির্মিত ৮৪০০০ বৌদ্ধ স্তুপা ধ্বংস করেছিল ব্রাহ্মণ পুশ্যমিত্র (Romila Thapar, Ashokaud Decline of Mowgas, Landon 1961-P-200) মগধের বৌদ্ধ কেন্দ্র ধ্বংসের ঘটনা এগুলীর অনুবর্তি ঘটনা হাজার হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হয়েছিল। রাজা জালুকা বৌদ্ধ ভক্তদের প্রার্থনা সংগিতের ঝংকারে তার ঘুমের ব্যাঘাত হওয়ার অজুহাতে তার রাজ্যধীন অঞ্চলের বৌদ্ধবিহার (কলেজ) গুলি ধ্বংস করেছিল (Kalhana Rajtharangini, 1:40) ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্টির জন্য কাশ্মীরে রাজা কিন্নার হাজার হাজার বৌদ্ধ বিহার ধ্বংস করে বৌদ্ধ গ্রামগুলি দখল করে ছিল। (স্কু-ঐ পৃ-৮০)

বিহার ধ্বংস ও দানবদের ভূমিকা :

দানব ব্রাহ্মনেরা বিপুল সংখ্যক বৌদ্ধ বিহার দখল করে ব্রাহ্মন্য ধর্মের হিন্দুমন্দিরে রূপান্তরিত করে যাতে অস্পৃশ্যদের (যারা পূর্বে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল) অধিকার দেওয়া হয়-নি। বৌদ্ধদের ধর্মীয় স্থানগুলিকে পরিকল্পিত ভাবে হিন্দু মন্দির বানান হলো পুরানের মিথ্যা কাহিনী লিখে বা মিথ্যা ইতিহাস খোদাই করে। তিরুপতি, অহোবল, উদ্ভাবলি (উরা বল্লী), ইলোরা, বাঙ্গালোর, দিল্লী, নালন্দা, গুদিয়াল, নাগরজুনাকুন্দা, শ্রিসাইলাম, কেরালায় সবারিমালা (আয্যপাপ্রভূ) এসব গুলি ই হলো বৌদ্ধদের পবিত্রতম স্থান ব্রাহ্মনদের নিষ্ঠুর দখলের নমুনা।

আদিশংকর নগরজুনাকুন্দায় বৌদ্ধমুর্তি ও স্মৃতিস্তম্ভ গুলি ধ্বংসে দানবীয় ভূমিকা গ্রহণ করে। লংহাষ্ট নগরজুনাকুন্দায় খনন কাজ পরিচালনা করে তার বই Memoirs of the Archaelogical Survey of India No. 54, The Buddhist

Antiquties of Nagarjunakunda, Delhi 1938, P-6) এ লিপিবদ্ধ করেছেন।

অব্রাহ্মনদের জীবন্ত দগ্ধ করন :
যে নিষ্ঠুর আচরনে নগরজুনাকুন্দায় সৌধাদির ধ্বংস সাধন করা হয়েছিল তা শুধু ধনরত্ন লুন্ঠন হতেই পারেনা বরং মহা আতংকের বিষয়। কারন যে ভাবে স্তম্ভ, ভাস্কর্য ও প্রস্তর মুর্তি গুলি উচ্ছৃঙ্খলতায় ধ্বংস সাধন নয়-চুর্ণবিচুর্ণ করা হয়েছে। ইহা নিষ্ঠুরতা ছাড়া কিছুই নয়। স্থানীয়দের কথিত কাহিনী সূত্রে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণ পন্ডিত শংকরাচার্য এক বিশাল শিষ্য বাহিনী নিয়ে নগর জুনাকুন্দায় এসে বৌদ্ধ স্মৃতি স্তম্ভগুলি ধ্বংস করে। ধ্বংসপ্রাপ্ত সৌধরাজি আজ যে আবাদি জমির উপর ছিল উহা শংকরাচার্জ কে ধর্মীয় অনুদান হিসাবে দেয়া হয়। কেরালায় শংকরাচার্য এবং তার প্রিয় সহচর ভয়ংকর বৌদ্ধ বিদ্বেষী কুমারিলা ভট্ট বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে এক ধর্ম যুদ্ধ (Crusade) সংগঠিত করেছিল। শংকর দিগবিজয়ে' বই থেকে আমরা বিশদ বিবরন পাই যে, কিভাবে অব্রাহ্মনদেরকে পুড়িয়ে হত্যা করে সে আনন্দ লাভ করত ।

কেরালায় সংগঠিত ধ্বংস যজ্ঞ
উজ্জয়িনীয় রাজা সুদ্ধাবনানকে কুমারিলা বৌদ্ধদিগকে নিশ্চিহ্ন করতে অনুপ্রানিত করে। মিরচাকটিকা মুদ্রক' থেকে আমরা জানতে পারি উজ্জীয়িনীতে রাজার শ্যালক বৌদ্ধভিক্ষুদিগকে হত্যা করেছিল। তাদের নাকে সরুদড়ি বিধিয়ে দিয়ে বলদ গরুর মত গাড়ী কাঁধে দিয়ে গাড়ী টানতে বাধ্য করা হতো। কেরালোপথি প্রামান্য দলিল সমূহ প্রমান করে যে, কুমারিলার দ্বারা কেরালা থেকে বৌদ্ধধর্ম নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ শংকরের কার্যাবলীকে এভাবে দেখেছেন- তাঁর বর্ণনায় (শংকরের পাষান হৃদয় এরূপ ছিল যে তর্কে পরাভূত করে অসংখ্য বৌদ্ধ ভিক্ষুকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করে। শংকরের একাজকে আমরা কি বলতে পারি ইহা অন্ধ গোঁড়ামী ছাড়া কিছুই নয় Complete Works of Swami Vivekananda, Vol.Vii. P-118, Calcutta 1997).

কেরালার বৌদ্ধ ইতিহাস :-
কেরালায় শতশত জায়গা রয়েছে যার নামের সাথে পল্লী শব্দটি আগে বা পরে যুক্ত রয়েছে। এ সব জায়গায় মধ্যে কিছু যেমন করুংগাপল্লী, কার্থিকাপল্লী, পল্লীকাল, পল্লীপপুরাম প্রভৃতি। পল্লী শব্দের অর্থ বুঝায় বৌদ্ধ বিহার।

বুদ্ধদেবের জন্মভূমি ভারতেই ইহা ঘটেছিল। কিন্তু আমাদের প্রখ্যাত ইতিহাস বিদেরা বৌদ্ধদের প্রতি সংঘটিত নিষ্ঠুরতাকে চাপা দিতেই বিশেষ সচেষ্ট এবং সব তথাকথিত ইতিহাসবিদেরা ভারতকে সহিষ্ণু ও অহিংস দেশ হিসাবে প্রচার করতে সক্ষম হয়েছে। সারা পৃথিবী তাদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে। তালিবানদের কাজ এই যুক্তিতে সমর্থন যোগ্য যে, ইসলাম মুর্তিপূজা জায়েজ করেনি। একই সংগে এটাও লক্ষনীয় যে ইসলাম অন্য ধর্মের লোকদের নিজ নিজ ধর্মপালনে বাধা দেয় না।

কেরালায় রয়েছে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের ১২০০ বছরের ইতিহাস। আজতক কেরালায় স্কুলগুলিকে বলা হয় ইঝুপল্লী বা পল্লীকুদাম। আমাদের খৃষ্টান ও মুসলিম ভায়েরা তাদের প্রার্থনার স্থান গুলিকে পল্লী হিসাবে বলেন। শংকর ও কুমারিলার নেতৃত্বে ব্রাহ্মণ-নাৎসীরা এসব পল্লীকে নিষ্ঠুর ভাবে ধ্বংস করে। তারা ১২০০ বছরের বৌদ্ধ ঐতিহ্য ধ্বংস করে কেরালাকে ব্রাহ্ম রাজ্যে পরিণত করে। ইঝাভাস ও পুলায়াস নামে আদি বাসীদিগকে বর্ণাশ্রমের অভিশাপে পতিত করে। অনেক বিহারকে মন্দিরে রূপান্তরিত করা হয়। যাতে সংখ্যাধিক্য জন গোষ্ঠিকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না নিম্ন জাতের কলংক দিয়ে।

পরশুরামের ভূমিকা
এটা লক্ষনীয় যে দ্রাবিড়ীয়ান ও বৌদ্ধ শব্দ চেরালা হলো সংস্কৃতে কেরালা। কেরালা সম্বন্ধে পরশুরামের রূপ কাহিনী হলো যে গোকর্ন থেকে কন্যাকুমারিতে সাগরে পুরুশুরমার কুঠার নিক্ষেপ করলে কের ভূখন্ড সাগর থেকে উত্থিত হয়। এটা হলো কেরালায় বৌদ্ধ নিধনকে চাপা দেয়ার জন্য ব্রাহ্মনদের একটা গাঁজাখুরি রূপক কাহিনী।
কতকগুলি বৌদ্ধমুর্তি আম্বালাপুঝা, করুংগাপল্লী, পল্লিকাল, ভরানিক্কাবু, মবেলি এবং নিলাম পেরায় পাওয়া গেছে। এসব গুলিই বিকৃত অবস্থায়। প্রভু আয্যাপ্পা সাবারিমালায় এবং প্রভুপদ্ম নাভা থিরুবানাথাপুরামে প্রাপ্ত বৌদ্ধ মুর্তিগুলি দেবতা বিষ্ণু হিসাবে এখন পুজিত হচ্ছে।

কেরালার নদী আলুবার তীরে শত শত বৌদ্ধ নিধন হয়েছিল। আলুবা শব্দটি আলাবি থেকে উদ্ভূত যার অর্থ ত্রিশুল, যে অস্ত্র বৌদ্ধ নিধনে ব্রাহ্মণ নাৎসীরা ব্যবহার করত। সমভাবে তামিলনাড়ুর বৈগা নদীর তীরেও শিব ঋষি সমস্বর দ্বারা বৌদ্ধরা নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। এই বৌদ্ধ নিশ্চিত করন ঘটনা তামিল গ্রন্থ 'থেবারাম'এ বর্ণিত আছে।

ইতিহাস বিদের সত্য গোপন
বুদ্ধদেবের জন্মভূমি ভারতেই ইহা ঘটেছিল। কিন্তু আমাদের প্রখ্যাত ইতিহাস বিদেরা বৌদ্ধদের প্রতি সংঘটিত নিষ্ঠুরতাকে চাপা দিতেই বিশেষ সচেষ্ট এবং সব তথাকথিত ইতিহাসবিদেরা ভারতকে সহিষ্ণু ও অহিংস দেশ হিসাবে প্রচার করতে সক্ষম হয়েছে। সারা পৃথিবী তাদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে। তালিবানদের কাজ এই যুক্তিতে সমর্থন যোগ্য যে, ইসলাম মুর্তিপূজা জায়েজ করেনি। একই সংগে এটাও লক্ষনীয় যে ইসলাম অন্য ধর্মের লোকদের নিজ নিজ ধর্মপালনে বাধা দেয় না।

বানিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রাম মহানগরের জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানের রূপরেখা

এস এম নজরুল ইসলাম

আমি ১৯৭৭ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম মহানগরের বাসিন্দা ছিলাম। নগরী থেকে মহানগরীতে উন্নীত হওয়াটা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম মহানগরী ছিল পরিবেশ বান্ধব নগরী। ১৯৮৫ সাল থেকে নগরায়ন দ্রুতগতিতে শুরু হয়। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও দুর্নীতির কারনে নদী ভরাট খালভরাটের মাধ্যমে অবৈধ স্থাপনা নির্মানের ফলে ১৯৮৭-৮৮ সাল নাগাদ জলাবদ্ধতা সমস্যা শুরু হয় যা বর্তমানে ভয়াবহ রূপে বিরাজমান।

এ সমস্যা সমাধানকাজে ১৯৮৯ সালে "পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প" গ্রহণ করা হয়। এর মাধ্যমে নদী ও খাল সমূহ দখল মুক্ত করা হয়। ভূমি হুকুম দখলের মাধ্যমে খালগুলি প্রশস্থ করা হয়। শেখ মুজিব রোডে বক্র কালভার্ট নির্মান করা হয়। ফলে কয়েক বছর চট্টগ্রাম নগরী জলাবদ্ধতামুক্ত হয়। পরবর্তীতে যথাযথ সংস্কার ও রক্ষানাবেক্ষনের অভাবে আবার জলাবদ্ধতা সমস্যা শুরু হয় যা বর্তমানে জাতীয় দুর্যোগে পরিনত হয়।

চট্টগ্রাম মহানগরীর "জলাবদ্ধতা সমস্যা একটি জাতীয় সমস্যা। কেননা চট্টগ্রাম মহানগরী বাংলাদেশের বানিজ্যিক রাজধানী, প্রধান বন্দর ও বিপুল আয়ের উৎস। আমদানীকৃত পন্য প্রধানত চট্টগ্রাম বন্দরের গুদাম সমূহ থেকে সারা দেশে সরবরাহ করা হয়। জলাবদ্ধতার কারনে প্রতিবছর একাধিকবার এসব পন্যগুদাম নিমজ্জিত হয়ে হাজার হাজার কোটি টাকার পন্য নষ্ট হয়। ব্যবসায়ীরা এ ক্ষতি থেকে বাঁচতে পন্যমূল্য বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়।

জলাবদ্ধতা সমস্যা দূর করতে ১৯৯৫ সালে মাস্টার প্ল্যান গ্রহণ করা হয়। যে প্লান এখনও বাস্তবায়ন হয়নি। প্রতিবছর বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে হাজার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় কিন্তু অজ্ঞাত কারনে জনগন এর সুফল পায়না। ১৯৯৫ সালের মাস্টার প্লান বাস্তবায়নে ২০১৭ সালে মেগাপ্রকল্প গ্রহন করা হয় যার জন্য দুই কিস্তিতে ইতিমধ্যে ১১ (এগার) হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু নগরবাসী বিগত ছয় বছরেও এর সুফল পায়নি। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত স্লুইস গেট ও রেগুলেটর নির্মানের কাজ এখনও অসমাপ্ত। অপরাধীদের দায়মুক্তি দেয়াই এর অন্যতম কারন। পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ম্যানেজ করে চট্টগ্রাম মহানগরীতে অবাধে পাহাড় কাটা হচ্ছে। এতে নগরীর পানি নিস্কাষন ব্যবস্থা ভরাট হয়ে যায়।

জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য রূপরেখা

১। ১৯৭৬-৭৭ সালে চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ কাজ করা হয়। জরীপের নকশা অনুযায়ী চট্টগ্রাম মহানগরীর ২১ টি খাল পুরোপুরি উদ্ধার করতে হবে। ভরাট খাল যথাযথ ভাবে খনন করতে হবে। দ্রুত সময়ের মধ্যে স্লুইসগেট ও রেগুলেটরের নির্মান কাজ সমাপ্ত করতে হবে। প্রত্যেক খালের ২ পাড়ে কংক্রিটের দেয়াল নির্মান, প্রয়োজনীয় ব্রীজ নির্মান করতে হবে।

২। বারিক বিল্ডিং সংলগ্ন চট্টগ্রাম বন্দর এর শেষ প্রান্ত থেকে চান্দগাঁও থানার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত কর্ণফুলী নদীর পাড় বরাবর চট্টগ্রাম শহর রক্ষা বাঁধ নির্মান করতে হবে। ঢাকা শহর রক্ষা বাঁধের ন্যায় প্রয়োজনীয় স্থানে ব্রীজ, কালভার্ট, স্লুইসগেট রেগুলেটর নির্মান করতে হবে। যাতে নগরে নদীর পানি প্রবেশ করতে না পারে এবং নগরের অভ্যন্তরীন পানি স্লুইটগেট ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাম্প মেশিন দ্বারা নদীতে ফেলে দিতে হবে।

৩। প্রতিমাসে ১ বার কর্ণফুলী নদী ড্রেজিং করে প্রয়োজনীয় গভীরতা ও নাব্যতা বজায় রাখতে হবে।

৪। নগরীর প্রত্যেক ওয়ার্ডের কমিশনার নিজ এলাকার বর্জ্য, পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা তথা ড্রেন, নালা, খাল পরিষ্কার করতে বাধ্য থাকবে। নগরের মেয়র কমিশনারদের কার্যাবলী তদারক করবে। প্রয়োজনে আইন প্রনয়ন করে বাধ্য করতে হবে। এবং পদচ্যুতি, জেল, জরিমানার শাস্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৫। শিক্ষা ব্যবস্থার ৫ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পরিবেশ সুরক্ষা ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। সিটি কর্পোরেশন প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে ১দিন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় পরিবেশ সুরক্ষা ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে বিজ্ঞাপন প্রচার করবে। প্রত্যেক রাস্তার মোড়ে পরিবেশ সুরক্ষা ও পরিস্কার পরিচ্ছতা বিষয়ে পোষ্টার/বিলবোর্ড লাগালে জনসচেতনতা বাড়বে।

৭। সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে প্রত্যেক ওয়ার্ডে বছরে কমপক্ষে দুইবার জলাবদ্ধতা সমস্যা প্রতিকার, পরিবেশ সুরক্ষা ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করবে।

৮। দলীয় বিবেচনায় সি,ডি,এ চেয়ারম্যান নিয়োগ না দিয়ে নগর উন্নয়ন কাজে দক্ষ প্রকৌশলী বা স্থপতিকে এ পদে পদায়ন করলে নগরবাসী উপকৃত হবে।

৯। বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে "মহানগরীর জলাবদ্ধতা নিরসন" বিষয়ক একটি কমিটি গঠন করতে হবে। এ কমিটিতে সদস্য থাকবেন জেলা প্রশাসক এবং পরিবেশ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম এর প্রধান, সি,ডি, এ চেয়ারম্যান, ওয়াসার চেয়ারম্যান, পানি উন্নয়ন বোর্ড চট্টগ্রাম এর প্রধান প্রকৌশলী, বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, সিটি কর্পোরেশন এর মেয়র ও সি, এম, পি কমিশনার। এই কর্মকর্তারা যদি প্রতি তিনমাসে একটি সভায় মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন তদারক করে এবং পাহাড় কাটা বন্ধে পদক্ষেপ নেয় তবে জলাবদ্ধতা নিরসনে সহায়ক হবে।

লেখক : সম্পাদক
ইতিহাস অন্বেষা
আজীবন সদস্য
বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উপমহাদেশের মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত নবাব খাজা সলিমুল্লাহ

হাসান বিন নজরুল

১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও স্থানীয় হিন্দুদের ষড়যন্ত্রে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার স্বাধীন নবাব পরাজয় বরণ করেন। ফলে বাংলা হয়ে পড়ে ইংরেজ দখলদারদের অধীন একটি পরাধীন জনপদ। ধীরে ধীরে ষড়যন্ত্র, অবর্ণনীয় নির্যাতন ও অর্থনৈতিক শোষনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে বাংলার সাবেক শাসক ও সমৃদ্ধ মুসলিম জনগোষ্ঠী একটি দরিদ্র জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। পলাশীর প্রায় একশ বছর পর ভারতের শেষ মুঘল সম্রাট ২য় বাহাদুর শাহ জাফর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে পরাজয় বরণ করলে পুরো ভারত ব্রিটিশদের পদানত হয়ে পড়ে। অতঃপর বৃটিশ রাণী ভিক্টোরিয়া ১৮৫৯ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী থেকে ভারতের শাসন ভার গ্রহণ করে যা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কায়েম ছিল। এই অন্ধকার শতাব্দীর গর্ভ থেকে মুক্ত হতে উপমহাদেশের মুসলিমদের জন্য যেসব মহান ব্যক্তিত্ব নিঃস্বার্থ ও নিরলস কাজ করে গেছেন তাদের মধ্যে অগ্রগন্য ব্যক্তিত্ব নবাব খাজা সলিমুল্লাহ। তিনি আমাদের জাতীয় ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত, বঙ্গভঙ্গের মহানায়ক, সেরা সমাজ সেবক ও বিচক্ষন রাজনীতিবিদ।

ঢাকার তৃতীয় নবাব খাজা আহসানউল্লাহর জেষ্ঠ পুত্র খাজা সলিমুল্লাহ ৭ই জুন ১৮৭১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ছোট বেলা থেকেই তিনি ছিলেন ধার্মিক ও সাধারণ। তাই নবাব পুত্র হয়েও তিনি থাকতেন সাধারনের মাঝে ও সর্বসাধারনের উন্নতির চিন্তায় মশগুল। তিনি বিদেশী শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নিজ ঘরেই শিক্ষা লাভ করেন। কর্মজীবনে প্রায় দু- তিন বছর তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। অতঃপর ১৯০১ সালের ১৬ ই ডিসেম্বর নবাব আহসানউল্লাহর মৃত্যু হলে ৩০ বছর বয়সী সলিমুল্লাহ নবাব পদে অধিষ্ঠিত হন।

নবাব সলিমুল্লাহ নবাব হওয়ার পর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কল্যাণের নিমিত্তে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বৃটিশরা ভারতীয় উপমহাদেশে অসংখ করদ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে; তাদের নিয়োগকৃত রাজা, মহারাজা, জমিদার ও নবাবেরা সীমাহীন অনাচার, অবিচার ও জুলুমের মাধ্যমে স্ব-স্ব স্থানে ত্রাসের মুল্লুক প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু এই অবস্থার মাঝেও অসাধারণ আলোকোজ্জল ছিলেন নবাব সলিমুল্লাহ ও তার পরিবার। তাঁর কিছু অম্লান কর্ম নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

ক) নবাব সলিমুল্লাহ সর্বপ্রথম পানীয় জল, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের ব্যবস্থা চালু করে আধুনিক ঢাকার গোড়াপত্তন করেন।

খ) নবাব হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই তিনি ঢাকার প্রতিটি এলাকায় নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনের নির্দেশ দেন।

গ) নবাব সলিমুল্লাহ উপলব্ধি করেছিলেন যে, সমাজে বিভিন্ন পেশার লোক বাস করে এবং প্রত্যেকের জীবনের লক্ষ্য ও কর্ম স্বতন্ত্র। তাই তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও ভিন্ন ভিন্ন হওয়া জরুরী। এজন্য শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে তিনি সমাজের লোকদের চার ভাগে ভাগ করেন- ১) অভিজাত বা জমিদার ২) ব্যবসায়ী ও সরকারী চাকুরে ৩) কারিগর শ্রেণী ৪) কৃষক শ্রেণী। তিনি এই চার শ্রেণীর পেশা ও দায়িত্বের নিরিখে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতি ও ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সব শ্রেণির জন্য উপযোগী স্বতন্ত্র ধরনের বইপত্র রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

১৯০৩ সালে বড়লাট লর্ড কার্জন ঢাকা সফরে আসেন। তখন নবাব সলিমুল্লাহ পূর্ব বাংলার সমস্যাগুলো তার কাছে তুলে ধরেন। বলা যায়,তাঁর একক প্রচেষ্টায় ও পরামর্শে সীমানা বর্ধিত করে (ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠন করা হয়) বড়লাট বঙ্গভঙ্গ মেনে নেন।

ঘ) নবাব সলিমুল্লাহ বিশ্বাস করতেন যে, ধর্মীয় শিক্ষা ব্যতীত শিক্ষার্থীদের ভালো চরিত্র ও নৈতিকতার ভিত্তি রচিত হবে না। এজন্য তিনি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য মাদ্রাসা সমূহে আর্থিক অনুদান দিয়েছেন।

ঙ) আলীগড় কলেজের অনুকরণে বাংলার মুসলমান ছাত্রদের জন্য প্রথমবারের মত ঢাকায় একটি মুসলিম হল নির্মানে নবাব ১,৮৬,৯০০ টাকা দান করেন এবং ঢাকা মাদ্রাসার ছাত্রাবাসের জন্য ১৯১২ সালে তিনি লক্ষাধিক টাকা দান করেন।

চ) নবাব সলিমুল্লাহর অক্লান্ত চেষ্টায় ব্রিটিশ সরকার শিক্ষা বিভাগে মুসলমানদের জন্য সহকারী পরিদর্শক ও বিশেষ সাব ইন্সপেক্টরের পদ সৃষ্টি করে।

ছ) নবাব সলিমুল্লাহ প্রাথমিক ও গণশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করতেন। ১৯১১ সালে কংগ্রেস নেতা গোপাল কৃষ্ণ গোখলে "ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সেলে "বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিল" পেশ করেন। নবাব সলিমুল্লাহ ১৯১২ সালের ৩রা মার্চ কলকাতায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের ৫ম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে ঐ বিলের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে তা কার্যকর করতে বৃটিশ সরকারের প্রতি আহবান জানান।

১৯০৩ সালে বড়লাট লর্ড কার্জন ঢাকা সফরে আসেন। তখন নবাব সলিমুল্লাহ পূর্ব বাংলার সমস্যাগুলো তার কাছে তুলে ধরেন। বলা যায়,তাঁর একক প্রচেষ্টায় ও পরামর্শে সীমানা বর্ধিত করে (ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠন করা হয়) বড়লাট বঙ্গভঙ্গ মেনে নেন। অন্যভাবে বলতে গেলে,ব্রিটিশরা আসামে উৎপাদিত চা ও অন্যান্য পন্য বিদেশে রপ্তানীর পরিবহন ব্যয় কমানোর জন্য কলকাতার বদলের চট্টগ্রাম ব্যবহারের ব্যাপারে চিন্তা করে এবং বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের ভাবনাও ছিল। ফলে ব্রিটিশদের স্বার্থ ও নবাবের আবেদন যুক্ত হয়ে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে বঙ্গভঙ্গ বলবৎ হয়ে মুসলমানদের ভাগ্য খুলে যায়। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কলকাতা কেন্দ্রীক হিন্দু সমাজ ও কংগ্রেস মেনে নেয় নি। তাদের উগ্রবাদী আন্দোলনের চাপে খুব কম সময়ে ১৯১১ সালেই ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ঃ

বঙ্গভঙ্গ এবং পরবর্তীতে বঙ্গভঙ্গ রদ; এর পরও নবাব দমে যান নি। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় হিন্দু সমাজের তীব্র বাধার পরও তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফরমান

হাসিল করতে সক্ষম হন। এতদসত্ত্বেও সায়মন কমিশনের রিপোর্টে খোঁড়া যুক্তি দিয়ে বলা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মত পর্যাপ্ত জায়গার অভাব রয়েছে। এই দাবীর জবাবে তিনি শাহবাগের পুরো বাগান বাড়ীই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য দান করে দেন। সুতরাং বলা যায়, তিনি মৃত্যুর আগেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যায় স্থাপনের প্রায় পুরো কাজই করে গেছেন।

বর্তমানে বাংলাদেশে বিশ্বমানের প্রকৌশলী তৈরীর ক্ষেত্র বুয়েটও তাঁর অবদান। বাংলাদেশে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর প্রতিষ্ঠাকালীন নাম ছিল আহসানুল্লাহ স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। তৎকালীন শোষিত মুসলিমদের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে নবাব সলিমুল্লাহ শত ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে মুসলিমদের জন্য এসব অমর কীর্তি গড়েছেন।

তখনকার ইতিহাস হতে জানা যায়, আজকের অনেক বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ নবাবের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরুদ্ধে অনেক কটাক্ষ, বিরোধীতা ইত্যাদি করেছেন; কেউ বলেছেন মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়, কেউ বলেছেন, ফক্কা বিশ্ববিদ্যালয়। আবার এমনও বলা হয়েছে পূর্ববঙ্গের মানুষদের কোন কালচার নেই, আছে শুধু এগ্রিকালচার। ফলে তারা বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে করবে টা কি ? তখনকার পত্রিকা গুলোও নবাবের তীব্র বিরোধিতা করে অসংখ্য কলাম ছেপেছে, যা এখনো কালের স্বাক্ষী। অথচ আজ আমরা ক্ষুদিরামের গান গাই। যে ক্ষুদিরাম নবাবের উদ্যোগে হওয়া বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। লজ্জার বুঝি আর কিছু অবশিষ্ট রইল না এই ভূখন্ডে!

মুসলিম লীগ গঠনে নবাবের অবদান ঃ

১৯০৬ সালের নভেম্বরে নবাব সলিমুল্লাহ সমগ্র ভারতের বিশিষ্ট মুসলিম নেতৃবৃন্দের নিকট প্রেরিত পত্রে সর্বভারতীয় মুসলিম সংঘের প্রস্তাব করেন। সেই সূত্রে ২৮-৩০ শে ডিসেম্বির নবাব ভিখারুল মুলকের সভাপতিত্বে সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের আয়োজন হয়। এখানে নবাবের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সম্মেলনে আগত হাজার হাজার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সমর্থনে ও নবাবের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ গঠিত হয়। ঢাকার ঐ সম্মেলনের সমাপনী দিনে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ যোগ দিয়েছিলেন। শোষিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত ও পশ্চাৎপদ মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্য গঠিত মুসলিম লীগকেও হিন্দু সমাজ ও মুসলিম বিদ্বেষী মহল ভালোবাবে নেয় নি এবং এই অক্লান্ত প্রচেষ্টার কারণে তিনি তাদের চক্ষুশূলে পরিণত হন। তাই তো সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সম্পাদিত দি বেঙ্গলী পত্রিকা নবগঠিত মুসলিম লীগকে সলিমুল্লাহ লীগ হিসেবে কটাক্ষ করে।

অথচ মুসলিম লীগ গঠন ছিল সময়ের দাবী। কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র, শঠতা ও ব্রিটিশ শাসন, শোষন-বঞ্চনার বিরুদ্ধে মুসলিম স্বার্থ রক্ষার একটি যুগান্তকারী প্লাটফর্ম। যে প্লাটফর্ম পরে মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের দাবীকে সত্যে পরিণত করেছে এবং সেই সত্যের খন্ডিত অংশ আজকের বাংলাদেশ। সুতরাং বলা যায় নবাব সলিমুল্লাহ না হলে পাকিস্তান হত না আর সেই সূত্র ধরে বাংলাদেশও হত না। আমরা হয়ত হতভাগা কাশ্মিরীদের মতই জীবন কাটাতে বাধ্য হতাম। অথচ আমরা কি করেছি এই মহান নিঃস্বার্থ ব্যক্তিত্বের সম্মানে? আমরা তাঁর প্রতিষ্ঠিত ঢাবির সলিমুল্লাহ মুসলিম হক থেকে মুসলিম শব্দ বাদ দিয়েছি, আমরা আহসানুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে তাঁর বাবার নাম মুছে বুয়েট করেছি আর সাবেক মিডফোর্ট ও বর্তমান স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজকে এখানো বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ দেই নি। এই মহান ব্যক্তির অবদানের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার কতটা ঘাটতি রয়েছে এসবই তাঁর প্রমাণ।

মৃত্যু রহস্য ঃ

উপ-মহাদেশের মুসলিম জাগরণের অগ্রজ নেতা সলিমুল্লাহর সুযোগ্য নেতৃত্বের কারণে মুসলিম সমাজ জেগে উঠার নানা পথ খুলে যায়। তাই মুসলিম বিদ্বেষী মহলে তাঁর শত্রুর অভাব ছিল না। সেই শত্রুতার একটি নমুনা নিম্নে পেশ করা হল ঃ

বঙ্গভঙ্গ আইন বহাল রাখার দাবিতে কুমিল্লার এক জনসভায় খাজা সলিমুল্লাহর ভাষন দেওয়ার কথা ছিল। পথিমধ্যে এক হিন্দুবাড়ি থেকে তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়। ফলে জনসভা- পন্ড হয়ে যায়। নবাব বাহাদুর ঢাকা ফিরে আসেন। নবাবকে হত্যার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় অন্যপন্থা অবলম্বন করা হলো। হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা বাঁধানো হলো। হিন্দুরা সশস্ত্র, মুসলমানরা নিরস্ত্র, তাই মুসলমান বেঘোরে প্রাণ হারাতে লাগল। শ্রী নীরদ চন্দ্র চৌধুরী তার স্মৃতিচারণমূলক দি অটো বায়োগ্রাফি অব অ্যান আননোন ইন্ডিয়ান গ্রন্থে এর সত্যতা স্বীকার করেছেন। (সরকার শাহাবুদ্দিন আহমদ : আত্মঘাতি রাজনীতির তিনকাল প্রথম খ, পৃষ্ঠা- ২১৩)

এই মহান নেতা মৃত্যু বরণ করেন ১৬ ই জানুয়ারী ১৯১৫ সালে। তাঁর রহস্যজনক মৃত্যু ঐ কালে ধোঁয়াশার আবর্তে ঘেরা ছিল। কিন্তু পরে ইতিহাস থেকে যা জানা যায় তা হলঃ

ইতিহাসবিদ কবি ফারুক মাহমুদ বলেন, হিন্দুদের চক্রান্তের ফলে ঢাকায় বিশ্বদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নিয়ে বড়লাটের সাথে নবাবের মতবিরোধ দেখা দেয় এবং উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। এক পর্যায়ে বড়লাট নবাবকে অপমানজনক কথা বলেন। তার সহ্য হয়নি। নবাবের সাথে সব সময় একটি ছড়ি থাকত। সে ছড়ি দিয়ে নবাব বড়লাটের টেবিলে আঘাত করেন। এ নিয়ে চরম তির্যক বাদানুবাদ শুরু হয়। এক পর্যায়ে বড়লাটের ইঙ্গিতে তার দেহরক্ষী নবাবকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে এবং গুরুতর আহত অবস্থায় নিশ্ছিদ্র প্রহরায় নবাবের লাশ ঢাকায় আনা হয়। তার আত্মীস্বজনকেও লাশ দেখতে দেয়া হয়নি। সামরিক প্রহরায় বেগম বাজারে তাকে দাফন করা হয়।

নবাব সলিমুল্লাহ ১৯০৮ সালে অমৃতসরে মুসলিম লীগের এক সভায় বলেছিলেন, যখন আমি দেখলাম আমার জাতি তথা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উম্মতগণ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তখন সিদ্ধান্ত নিলাম প্রয়োজনে নিজে ধ্বংস হব কিন্তু এ জাতিকে রক্ষা করব ইনশাআল্লাহ।

হুম, তিনি জীবন দিয়েই তাঁর সংকল্পের সত্যতা প্রমান করে গেছেন এবং জমিদারী বিলিয়ে হয়েছিলেন ঋণগ্রস্থ। তাঁর ঘরের মূল্যবান জিনিসপত্র বন্ধক রেখেও মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ঋণের জাল হতে বের হতে পারেন নি। সোনালী ব্যাংক সদরঘাট শাখায় এখানো নবাবের বন্ধক রাখা সিন্দুক "দরিয়ায়ে নুর সংরক্ষিত আছে "

নবাব তাঁর ইসলাম ও মুসলিম প্রেমকে শুধু উপমহাদেশে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। পৃথিবীর যে কোন দেশের মুসলমানদের কষ্টই নবাবকে ব্যথিত করত। একবার সুদুর তুরস্কে ভূমিকম্প হয়েছিল নবাব যখন জানলেন সেখানকার মুসলিমরা কষ্টে আছে তখনই অর্থ পাঠিয়ে দিলেন। আজ ইতিহাসে আবর্জনা যুক্ত হয়ে লজ্জায় দাঁড়িয়ে আছে। নির্লজ্জ মানুষের অন্তঃচোখ ইতিহাসের এই লজ্জা দেখতে পায় না। মুষ্টিমেয় সচেতন মানুষের প্রাণেই শুধু ক্ষরণের ব্যথা আছে। সিংহভাগ মানুষই আমাদের পূর্ব পূরুষদের এসব ত্যাগ তিতিক্ষা ভূলে গেছে। তাই নবাব খাজা সলিমুল্লাহর বেঘোরে প্রাণ দেয় আর ঘুরে ফিরে মুক্ত নীল আকাশে শকুনের আনাগোনা বেড়ে যায়। ভূলের আবর্তে ঘুরপাক খায় প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম।

সূত্র ঃ

১। দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১৬ই জানুয়ারী ২০১৭।
২। দৈনিক ইনকিলাব, ১৯ ই জানুয়ারী ২০১৭।
৩। দৈনিক ইনকিলাব, ১৯ ই জানুয়ারী ২০১৭।
৪। সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ২৭ জানুয়ারি ২০১২।
৫। উইকিপিডিয়া।
৬। মুক্ত জীবন ডট কম, ১৮ জানুয়ারী ২০১৫।
৭। রাইজিং বিডি ডট কম, ০৭ জুন ২০১৫।
৮। বাংলাদেশ সময় ডট কম, ১৫ জানুয়ারী ২০১৭।
৯। কালের কণ্ঠ, ১২ই জুলাই ২০১৪।

ইসলামী বিশ্ব ও ইহুদি-খ্রিস্ট ঐক্য

মূল : ইয়াসীর নাদিম
ভাষান্তর : শহীদুল ইসলাম ফারুকী

আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় বাধা ইসলাম ও তার সত্যিকার অনুসারীরা। যারা এখনো ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিজেদের কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে, যদিও অন্যদের সাথে সাথে নিজেদের জাতি ভাইদের পক্ষ থেকেও তাদেরকে সন্ত্রাসীর মতো উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হচ্ছে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা বুলন্দ হিম্মত ও উন্নত শির দৃঢ় পদে এগিয়ে চলেছে এবং জায়নিস্টদের দাতভাঙা জবাব দেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর ইসলামপন্থীদের এই সংগ্রাম যেহেতু জায়নাবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা বরদাস্ত করতে পারছে না, এ জন্য ১১ সেপ্টেম্বরের মতো বহু উদ্দেশ্যসম্বলিত নাটক মঞ্চস্থের মাধ্যমে তারা সে সংগঠনগুলোকেও টার্গেট বানাতে শুরু করেছে যারা জায়নিস্ট সংকল্পের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। সাথে সাথে সে সকল দেশের ওপরও আগ্রাসন চালানো হচ্ছে যেসব দেশ ইসলামী জাগরণ ও দ্বীনি চেতনাবোধের প্রাণকেন্দ্র এসব দেশের ইট দিয়ে ইট বাজানো হয়েছে। অঞ্চলের পর অঞ্চল ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। অগণিত নিস্পাপ প্রাণকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে। আর অর্থনৈতিক ক্ষতি ও ধ্বংসের তো হিসাবই সম্ভব নয়। জায়নিস্টরা তাদের সংকল্প বাস্তবরূপ দানের জন্য খ্রিস্টানদের সাথে ঐক্য গড়ে তুলে তাদের বিবেক-বুদ্ধির উপর সাওয়ার হয়ে আছে। আজ বিশ্বের যে প্রান্তেই মুসলিম উম্মাহ ধ্বংস ও নির্যাতনের শিকার সেখানে বাহ্যত অন্য কোনো জাতি এই অন্যায় কর্মে লিপ্ত হলেও কিন্তু এর পশ্চাতে ইহুদি মস্তিস্কই কাজ করছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে খ্রিস্টানরা ইহুদিদের গোলামী ও তাঁবেদারি করাকে গর্ব মনে করছে এবং তাদের ইশারায়ই নাচছে।

সভ্যতার দাবিদার জাতিগোষ্ঠী এখন প্রকাশ্য মানবতাবিধ্বংসী কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, এমনকি গর্বভরে তার প্রকাশও করে। তাদের প্রভু ইহুদি জায়নিস্টদের খুশি করার জন্য একথা বলতেও দ্বিধাবোধ করে না যে, স্বীয় উদ্দেশ্য পূরনের জন্য আমাদেরকে যে কোনো রাস্তা দিয়ে চলতে কোনো আপত্তি নই, চাই এর জন্য আমাদেরকে মানবতার সাথে সওদাবাজিই করতে হয় না কেন ? নিম্নে আমরা বর্তশান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জুনিয়র জর্জ বুশের ভাষনের অনুবাদ পেশ করছি, যে ভাষণ তিনি ইহুদি- খ্রিস্ট ঐক্যপরিষদের মার্কিন শহর নিউ মেক্সিকোর এলবোক ইয়র্কে অনুষ্ঠিত বার্ষিক অধিবেশনে দিয়েছিলেন। এই ভাষণ ওয়াশিংটন পোস্ট ম্যাগাজিন ১৩ মে ২০০৩ সংখ্যায় প্রকাশ করেছে। আর এর আরবি অনুবাদ আহমদ বশীর বাকের www.islamway.com নামক ওয়েবসাইটে উপস্থাপন করেছেন। উক্ত

সভ্যতার দাবিদার জাতিগোষ্ঠী এখন প্রকাশ্য মানবতাবিধ্বংসী কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, এমনকি গর্বভরে তার প্রকাশও করে। তাদের প্রভু ইহুদি জায়নিস্টদের খুশি করার জন্য একথা বলতেও দ্বিধাবোধ করে না যে, স্বীয় উদ্দেশ্য পূরনের জন্য আমাদেরকে যে কোনো রাস্তা দিয়ে চলতে কোনো আপত্তি নই, চাই এর জন্য আমাদেরকে মানবতার সাথে সওদাবাজিই করতে হয় না কেন ? নিম্নে আমরা বর্তশান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জুনিয়র জর্জ বুশের ভাষনের অনুবাদ পেশ করছি, যে ভাষণ তিনি ইহুদি- খ্রিস্ট ঐক্যপরিষদের মার্কিন শহর নিউ মেক্সিকোর এলবোক ইয়ার্কে...

ভাষণ দ্বারা একথা সহজেই অনুমান করা যায়, আজ আমেরিকা ও জায়নবাদীদের লক্ষ- উদ্দেশ্য ও পথ এক এবং অভিন্ন হয়ে গেছে। স্বীয় উদ্দেশ্য পূরণ ও হীনসংকল্পকে বাস্তবরূপ দানের জন্য তথাকথিত সভ্য দুনিয়া যে কোনো কিছু করতে পারে, এমনকি সেসমস্ত জাতিকে নির্মূল ও গণহত্যাও করতে পারে যারা জায়নবাদী বিশ্বায়নের বিরোধী এবং জালেম ও অত্যাচারী জাতির আধিপত্য মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। নিচে বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ জুনিয়রের একটি ভাষণের অনুবাদ পেশ করা হলো।

ইহুদি-খ্রিস্ট ইউনিয়নের অধিবেশনে জর্জ বুশের ভাষণ

অধিবেশনের মাননীয় সভাপতি, কংগ্রেস সদস্যবৃন্দ ও মার্কিন জনগণ! আজকের রাতে আমি অত্যন্ত গর্বের সাথে আপনাদেরকে বলছি, শ্বেতাঙ্গ ইহুদি- খ্রিস্ট ঐক্য বর্তমানে অতন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। আমাদের ইতিহাসে এ রকম আর কখনো হয়নি যে, মার্কিন শক্তি, মার্কিন আধিপত্য ও মার্কিন মূল্যবোধ এমন মর্যাদা, বড়ত্ব ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে যেমন আজ এই ইহুদি- খ্রিস্ট ঐক্যের ফলে অর্জিত হয়েছে। মার্কিন ঝান্ডা, মার্কিন সশস্ত্রবাহিনী, মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ সিআইএ এবং এফবিআই সন্ত্রাসবাদের ভয় থেকে বিশ্বকে মুক্তিদান এবং শান্তি-নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার খাতিরে একশ'রও বেশী দেশে বিদ্যমান রয়েছে। মার্কিন নাগরিকদের তাদের সরকার ও সশস্ত্রবিহিনীর জোয়ানদের নিয়ে গর্ববোধ করা উচিত যারা বিশ্বব্যাপী মার্কিন ব্যবস্থা বিস্তারের খাতিরে জীবনের সুখ- স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশ কোরবান করছে।

প্রিয় দেশ ও জাতি আজ আমি আপনাদেরকে একথা জানাতে গর্ববোধ করছি, তালেবান নির্মূল হয়ে গেছে। কাবুল স্বাধীন হয়েছে। মোল্লা ওমর ও উসামা বিন লাদেন হয়তো শেষ হয়ে গেছে কিংবা গ্রেফতারের পথে। এদিক-ওদিক লুকিয়ে বেড়াচ্ছে; কিন্তু বেশি দিন নয়, কারণ আমি তাকে জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় ইনসাফের কাঠগড়ায় দাড় করানোর ইস্পাত কঠিন সংকল্প করে রেখেছি। আজ আমি আপনাদেরকে একথা জানাতেও গর্ব অনুভব করছি, আফগান নারীরা চিরদিনের জন্য বোরকা থেকে মুক্ত হয়ে গেছে! আফগানিস্তানের মেয়েরা স্কুলে ফিরে

এসেছে। তারা এই সবক পড়ছে যে, কিভাবে আমাদেরকে আমেরিকা ও পাশ্চাত্য জগৎ কামিয়াবী এবং সফলতা দান করেছে। পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় নিদর্শন টেলিভিশন আফগান নাগরিকদের জীবনে আবার স্থান করে নিয়েছে। আফগানিস্তানের লোকরা আজ বড্ড খুশি ও পুলকিত যে, তারা আজ নিজ দেশে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করছে। আমেরিকা, বিশেষ করে মার্কিন শিশুরা আফগানিস্তানের জনগনকে পানাহারসামগ্রী ও সম্পদ উপকরণ প্রেরণ করে যে মহান কর্ম সম্পাদন করেছে তার উপর যতই গর্ব করা হোক, কম হবে। আজ আমি অত্যন্ত আনন্দিত, আমি আফগান শিশুদেরকে উত্তম উত্তম খাদ্য দ্বারা স্বাদ অনুভব করতে প্রত্যক্ষ করছি। তারা আজ চিপস, জেলি ও বিস্কুট খাচ্ছে।

আফগানিস্তানে যুদ্ধ প্রায় শেষ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সামনে এখনো দীর্ঘ ও বন্ধুর পথ রয়েছে। আমাদেরকে অনেক ইসলামী ও আরব রাষ্ট্র অতিক্রম করতে হবে। আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত নিস্তেজ হবো না যতক্ষণ প্রত্যেক মুসলমান নিরস্ত্র, দাড়িবিহীন, ধর্মহীন, শান্তিপ্রিয় ও মার্কিন প্রেমিক না হবে এবং মুসলিম নারীরা তাদের শরীর হিজাবাবৃত্তি করা ছেড়ে না দিবে। আমার দৃঢ়সংকল্প যে, আমার দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পূর্বেই এ সংকল্প পূরণ করার জন্য সকল প্রকার উপায় উপকরণ ও মাধ্যম প্রয়োগ করবো। শাসন করার আমাদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি একথা বলে যে, সরকারকে সক্রিয় ও কর্মতৎপর হতে হবে। কিন্তু সাথে সাথে সীমিতও হলেও সকল জিম্মাদারি ও দায়িত্ব আদায় করতে হবে। আজ আমরা শক্তির ক্ষেত্রে বিরাট পেরেশানি ও অস্থিরতার শিকার, যার কারণে আমাদেরকে একটি জাতীয় পলিসি বানাতে হবে। আমাদের নিকট শান্তিকে ব্যাপক ও বিস্তার করার অনেক সুযোগ রয়েছে। আমরা শান্তির মর্কিন সীমাকে বিস্তার করে তা সংরক্ষণ করতে পারি। আমরা আমাদের মিত্র ও বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে কাজ করবো যাতে আমরা কল্যাণের জন্য শক্তি ও স্বাধীনতার জন্য সহযোগী প্রমাণিত হতে পারি। আমরা মুক্তবাজার, মুক্তবাণিজ্য এবং সকল জাতির জন্য মিলেমিশে কাজ করবো, যারা আজাদির পথে ধাবমান, তারা তাদের কাজে আমেরিকাকে স্বীয় বন্ধু পাবে।

আমরা আমাদের মুল্যবোধ ও নিরাপত্তাকে শক্তিশালী করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবো আমাদের শান্তি, নিরাপত্তা সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী সশস্ত্রবাহিনী প্রয়োজন। কারণ বিন লাদেনের আগমন সম্পর্কে অবগত হওয়া আমাদের কারোর শক্তির মধ্যে ছিল না। কেউ জানে না, সে আমাদের জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে কখন কি ধরনের ধ্বংস সাধন করবে এবং অভ্যন্তরীন ও বাহিরাগত পলিসিকে কিভাবে টার্গেট বানাবে। অমানবিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড আঞ্জামদাতাদের উপস্থিতি সত্ত্বেও আমি মার্কিন জনগনের সাথে কৃত সকল প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছি। শুধু একটি ছাড়া। কারণ আমাদের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ আমাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে অনেকটা বাধা হয়েছে এবং এই যুদ্ধ অভ্যন্তরীণ সিকিউরিটি ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পেন্টাগণের ওপরও বিরাট প্রভাব ফেলেছ। আমাদের উচিত আমরা শান্তি ও গোপন তথ্য ক্ষেত্রে স্বীয় কর্মতৎপরতা বিস্তৃত করবো। ফেডারেল ব্যুরো ইনস্টিগেশন (এফবিআই) ও সিআইএ আমেরিকান মুসলমানদের উপর কড়া নজর রাখছে।

> সভ্যতার দাবিদার জাতিগোষ্ঠী এখন প্রকাশ্য মানবতাবিধ্বংসী কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, এমনকি গর্বভরে তার প্রকাশও করে। তাদের প্রভু ইহুদি জায়নিস্টদের খুশি করার জন্য একথা বলতেও দ্বিধাবোধ করে না যে, স্বীয় উদ্দেশ্য পূরনের জন্য আমাদেরকে যে কোনো রাস্তা দিয়ে চলতে কোনো আপত্তি নই, চাই এর জন্য আমাদেরকে মানবতার সাথে সওদাবাজিই করতে হয় না কেন ? নিম্নে আমরা বর্তশান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জুনিয়র জর্জ বুশের ভাষনের অনুবাদ পেশ করছি, যে ভাষণ তিনি ইহুদি- খ্রিস্ট ঐক্যপরিষদের মার্কিন শহর নিউ মেক্সিকোর এলবোক ইয়ার্কে...

ইতোমধ্যে হাজার হাজার গ্রেফতারও করা হয়েছে। আমরা নাগরিক অধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতাকে অনেক শর্তযুক্ত করে দিয়েছি। আমরা প্রচার মাধ্যম ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপরও কিছু কিছু অবরোধ আরোপ করেছি এবং বিমানবন্দরে যাত্রীদের আসবাবপত্র ইত্যাদির ক্ষেত্রে কঠোরতা আরোপ করেছি। আমি খুশি যে, মার্কিন জনগণ সিকিউরিটির মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমাদের সহায়তা করছে। সাদা চামড়ার ইহুদি-খ্রিস্টানরা ছাড়া অন্যান্য জাতির আমাদের দেশে অবস্থান (চাই আইনিভাবে হোক বা বেআইনি হোক) আমাদের জাতির জন্য বিপদস্বরূপ। আপনাদের সকলের প্রেসিডেন্ট হওয়ার কারণে আমার দায়িত্ব ও জিম্মাদারি হলো আপনাদের শান্তি, নিরাপত্তা প্রদান করা। ইমিগ্রেশন' (দেশত্যাগ) সম্পর্কেও আমাদের পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন আসবে যাতে আমরা আমাদের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করতে পারি। কিন্তু এর জন্য যখন উপযোগী সময় আসবে তখনই কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তখন ভবিষ্যতের নিউইয়র্ক শহর যার ওপর অনেক বিপদ- আপদ আপতিত হয়েছে তা আবার সাদা চামড়ার লোকদের শহর হবে। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড, ড. কোডালি রাইস, পল ভোলফিটাজ, রিচার্ড ব্যারেল, কংগ্রেসের ইহুদি প্রতিনিধি ও মার্কিন ইসরাইল যোগাযোগ কমিটির (AIPAC) সহায়তায় আমরা আমেরিকার আন্তর্জাতিক পররাষ্ট্রনীতির বিরাট উন্নতি সাধন করেছি। সুতরাং আজকের পর আগামীতে আমেরিকা আন্তর্জাতিক চুক্তির ক্ষেত্রে এমন কোনো পক্ষের ভূমিকা পালন করবে না, যাতে মার্কিন অর্থনীতি ও সাময়িক উদ্দেশ্য বিপদগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমি এখানে বন্ধুবর এরিয়েল শ্যারনের (ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী) কথার উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তিনি বলেন,আমরা সে সকল আন্তর্জাতিক সংগঠন, যারা মার্কিন ও ইসরাইলের জাতীয় স্বার্থের বিরোধী হবে তাদেরকে সম্পর্কহীন মনে করি। হোক তা জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আরব লীগ (যার সম্পর্কে আমার মতামত হলো তাকে এখনই ভেঙ্গে ফেলা হোক), রেডক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটি, ভ্যাটিক্যান কিংবা অন্যান্য সকল ইসলামী সংগঠন। এতদসত্ত্বেও অমানবিক কর্মকান্ডে জড়িতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বিপুল বাজেটের প্রয়োজন। কিন্তু তবুও আমি ১৫ কোটি ডলার যে পরিমাণ আমরা প্রতিবছর ইসরাইলকে সাহায্য ও অনুদান হিসেবে দিয়ে থাকি) সিনিয়র সিটিজেনস (বয়স্ক লোকদের) ভাতা প্রদানের জন্য পাস করেছি যাতে তারা নিজেদের রোগশোকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে। আমরা খুব শিগগিরই

আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে মাটি খোদাইয়ের কাজ আরম্ভ করতে যাচ্ছি যাতে সেখানে পেট্রোল অনুসন্ধান করা যায়। উপরন্তু ইরান ইরাক, উপসাগর ও সৌদি আরব হয়ে নিউইয়র্ক পর্যন্ত সামুদ্রিক পথে পানির নিচ দিয়ে পাইপলাইন বিছানো হবে যার খরচ তারাই বহন করবে। এর পরিবর্তে তাদেরকে নিয়মতান্ত্রিক সাহায্য প্যাকেজ প্রদান করা হবে। আমি এর পূর্বে ২ সেপ্টেম্বর ২০০১ এ এ কথাই বলেছিলাম, আমরা আমাদের শত্রুদেরকে ইনসাফের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবো কিংবা তাদের ওপর ইনসাফ বাস্তবায়ন করবো। মোটকথা, তাদের বিচারের সম্মুখীন অবশ্যই হতে হবে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের ভাষায় এখন সময় এসেছে একথা ঘোষনা করার যে, আমাদেরকে নতুনভাবে দুনিয়ার পুনর্গঠন করতে দাও। যাতে গোটা বিশ্ব আমাদের রঙ্গে রঙ্গিন হয়ে যায়।

আল্লাহর ফজলে আমরা সদা চামড়ার সভ্য লোক এই বিশ্বের ওপর আমাদের স্বাধীন, চিত্তাকর্ষক ও সুন্দর আকিদা-বিশ্বাস চাপিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হবো। কারণ বিশ্ব আজ আমাদের ধন-সম্পদ, প্রাচুর্য ও বিশ্বজনীন পয়গামের বুভুক্ষু। আজকের পর কারো দাড়ি রাখার ওপর আর কোনো ধরনের কড়াকড়ি থাকবে না। নারীদের আর বোরকার আবৃত থাকতে হবে না। আজ থেকে সবসময়ে সকল স্থানের লোক মদ ও নেশা পান করতে পারবে, সিগারেট খেতে পারবে, যৌনক্ষুধা স্বাধীনভাবে মেটাতে পারবে, সমকামিতা করতে পারবে। হোটেলে হোক কিংবা স্বীয় বেডরুমে হোক যৌন সুড়সুড়িমুলক ছবি দেখতে পারবে এবং তাতে অংশ পর্যন্ত নিতে পারবে। আমাদের যে সকল কোম্পানী এ ধরনের নগ্ন ও যৌন ছবি তৈরি করে, নিকট ভবিষ্যতে তা কোনো ধরনের অবরোধ ও নিষেধাজ্ঞা ছাড়াই বিশ্বের আনাচে কানাচে পৌছে যাবে। সন্ত্রাসী মুসলমানরা তাদেরই ধর্ম ও আকিদা-বিশ্বাসের সাথে গাদ্দারি করছে। তারা প্রকৃতপ্রস্তাবে ইসলামকেই অপহরণ করতে চায়। এ জন্য আমরা ইহুদি-খিস্ট্র ঐক্যপরিষদ রাজনীতিকে স্বীয় আকিদা বিশ্বাস থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র রাখি। আমরা যুদ্ধ ও লড়াইকে ধর্ম থেকে দূরে রাখি। এ জন্য আপনারা কখনো মিডিয়ায় দেখবেন না, ইহুদি কিংবা ক্যাথলিকদেরকে সন্ত্রাসী অ্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে। আমরা কাউকে হত্যা করলে ঈমানের নামে নয়; বরং স্বীয় স্বাধীনতা ও তাহযীব তামাদ্দুন রক্ষা করতে হত্যা করি। তারা কেন আমাদেরকে অপছন্দ করে। প্রকৃতপক্ষে তারা সেই জিনিসকে অপছন্দ করে যা আমি এই অধিবেশনে দেখছি। আর তা হলো পেট্রোল, মোবাইল, মোবাইল ও ইন্সুরেন্স কোম্পানীর আর্থিক সহযোগিতায় নারী পুরুষের নির্বাচন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হচ্ছে, এর চেয়েও বেশি যে জিনিসটি তাদের নিকট অপছন্দনীয় তা হলো আমাদের মার্কিন ইহুদি নাগরিকরা ইংল্যান্ড ছাড়া বিশ্বে একমাত্র একক মিত্র ও বন্ধু ইসরাইলের স্থায়ী সমর্থন লাভ করার জন্য কোটি কোটি ডলার

আল্লাহর ফজলে আমরা সদা চামড়ার সভ্য লোক এই বিশ্বের ওপর আমাদের স্বাধীন, চিত্তাকর্ষক ও সুন্দর আকিদা-বিশ্বাস চাপিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হবো। কারণ বিশ্ব আজ আমাদের ধন-সম্পদ, প্রাচুর্য ও বিশ্বজনীন পয়গামের বুভুক্ষু। আজকের পর কারো দাড়ি রাখার ওপর আর কোনো ধরনের কড়াকড়ি থাকবে না। নারীদের আর বোরকার আবৃত থাকতে হবে না। আজ থেকে সবসময়ে সকল স্থানের লোক মদ ও নেশা পান করতে পারবে, সিগারেট খেতে পারবে, যৌনক্ষুধা স্বাধীনভাবে মেটাতে পারবে, সমকামিতা করতে পারবে। হোটেলে হোক কিংবা স্বীয় বেডরুমে হোক ...

আর্থিক সহায়তা দেয়। তারা চায় কিছু কিছু মুসলিম দেশের সরকারকে খতম করে দেয়া হোক! কিন্তু আমরা এরকম হতে দেবো না। আমাদের শত্রুরা মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইসরাইলকে নির্মূল করে দিতে চায়। তারা চায়, ইহুদি জাতিকে আমাদের ইহুদি প্রদেশ নিউইয়র্কে পাঠিয়ে দিতে। উপরন্তু তারা চায় এশিয়া ও আফ্রিকার সুবিস্তৃত অঞ্চলে কৃষ্ণাঙ্গ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বসতি স্থাপনে বাধ্য করা উচিত। কিন্তু এটা আমার লাশের ওপর দিয়ে অতিক্রম করেই সম্ভব। সন্ত্রাসবিরোধী এই অভিযানে শুধু আফগান নাগরিকরাই নিহত হয়নি; বরং গোটা বিশ্বে ইহুদি ও খ্রিস্ট ব্যাংক ও জনকল্যাণ মূলক সংস্থা সমূহ বন্ধ করে দিয়ে আমরা সন্ত্রাসীদেরকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছি। এখন ক্ষুধার্ত শিশুদের আহার দানের বাহানা গ্রহণযোগ্য মনে করা হবে না। পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্তের অর্ধ অঞ্চলের প্রতিটি দেশকে আমরা একথা ঘোষণা করে দিয়েছি, তারা ইহুদি-খ্রিস্টবিরোধী কণ্ঠকে, কঠোরভাবে নিস্তব্ধ করে দেবে। সকল দেশকে এখন এ রাস্তাই গ্রহণ করতে হবে, তারা হয়তো আমাদের সহায়তা ও সমর্থন করবে; কিংবা সন্ত্রাসীদের পক্ষালম্বন করবে। আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে আপনাদের জানাচ্ছি, সকল দেশ আমাদের এ কথা মেনে নিয়েছে। প্রতিটি রাষ্ট্রের সরকার সেসব অভ্যন্তরীণ শত্রুর বিরুদ্ধে সক্রিয় শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যারা আমেরিকার জন্য হুমকি হতে পারে। আমার পিতার (সিনিয়র জর্জ বুশ) নেতৃত্বে যদিও আমেরিকা স্নায়ুযুদ্ধ করেছে, কিন্তু আজ আমাদের নিকট সুযোগ এসেছে আমরা আমাদের পুরনো শত্রু-রুশ, চীন ও ভারতের সাথে মিলে মজবুত ও শক্তিশালী ঐক্য গড়ে তুলি। আমেরিকা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে মৌলবাদিদের উৎখাত করতে এবং তাদের দেশে স্বাধীন পরিবেশ তৈরি করতে অংশীদারিত্বের সাথেও মিলেমিশে কাজ করছে এবং করতে থাকবে। সে সকল দেশের (যার মধ্যে প্রায় দুনিয়ার অর্ধেক মানুষ রয়েছে) ইসলামী মৌলবাদিদের উৎখাত করতে এবং তাদের চিরতরে নির্মূল করতে আমাদের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা রয়েছে। কিন্তু আমি সর্বপ্রথম বিশ্ববাসীর সামনে এই ঘোষনা করছি। ইসলাইলের সাথে আমাদের ঐক্য লৌহ প্রাচীরের মতোই অটুট। আমি পূর্ণাঙ্গভাবে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সেই যুদ্ধের সমর্থন করছি যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন। আজ আমি ঘোষণা দিচ্ছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইয়াসির আরাফাত ও তার অধীন অন্যায় ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িতদের সাথে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কচ্ছেদ করবে যারা আমাদের ইহুদি ভাই বোনদের হত্যা করছে এবং বোমা বিস্ফোরণে তাদেরকে উড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা আজকের পর নিরাপত্তা পরিষদের ১৪২ নং প্রস্তাবের সমর্থন করবো না, যার সমর্থনে আমেরিকা ১৯৬৭ সালে শান্তি- নিরাপত্তার খাতিরে ভোট দিয়েছিল। মি. শ্যারন একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন আমরা দুই নৌকায় এক সাথে সওয়ার হতে পারি না। একদিকে আমরা বিন লাদেনের নেতৃত্ব চলমান

ইসলামী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করবো, অপরদিকে ইসরাইলের পক্ষ থেকে সূচিত এ ধরনের যুদ্ধের বিরোধিতা করবো। ইসরাইল ৫৩ বছর ধরে আরব সেনাবাহিনী ও ফিলিস্তিনি দখলদারিত্বের সম্মুখীন। আমি জানি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল ইসরাইলের এফ- ১৬ বিমানের মাধ্যমে বাইতুল লাহম- এর ওপর বোমাবর্ষন করার নিন্দা করছেন। কিন্তু আমি পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে একথা বলতে পারি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল ও আমি একই ধ্যান-ধারণার অধিকারী। এ জন্য আমার বিশ্বাস, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তার অবশিষ্ট সময়গুলো ইসরাইলের শান্তি নিরাপত্তার খাতিরেই অতিবাহিত হবে। ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার কারনে ইসরাইলের সংঘটিত অর্থনৈতিক ক্ষতির বদলায় আমরা ইসরাইলকে দুই কোটি ডলারের সাহায্য প্রদান করেছি। আমরা ঐ সমস্ত সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে ছাড়বো না যারা ইসরাইল ও আমাদের অন্যান্য মিত্র দেশগুলোর বিরোধিতা করে। তাদের ব্যাপারে আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে স্পষ্ট। **[আমরা আজকের পর কোনো ধরনের প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়ার পরওয়া করবো না। আমেরিকা আর এমন দেশ নেই যার নিকট দুনিয়া শান্তি নিরাপত্তার জন্য আসবে; বরং আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গি এখন বিশ্ববাসীর সামনে সুস্পষ্ট আমরাই সে সকল দেশের বরুদ্ধে যুদ্ধ ছুড়ে দেবো, যাদেরকে আমরা টার্গেট বানাবো এবং আমরাই সে সকল দেশকে পুনর্নির্মাণ ও পুনর্গঠনের পূর্বে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেবো। আজকের পর আমরা হাত গুটিয়ে রেখে বিশ্বকে রক্তে ডুবন্ত দেখবো না। আমেরিকা বিশ্বশান্তির জন্য কাজ করবে। কিন্তু যদি আমাদের রক্ত প্রবাহিত করার প্রয়োজন পড়ে তাহলে আমরা রক্ত অবশ্যই দেবো। আজ থেকে সবসময়ের জন্য আমেরিকাই এ ফয়সালা করবে কবে, কোথায়, কিভাবে ও কেন যুদ্ধ করা হবে এবং কেন শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে।]**

আমার পিতা এই ইউনিয়নের অধিবেশনেই যা ২৯ জানুয়ারি ১৯৯১ এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে বলেছিলেন, আমি এই উচ্চকক্ষে আপনাদেরকে ও সমগ্র আমেরিকানদেরকে একথা বলতে এসেছি, আজ আমরা একটি সিদ্ধান্তকারী মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছি।

বিশ্বের বিভিন্ন অংশ তথা মহাশুন্য, সমতল ও মরুভূমি অঞ্চলের ক্ষেত্রে আমরা জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা জানি, আমরা সেখানে কেন আছি ? কারণ আমরা আমেরিকান জাতি এবং আমাদের চেয়ে একটি বড় জগতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমরা দীর্ঘ দুই শতাব্দী ধরে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কঠিন পরিশ্রম ও অবিরাম সংগ্রাম করে আসছি। আমরা মূলনীতি ও মানবতার আসন্ন বিপদ-আপদ ও হুমকি প্রতিরোধ করার জন্য বিশ্বের নেতৃত্ব দিচ্ছি।

উপস্থিত সুধী!

আমরা আশা করছি, আমি বিগত ১০ বছরে আরব ও মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ, লড়াই করে এবং সে সকল দেশের মধ্যে অস্থিরতা-অনৈক্য বিস্তার করে বুশ বংশের উত্তরাধিকার সংরক্ষণ করেছি। এখন আমাদের কোনো শাসক কিংবা কোনো আরব বাদশাহ স্বীয় গাড়িতে জ্বালানি ভরতে বাধা প্রদান করতে পারবে না। কমপক্ষে এটা সে সময় পর্যন্ত তো হতে পারবে না যতক্ষন আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট থাকবো। তারা পেট্রোলের উৎপাদন বৃদ্ধি, তার মূল্য হ্রাস করতে বাধ্য হবে। এমনিভাবে আমি মনে করি, বিন লাদেন ও অমানবিক যকর্মকান্ডে জড়িতদের থেকে প্রতিশোধ নেয়ার মাঝে আমরা আমেরিকানরা সবাই সম্পদ অর্জনের সুযোগ পাবো। ১১ সেপ্টেম্বরে শহীদ হওয়া আমাদের হিরোদের সম্ভবত আমরা এভাবেই সম্মান করতে পারি। ধন্যবাদ খোদা আমেরিকাকে রক্ষা করুন।

বুশের ভাষণের আলোকে বিশ্বায়ন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ জুনিয়রের উল্লিখিত ভাষণ দ্বারা মার্কিন সংকল্প ও উদ্দেশ্যাবলী বিশ্ববাসীর সামনে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। যদিও মার্কিন প্রেসিডেন্ট তার ভাষণে কোনো নতুন কথা বলেননি বরং সে সমস্ত কথাই উল্লেখ করেছেন যা বিগত কয়েক বছর ধরে তারা করে আসছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। কিন্তু এসব সংকল্প এতো স্পষ্ট ও আগ্রাসী ভাষায় প্রকাশ সম্ভবত এটাই প্রথম। এই ভাষণে যদিও মার্কিন প্রেসিডেন্ট গ্লোবালাইজেশন শব্দের নাম নেননি। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, গোটা ভাষনই গ্লোবালাইজেশনের আসল উদ্দেশ্যকেই পূরণ করার সংকল্প ও ইচ্ছার দিকে ইঙ্গিত বহন করে। কারণ গ্লোবালাইজেশনের প্রকৃত উদ্দেশ্য 'আমেরিকানাইজেশন' ছাড়া আর কিছুই নয়। জর্জ বুশ মার্কিন মূল্যবোধ, মার্কিন আধিপত্য ও মার্কিন মোড়লীপনাকে গোটা দুনিয়ার ওপর চাপিয়ে দেয়ার ইস্পাত কঠিন শপথ ও সংকল্প করেছেন এবং অতীতে তার ইসলামবিদ্বেষী কৃতকর্মের ওপর গর্ব ও অহংকার প্রকাশ করেছেন। জর্জ বুশ ইসলামবিদ্বেষী ও মার্কিন আধিপত্যকে গোটা বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দেয়ার শুধু ইচ্ছাই করেননি, বরং তা কাজে পরিণত করেও দেখিয়েছেন। এই ভাষণের পূর্বে ও পরে বিশ্ব মানচিত্রে সংগঠিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে এই আলোকেই দেখা উচিত। প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ হতে আফগানিস্তানের ধ্বংসলীলা, অতপর ইরাকের ধ্বংস সাধন পর্যন্ত সকল ঘটনা এই ধারাবাহিকতারই অংশ। এতে সভ্যতার দাবিদার জাতি বর্বরতা ও পাশবিকতার যে নজির প্রদর্শন করেছে তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়াও কঠিন। আফসোস, গোটা বিশ্ব এই বর্বরতা ও পাশবিকতা প্রত্যক্ষ করেও মুখে কুলুপ এঁটে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, এমনকি যুদ্ধাপরাধে জড়িত মার্কিন সৈন্যদের আশ্রয়ও দিচ্ছে। বিশ্বের ৪৩ টি দরিদ্র দেশ আমেরিকার হুমকিতে এমন চুক্তিতে স্বাক্ষর রেখেছে, যার অধীনে তারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে যে কোনো মার্কিন নাগরিক, সেনাবাহিনী কিংবা সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের আন্তর্জাতিক আদালতে (আইসিসি) মামলা করতে পারবেনা। এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এর এক রিপোর্টে প্রকাশ করা হয়েছে, আমেরিকা এসকল দেশকে ৩০ জুনের ভেতর এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করার হুমকি দিয়েছিল। অন্যথায় তাদের সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করে দেবে। পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমানে দুনিয়ার ১৪০ টি দেশে মার্কিন সৈন্য মোতায়েন রয়েছে। মোটকথা আজ বিশ্ব একটি সিদ্ধান্তকারী মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে, হয়তো সে নিজের জন্য ধ্বংস ও বরবাদির রাস্তা নির্বাচন করবে নতুবা গোলামী, আধিপত্য ও ইজারাদারি গ্রহণ করে গোলামী ও তাঁবেদারি মেনে নেবে এবং সে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের অংশ হয়ে যাবে। বাস্তবতা এই যে, বিশ্বায়নের নীতিনির্ধারকরা এই আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের রূপরেখা ও খসড়া পেশ করেছিল তার রোডম্যাপ তৈরি হয়ে গেছে। এই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় কেবল এতটুকু দেরি আছে যে, সকল দেশের আঞ্চলিক সরকারগুলোকে নির্মূল করে জাতিসংঘের অধীন করে দেয়া হবে, যা বাহ্যত কোনো কঠিন মনে হয় না।

উত্তরাধিকার আইনে নারীর অবস্থান

মোঃ নূরুল আমিন

একটা পারিবারিক ঘটনা দিয়েই আজকেই আলোচনা শুরু করতে চাই। ১৯৬২ সালের মে-জুন মাস হবে। আমি মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে গ্রামের বাড়িতে রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করছি। একদিন গভীর রাতে আমাদের বাড়িতে তিনজন মেহমান এলেন। দু'জনের নাম মনে আছে- একজন জালাল আহমদ চৌধুরী, আরেকজন মাওলানা বরকত উল্লাহ, বাড়ি ফেনী জেলার দাগনভূঞা উপজেলা সদরের দক্ষিণে দেবরামপুর গ্রামে, দুধমুখা এতিমখানার কাছেই। বালাবাহুল্য, ফেনী তখনো জেলা এবং দাগনভূঞা উপজেলা হয়নি। যোগাযোগ ব্যবস্থাও ততো ভালো ছিল না, তারা প্রায় ১০ মাইল পায়ে হেঁটে এসেছেন এবং কাচারির সামনে এসে বাবা চাচাদের নাম ধরে ডাকতে শুরু করেছেন। তারা বললেন, আমরা আপনাদের আত্মীয়, আপনারা বের হয়ে আসুন, অনেকদূর থেকে এসেছি তাদের ডাকাডাকিতে সবার ঘুম ভেঙ্গে গেল। হারিকেন, চেরাগ নিয়ে বয়স্ক পুরুষরা আমরা সবাই কাচারিতে গিয়ে মেহমানদের সাথে পরিচিত হলাম এবং তাদের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত শুরু হয়ে গেল। আলাপ-আলোচনায় তারা জানালেন যে, তারা আমাদের মরা কুটুম। জালু চৌধুরীর আব্বার ফুফু অর্থাৎ তার এক দাদীকে বিয়ে করেছেন আমার বাবার দাদা মোহাম্মদ ওয়াসেক ভূঁইয়া। তার বিরাট পাটের ব্যবসা ছিল, এ জন্য তিনি ওয়াসেক বেপারী নামেও পরিচিত ছিলেন। মেহমানরা জানালেন যে, তারা পুরানো কুটুম্বিতা ঝালাই করতে এসেছেন। কথাবার্তায় বুঝা গেল যে, আমরাই তাদের সে আত্মীয় কিনা তাও তারা ফারাক করে দেখতে চান। ওয়াসেক বেপারীর দুই পুত্র ছিলেন, বড়জনের একপুত্র এবং ছোটজনের তিনপুত্র। শেষোক্ত তিন সহোদরের মধ্যে একজন ছিলেন আমার পিতা- তারা চাচাতো জেঠাতো চার ভাই- ই তখন জীবিত। প্রসঙ্গক্রমে জালু চৌধুরী তাদের কাছ থেকে তাদের দাদীর নাম জানতে চাইলেন; কিন্তু কেউই তার নাম বলতে পারলেন না। কথাটা অন্দরমহলে ছড়িয়ে পড়লো। আমার বড় মা অর্থাৎ জেঠাই অত্যন্ত ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। কথাটা তার কানে আসতেই তিনি বললেন যে, তার দাদী শাশুড়ির নাম রাহাতুন্নেছা। এই তথ্যটা কাচারি ঘরে মেহমানদের কান পর্যন্ত পৌছাল। মাওলানা বরকত উল্লাহ একটা কাগজের সাথে নামটি মিলিয়ে বললেন যে, আমরা যা খুঁজছি তা পেয়ে গেছি। আমরা উপলব্ধি করলাম যে, তারা রাহাতুন্নেছার বংশধরদেরই খুঁজছেন। শিকড় খুঁজতে তারা এতদূর এসেছেন দেখে আমাদের বাড়ির সবাই আনন্দে আটখানা হয়ে গেলেন। সেদিন রাতের বেলা- খাওয়া দাওয়া, মেহমানদারি শেষে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, আর কথাবার্তা হয়নি। সকাল বেলা আসল ঘটনা জানা গেল। ঐ সময় সারাদেশে ভূমি রেকর্ড হালনাগাদকরন ও এটেস্টেশনের কাজ চলছিল। জালু চৌধুরী পরিবারের জমি এটেস্টেশন করতে গিয়ে ধরা পড়লো যে তাদেরই এক বংশধর রাহাতুন্নেছা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পৈত্রিক সম্পত্তি গ্রহণ করেননি কিংবা তার রক্ত সম্পর্কিত কোনো আত্মীয়ের পক্ষে না দাবি দিয়েও আসেননি। এ অবস্থায় এটেস্টেশন অফিসার তাদের নথি আটকিয়ে দিয়েছেন। এই নথি ছুটানোর জন্য এখন তারা হন্যে হয়ে রাহাতুন্নেছার স্বামীর বাড়ি এবং অধঃস্তন বংশধরদের খুঁজছেন। তারা অনেক পুরাতন ও 'মরা' আত্মীয়ের বাড়িতে গেছেন; কিন্তু তার সন্ধান পাননি। শেষ পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে এসে তার সন্ধান পেয়েছেন। তারা বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য আমার বাবা-চাচাদের সাহায্য চাইলেন এবং বললেন যে, মরহুমা রাহাতুন্নেছা পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ বিশেষ সাড়ে আট কানি জমি পাওনা হয়েছিলেন (১০ একর ২০ শতক) তারা এই জমি গ্রহণ করে অথবা তার মূল্য নিয়ে না-দাবিপত্র লিখে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। চার ভাই বৈঠকে বসলেন, দাদীর কবরের অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করলেন, পারলেন না। দীঘিরপাড়ে কবরস্থানে তার কবর সবাই একমত হলেন; কিন্তু কোথায় তা বলতে পারলেন না অথবা তার কবরের কাছে গিয়ে কখনো তারা খাস করে তার মাগফিরাতও চেয়েছেন একথা মনে করতে পারলেন না। বৈঠকে তারা একমত হলেন যে, দাদীর কবর কোথায় তারা ভুলে গেছেন, কখনো জিয়ারত করেছেন কিনা মনে পড়ে না, সে দাদীর সম্পত্তি তারা গ্রহণ করবেন না। তারা না-দাবিপত্র লিখে দিয়েছিলেন। এরপর থেকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই পরিবারটির সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পৈত্রিক সম্পত্তিতে ইসলামে মেয়েদের অধিকারের দৃষ্টান্ত হিসেবে আমি এই ঘটনাটি উল্লেখ করলাম। এই ঘটনায় সবচেয়ে বড় লক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে- একজন মহিলা জীবিতাবস্থায় পৈত্রিক সম্পত্তির নির্ধারিত হিসসা গ্রহণ করেননি, তার মৃত্যুর তিন পুরুষ পরও উত্তরাধিকারীদের ঐ সম্পত্তির ওপর থেকে তার উত্তরাধিকারীদের হক নষ্ট হয়নি বরং আইন তার পিতৃকুলকে তার হক বুঝিয়ে দিতে বাধ্য করেছে। এটি নিঃসন্দেহে একটি অন্যন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত এবং এই দৃষ্টান্ত একমাত্র ঐ আইনই স্থাপন করতে পারে যার উৎস আল্লাহর কালাম।

সম্প্রতি সরকারঘোষিত নারীজাতিকে কেন্দ্র করে ইসলামের উত্তরাধিকার আইন বাতিল বা সংশোধন প্রশ্নে দেশব্যাপী যে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছে তার প্রেক্ষাপটে একটি কেসস্টাডি হিসেবে পারিবারিক এই ঘটনাটি আমি উল্লেখ করলাম। বলাবাহুল্য, সরকার সম্প্রতি নারীনীতি ঘোষণা করেছে এবং এই নীতিতে নারী-পুরুষের সমানাধিকার ও বৈষম্যের বিষয়টি ৩২টি জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। আলেমদের নেতৃত্বে সাধারণ মুসলমানরা এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেছেন। বিশেষ করে নীতিমালার ৯.১৩ নং অনুচ্ছেদ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন' শিরোনামে "স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে নারীর সমান সুযোগ ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেয়া এবং সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা" এই বাক্যটি বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। আবার নারীদের অধঃপতনের মূল কারণ হিসেবে ইসলাম, ইসলামী শরিয়াহ এবং মৌলবাদকে দায়ী করে নারীনেত্রী হেনা দাস, রোকেয়া কবির, তানিয়া আমীর, দিপু মণি, কবীর চৌধুরী, আফরোজা হক প্রমুখ কর্তৃক আলেমদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণায় আলেম সমাজ আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। সম্প্রতি বাদ জুমা মুসল্লিদের বিক্ষোভ সমাবেশ এরই বহিঃপ্রকাশ ছিল। আশার কথা যে সরকার ইতোমধ্যে তাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন এবং বলেছেন যে, উত্তরাধিকার আইন সংশোধন অথবা কোরআন-সুন্নাহবিরোধী কোনো আইন করার পরিকল্পনা সরকারের নেই। তাদের এই অবস্থান প্রশংসাযোগ্য। তবে জরুরি অবস্থার মধ্যেও বিধর্মী ও মুরতাদরা যখন ইসলাম, ইসলামী আইন এবং তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে সভা-সমাবেশ করে গালাগালি করেন, মানুষকে বিভ্রান্ত করেন তখন সরকারের নীরবতাকে

মানুষ সন্দেহের চোখেই দেখেন। ইসলামের নারীর অবস্থান মর্যাদার অবস্থান। এখানে সন্তানের কাছে মায়ের স্থান পিতার আগে। নারীকে নটি বা ভোগ-বিলাসের সামগ্রী হিসেবে ইসলাম দেখতে চায় না বরং তার যতো অনুশাসন তার সবকিছুই সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ এবং তার জন্মদাত্রি মা হিসেবে তার বিকাশ ও প্রতিষ্ঠাকে নিশ্চিত করার জন্য নিবেদিত। নারীর শালীনতা, মর্যাদা এবং ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির মধ্যে মানবজাতির কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনও নারী-পুরুষ উভয়কে তার প্রাপ্য মর্যাদা দিয়েছেন। এখানে বৈষম্যের অবকাশ রাখা হয়নি। ইসলামে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে কোনো প্রকার অস্পষ্টতা নেই। উত্তরাধিকারের ধরন প্রকৃতি কি হবে তাও এখানে পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে তার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি কারা পাবেন এবং কে কতটুকু পাবেন সে সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্টভাবে তা বর্ণনা করেছেন। এই বন্টন আদল ও ইনসাফভিত্তিক। পবিত্র কোরআনের সুরা নিসার ৭, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ৩৩ ও ১৭৬ নং আয়াতে পরিস্কারভাবেই এই উত্তরাধিকার আইন বিধৃত হয়েছে। সূরা নিসার ৭নং আয়াতে বলা হয়েছে- পিতা- মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যাক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা- মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে তা কম হোক বা বেশি হোক, এক নির্ধারিত অংশ। এই সূরার ৩৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "আর প্রত্যেক ধন-সম্পত্তির জন্য আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি, যা পিতা- মাতা ও আত্মীয়-স্বজনগণ পরিত্যাগ করে যায়, আর যাদের সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার সম্পাদিত হয়েছে তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দাও।" নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত আছেন। আবার ১১নং আয়াতে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে। আল্লাহতায়ালা তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের অংশ পাওয়ার ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, পুত্রের অংশ দুই কন্যার সমান আর যদি শুধু কন্যাগণ দু বা অধিক হয় তাহলে তারা মৃত ব্যক্তি পরিত্যাক্ত সম্পত্তির ২/৩ অংশ পাবে। আর একটি মাত্র কন্যা থাকলে পাবে ১/২ অংশ। মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে পিতা-মাতা অর্থাৎ উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ১/৬ অংশ, আর যদি ঐ মৃত ব্যক্তির কোনো সন্তান না থাকে এবং শুধু পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হয় তাহলে মাতার প্রাপ্য ১/৩ অংশ আর যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক বোন থাকে তাহলে মাতা পাবে ১/৬ অংশ। এর সবকিছুই মৃত ব্যক্তির অছিয়ত আদায় করার পর এবং ঋণ পরিশোধ করার পর। তোমাদের পিতা এবং সন্তানদের মধ্যে কে তোমাদের উপকার সাধনে অধিক নিকটবর্তী তা তোমরা অবগত নও। এটি আল্লাহর বিধান। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। সূরা নিসার ১২নং আয়াতেও আল্লাহ উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য অংশ নির্ধারন করে দিয়েছেন। এই আয়াতে বলা হয়েছে, "তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির ১/২ অংশ তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে। আর যদি স্ত্রীগণের কোনো সন্তান থাকে তবে, তোমরা পাবে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির ১/৪ অংশ অংশ। এটা তারা যে অছিয়ত করে তা আদায় ও ঋণ পরিশোধ করার পর। আর তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির ১/৪ অংশ পাবে, যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের কোনো সন্তান থাকে তাহলে তারা পাবে তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির ১/৮ অংশ, এসব তোমাদের কৃত অছিয়ত আদায় ও ঋণ পরিশোধ করার পর। যদি কোনো পুরুষ অথবা নারী পিতা- মাতাহীন অবস্থায় কাউকে উত্তরাধিকারী করে এবং তার বৈপিত্রেয় ভাই অথবা বোন থাকে তবে প্রত্যেকে ১/৬ অংশ পাবে। তারা যদি তদপেক্ষা বেশি হয় তবে তারা সকলে একত্রে ১/৩ অংশের অংশীদার হবে। এটা অছিয়ত আদায় ও ঋণ পরিশোধ করার পর এ শর্তে যে কারো ক্ষতি না হয়। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও অতীব সহনশীল।" ১৭৬ নং আয়াতে আল্লাহ আরো বলেছেন, "হে নবী, লোকরা আপনার নিকট উত্তরাধিকারের বিধান জিজ্ঞেস করে, আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদেরকে পিতা মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্পর্কে ব্যবস্থা দিচ্ছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তার একজন (সহোদরা বা বৈমাত্রেয়) বোন থাকে তবে সে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির ১/২ অংশ পাবে এবং এ ব্যক্তি বোনের উত্তরাধিকারী হবে, যদি (বোন মারা যায় এবং) তার কোনো সন্তান না থাকে। আর যদি বোন দু'জন হয় তবে তারা ভাইয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তির ২/৩ অংশ পাবে। আর যদি ভাই বোন উভয় থাকে তবে একজন পুরুষের অংশ হবে দু'জন নারীর অংশের সমান। তোমরা পথভ্রষ্ট হবে এই আশংকায় আল্লাহতায়ালা (তার বিধান) তোমাদের জন্য পরিস্কারভাবে বর্ণনা করছেন। আল্লাহতায়ালা সর্ববিষয়ে পূর্ণ অবগত।

কোরআনে বর্ণিত উত্তরাধিকার আইন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এতে নারীদের বঞ্চিত করা বা তাদের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা তো দূরের কথা বরং তাদের হক আদায়কে প্রাধান্যই দেয়া হয়েছে। মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির উপর যে তিনটি প্রাথমিক হক নির্ণয় করা হয়েছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে স্ত্রীর অপরিশোধিত মোহর পরিশোধ করা, আবার পবিত্র কোরআনে উত্তরাধিকারী হিসেবে যাদের অংশ বর্ণনা করা হয়েছে কিংবা ইজমা বা কিয়াসের দ্বারা যাদের অংশ প্রমাণিত রয়েছে তাদেরকে যাবিল ফুরুজ বলা হয়। যাবিল ফুরুজ অর্থ অংশীদার। কোরআনে এদের জন্য মোট ৬টি অংশ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যেমন: ১/২, ১/৪, ১/৮, ২/৩, ১/৩ ও ১/৬ অংশ এই ছয় প্রকার অংশের জন্য কোরআন যাবিল ফুরুজ হিসেবে মোট ১২ জনকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এই ১২ জনের মধ্যে পুরুষ হলো মাত্র ৪ জন, অবশিষ্ট ৮ জন নারী। ৪ জন পুরুষের মধ্যে রয়েছেন পিতা, দাদা, সৎ ভাই ও স্বামী। পক্ষান্তরে ৮জন নারীর মধ্যে আছেন, স্ত্রী, কন্যা নাতনী (পুত্রের কন্যা), সহোদরা বোন, বৈমাত্রেয়া বোন, বৈপিত্রেয়া বোন, মাতা ও দাদী। নারীদের এখানে যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা অনন্য। অন্য কোনো ধর্ম বা সমাজব্যবস্থায় এর কোনো নজির নেই।

বলাবাহুল্য, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করার সময় সর্বপ্রথম যাবিল ফুরুজদেরকে তাদের নির্ধারিত অংশ প্রদান করতে হবে। যাবিল ফুরুজদের অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা আসাবাগনের মধ্যে বন্টন করতে হবে। আসাবা অর্থ হচ্ছে অবশিষ্টাংশভোগী। এরপর আসে যাবিল আরহাম বা দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনের প্রশ্ন এসব ক্ষেত্রেও কিন্তু নারীরা বাদ পড়েননি। তারা তাদের যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা পেয়েছেন।

এই নিবন্ধের সংক্ষিপ্ত কলেবরে ইসলামের উত্তরাধিকার আইন ও ফারায়েজ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর নয়। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এই যে, ইসলাম নারীদের যে অধিকার দিয়েছে অন্যান্য ধর্ম ও বিশ্বব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে তার স্বীকৃতি না দিয়ে কিংবা মূল্যায়ন না করে একশ্রেণীর নারী পুরুষ বৈষ্যমের মূল টার্গেটে পরিণত করেছে। পুত্র কেন কন্যার তুলনায় পৈত্রিক সম্পত্তির দিগুন পাবে এটাই তাদের বড় প্রশ্ন। তারা এর উত্তর খুজে পান না বলেই বিভ্রান্তি ছড়ান এবং যেখানে সেখানে বৈষ্যম্যের প্রশ্ন তোলেন। আমি আগেই বলেছি পবিত্র কোরআনে যাদের অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে মাত্র ৪জন পুরুষ,অবশিষ্ট ৮ জনই নারী। এতে কন্যার অংশকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যা তারা পাবেই। পক্ষান্তরে একই পিতা-

মাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করার পরও এতে পুত্রের অংশ নির্দিস্ট করে তাদেরকে যাবিল ফুরুজের অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি; পুত্রদের রাখা হয়েছে আসাবা হিসেবে। উপরন্তু পুত্রের অংশ পাবার ব্যাপারে অংশকে আসল ভিত্তি বলে সাবস্ত করা হয়েছে। এখানে পুত্র প্রাধান্য পায়নি বরং কন্যাই পেয়েছে। এটা বৈষম্য নয়, আল্লাহর ইনসাফ। কন্যা সন্তান যদিও পুত্রের অর্ধেক পায় তথাপিও সবকিছু মিলিয়ে হিসাব করলে দেখা যায় যে, কন্যার সম্পত্তি পুত্রের সম্পত্তির চেয়ে কম নয়।

সাংসারিক জীবনের কিছু কঠোর বাস্তবতা রয়েছে। নারীবাদিরা আমাদের সমাজকে যতই পিতৃতান্ত্রিক বলে গালি দিক না কেন, পিতার মৃত্যুর পর পুত্রের ওপরই সংসারের সব রকমের ঝামেলা এসে পড়ে। মায়ের দেখাশুনা, ছোট ভাই- বোনদের লালন পালন, লেখা-পড়া, বিয়ে- শাদী, বোনদের স্বামী-শশুর পক্ষের আত্মীয়- স্বজনসহ পারিবারিক মেহমানদের সেবাযত্ন, সামাজিকতা রক্ষা সব কাজই ছেলেদের উপর বর্তায়। বিবাহিত বোনরা ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়িতে এসে নিজেরা রান্না করে খায় না, পিতার অবর্তমানে ভাইদের কাছেই থাকেন। তাদের রক্তের সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হয় না। দায়িত্ব পালন ও মেহমানদারির জন্য যে অর্থ ব্যয় হয় তা ছেলেদের অংশ থেকেই যায়। এ অবস্থায় উত্তরাধিকার আইনে ছেলেদের অংশের পরিশাণ মেয়েদের তুলনায় বেশি নির্ণয় করে আল্লাহ তার ইনসাফের দৃষ্টান্তই স্থাপন করেছেন। এতে মেয়েদের অংশ কমে যায়নি। স্বামীর কাছ থেকে তারা যে মোহরানা পাচ্ছেন তার উপর অধিকার শুধু তাদেরই। আবার তার ভরনপোষণের দায়িত্বও তার স্বামীর। এখানে একজন নারীর নূন্যতম দায়িত্বও নেই। বরং নারী যা উপার্জন করবে শরিয়া অনুযায়ী তার উপর তার অধিকার তার একারই, অবশ্য তিনি যদি স্বেচ্ছায় স্বামী-সন্তান বা শশুর- শাশুড়ির জন্য খরচ করেন তাতে কোনো বাধা নেই। বাধ্যবাধ্যকতাতেই বাধা রয়েছে। এছাড়াও তারা প্রত্যেকেই স্বামী, ভাই এবং বোনদের থেকেও উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি প্রাপ্য হন। এ প্রেক্ষিতে নারীর সবগুলো উত্তরাধিকার ও পাওনা যদি যোগ করা হয় এবং তার সাথে সামাজিক দায়িত্ব মিলিয়ে দেখা হয় তাহলে দেখা যায় যে, ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের প্রাপ্তি কোনো অংশেই কম নয়। এই সহজ সত্যটুকু অনেকে বুঝেন না বা বুঝার চেষ্টা করেন না বলেই বিপত্তি ঘটে। বস্তুতঃ সম্পত্তিতে নারীর অধিকার বা উত্তরাধিকারের বেলায় মুসলিম সমাজে কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা হচ্ছে এই অধিকার বাস্তবায়নের। মোহর হচ্ছে মুসলিম নারী- পুরুষের বিবাহের অন্যতম প্রধান শর্ত। মোহর ছাড়া বিয়ে হতে পারে না। অনেক পুরুষ মোহর পরিশোধ করেন না। এটা মাফ করার বিষয়ও নয়। যদি হতো তা হলে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি ফারায়েজ অনুযায়ী ভাগ- বাটোয়ারার আগে কোরআনে অপরিশোধিত মোহর পরিশোধ করার নির্দেশ থাকতো না। একইভাবে অনেক ভাই পৈত্রিক সম্পত্তির ন্যায্য অংশ থেকে বোনদের বঞ্চিত করেন, ভূমি রেকর্ডে বোনদের অস্তিত্বকে গোপন রেখে জমা-খারিজ রেকর্ড সৃষ্টি করেন, ভূমি অফিসের কর্মচারীরা এ কাজে তাদের সাহায্য করেন। এ ধরনের ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা করা হলে মেয়েরা তাদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতে পারেন না। ইসলামের এই উত্তরাধিকার আইন সারাবিশ্বে এক ও অভিন্ন এবং বিগত সাড়ে চৌদ্দশ' বছর ধরেই তা বলবৎ রয়েছে। এই

> সাংসারিক জীবনের কিছু কঠোর বাস্তবতা রয়েছে। নারীবাদিরা আমাদের সমাজকে যতই পিতৃতান্ত্রিক বলে গালি দিক না কেন, পিতার মৃত্যুর পর পুত্রের ওপরই সংসারের সব রকমের ঝামেলা এসে পড়ে। মায়ের দেখাশুনা, ছোট...

আইন মানুষের তৈরিও নয় এবং কোনো সরকারের পক্ষে তা সংশোধনের বিষয়ও নয়। এটা হচ্ছে কার্যকর করার বিষয়। যারা এর সংশোধন বা প্রতিস্থাপনের কথা বলেন, তারা আমাদের বন্ধু হতে পারেন না। যারা এই উত্তরাধিকার আইনের সমালোচনা করেন এবং এর মধ্যে বৈষম্যের বীজ খুঁজে পান তারা প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞ-ইনসাফ এবং বাস্তব জ্ঞানবর্জিত। তারা যদি হিন্দু ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার আইনে নারীর অবস্থান পর্যালোচনা করে দেখেন তাহলে ইসলামী আইনের যথার্থতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে দুটি পদ্ধতি চালু রয়েছে। এর একটি হচ্ছে দায়ভাগ পদ্ধতি, অপরটি মিতাক্ষরা পদ্ধতি। বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ও মনিপুর রাজ্যের অধিকাংশ হিন্দু সমাজের মধ্যে দায়ভাগ আইন প্রচলিত রয়েছে। পক্ষান্তরে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিজ্ঞানেশ্বর কর্তৃক স্মৃতিকার ঋষি যাজ্ঞবল্কের স্মৃতিশাস্ত্রের অনুকরণে মিতাক্ষরা পদ্ধতি রচিত হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসাম ছাড়া প্রায় সমগ্র ভারতে আইন প্রচলিত রয়েছে। দায়ভাগ আইনে পিন্ড দান হচ্ছে উত্তরাধিকার পাবার প্রধান শর্ত। হিন্দুদের শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী যে বা যারা মৃতের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করে তার আত্মিক কল্যাণ কামনা করবে তারাই কেবল উত্তরাধিকারী হবে। এই আইনে সপিন্ডের সংখ্যা ৫৩ জন। এই ৫৩ জনের মধ্যে মহিলা হচ্ছে মাত্র ৫জন এবং তাও তারা চতুর্থ কাতারে। তাদের আগে আছে ৪৮ জন পুরুষ। তাদের একজনও যদি জীবিত থাকেন তাহলে এই ৫জন নারীর (বিধবা স্ত্রী, কন্যা, মাতা, পিতার মাতা ও পিতার পিতার মাতা), কারোর পক্ষেই উত্তরাধিকার পাওয়া সম্ভবপর নয়।

অন্যদিকে মিতাক্ষরা আইনে হিন্দুদের গোত্রজ সপিন্ডির উত্তরাধিকারীদের সংখ্যা মোট ৫৭ জন।

এদের মধ্যে মৃত ব্যক্তি বিধবা ও কন্যার অবস্থান হচ্ছে ৫৪ জনের পরে পঞ্চম কাতারে। অর্থাৎ তাদের আগের ৫৪ জনের একজনও যদি জীবিত থাকে তাহলে কন্যা বা বিধবার সম্পত্তি পাওয়ার নূন্যতম সম্ভাবনাও থাকে না। তাদের বিয়ে- শাদীতে স্ত্রীকে মোহর দেয়ার কোনো বিধান নেই। যে পণপ্রথা বিদ্যমান আছে তা এতই শোষণমূলক যে বহু নারী এর জন্য আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। ভারতবর্ষে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী গণসম্পত্তিতে পরিণত হতো এবং এখনো হয়। এর প্রতিকার হিসেবে সে দেশে সতিদাহ প্রথার প্রচলন হয়েছিল।

ব্রিটিশ আমলে আইন করে সতিদাহ বন্ধ করা হলেও এখনো এই দেশটির কোনো কোনো রাজ্যের সতি নারীরা স্বামী চিতায় জীবন বিসর্জন দেন। মান-সম্মান রক্ষা করার জন্যই তারা এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি নিয়ে থাকেন। মুসলিম সমাজে এটা কখনো হয়নি এবং শরিয়ার অনুসরন অব্যাহত থাকলে হবার সম্ভাবনাও নেই। হেনা দাস অথবা কোনো মুরতাদ পরিবারের পন্ডিত ব্যক্তি' যখন মুসলিম সমাজের সমালোচনা করেন, কোরআন নির্ধারিত পারিবারিক আইনের মধ্যে বৈষম্য দেখতে পান তখন আমরা আঁৎকে উঠি। এ প্রেক্ষিতে নারী নীতির ক্ষতিকর দিকগুলোর বিরুদ্ধে আলেম সমাজের ভূমিকাকে আমরা স্বাগত জানাই।

সিসিলি-ইতালিতে মুসলিম সভ্যতা

মুহাম্মাদ সিদ্দিক

সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালিতে বিদেশী নরম্যান খ্রিষ্টানরা তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করলে একটা নতুন সভ্যতার আবির্ভাব হলো যাকে ফিলিপক হিট্টি আরব-নরম্যান কলা ও সংস্কৃতি (হিস্টোরি অব দি এরাবস, পৃষ্ঠা ৬০৭) বলেছেন।

নরম্যান রাজা সম্পর্কে হিট্টি বলেন, যদিও প্রথম রজার (১১০১ খ্রিস্টাব্দ) নিজে সংস্কৃতিহীন খ্রিস্টান ছিলেন, তিনি তার পদাতিক সেনাবাহিনীর বেশিরভাগ মুসলমানদের থেকে গ্রহণ করেন, আরব শিক্ষাকে উৎসাহ প্রদান করেন, প্রাচ্যের দার্শনিক, জ্যোতিষি ও চিকিৎসক দ্বারা পরিবৃত্ত থাকতেন এবং অখ্রিস্টানদের তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনে পুরোপুরি স্বাধীনতা দিতেন। (পৃসষ্ঠা ৬০৭)। হিট্টি অবশ্য বলেন যে কবি আবদুল জব্বার ইবন হাসদিস (১০৫৫-১১৩২) এর ব্যাপার আলাদা। তিনি যদিও সিসিলির সিরাকুসে জন্মগ্রহন করেন। সিসিলি নরম্যানদের দখলে গেলে মুসলিম স্পেনের আল মুতাবিদের দরবারে চলে যান। ইবন হামদিস পরবর্তীতে সেভিলে তার শুভাকাঙ্খীর সঙ্গে বন্দী হয়ে আফ্রিকায় নীত হয়েছিলেন। নরম্যান রাজা রজার মোটামুটি আগের মুসলিম শাসনই বহাল রাখেন। এমনকি উচ্চপদে অনেক মুসলমান কর্মকর্তাকেও বহাল রাখেন। হিট্টি বলেন, "পালারমোতে তার দরবার পাশ্চাত্যের চেয়ে প্রাচ্যই মতো হতো। এভাবে শতাব্দীর কিছু বেশি সময় মুসলমানরা ভালোই ছিল সিসিলিতে। তারপর তাদের দুর্দিন নামে খ্রিস্টান শাসকদের হাতে। নরম্যান শাসনের প্রথম শতাব্দীতে বানিজ্যের বেশিরভাগই মুসলমানদের হাতে ছিল। আর তা স্বাভাবিক। কারণ বানিজ্যিটা তো মূলতঃ আরব মুলুক তথা দক্ষিণ এশিয়াকে নিয়ে। সেগুলোতে মুসলমানদেরই প্রভাব।কৃষিতে মুসলমান ভূস্বামীগণ ছিলেন অগ্রগন্য। স্পেনের মতো তারা সিসিলিকেও শস্য- শ্যামল করলো। মুসলমানরা সিসিলিতে আখ, খেজুর তুলো, জলপাই, কমলালেবু, তুঁতফলসহ নানা ধরনের গাছ গাছড়া ও ফল সিসিলিতে প্রথমে নিয়ে যায়। মুসলমানরা সিসিলিতে কাগজ গাছ পেপিরাস উৎপাদন করতো, রেশমশিল্পও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধরনের উন্নত শস্য একমাত্র মিসরে উৎপন্ন হতো- বলেছেন, তদানীন্তন লেখক ইবন হাওকাল। এই গাছের আশ দিয়ে জাহাজের দড়ি বানানো হতো।

মুসলমানদের হাতে শাসনকার্যের ভার না থাকাতে তারা ব্যবসা বাণিজ্য, শিক্ষা, শিল্প সংস্কৃতিতে বেশি মন দেয় এ সময় সিসিলিতে। রাজা দ্বিতীয় রজারের (১১০১-৫৪) মুদ্রায় আরবি অক্ষর খোদিত থাকতো। প্রথম রজারের পর তার পুত্র দ্বিতীয় রজার (১১৩০-৫৪ খ্রিস্টাব্দ) রাজা হন। তিনি মুসলমানদের মত পোশাক পরতেন। তাই তার খ্রিস্টান, সমালোচকরা বলতো 'আধা বিধর্মী রাজা' দ্বিতীয় রজারের পোশাকে আরবি বৈশিষ্ট্য থাকতো। তার অভিষেক পোশাকে কুফি পদ্ধতির লেখা ছিল এর অর্ধবৃত্ত বর্ডারে। এই পোশাকটি এখানো ভিয়েনাতে রয়েছে- বলেছেন, হিট্টি। তার নাতি রাজা দ্বিতীয় উইলিয়াম (১১৩৬-৮৯ খ্রিস্টাব্দ) এর সময় তদানীন্তন ইতিহাসবিদ ইবন জুবায়ের দেখছেন যে, পালারমোর খৃস্টান মেয়েরা মুসলিম পোশাকে আচ্ছাদিত। এতে কতকটা ভারতের অমুসলমান মেয়েদের সেলোয়ার কামিজ প্রীতির মতো। রাজা দ্বিতীয় রজার তার রাজধানীর পালারমোতে একটি গির্জা নির্মান করেছিলেন যার ছাদে ছিল ফাতিমী স্থাপত্যের চিত্র- অলঙ্করন ও কুফিলিপি সৌন্দর্য। এই গির্জার নাম কাপেলা পালাটিনা। হিট্টি লেখেন, "নিঃসন্দেহে আরব শিল্পীদের এর ও অন্যান্য সিসিলীয় ইমারত নির্মানে লাগানো হয়েছিল" পৃষ্ঠা ৬০৯)।

তখনকার হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি কিছু শিল্পদ্রব্য, যেমন প্রসাধনী কৌটা, সৌখিন দন্ত ইত্যাদি। এখানো ভ্যাটিকানের মির্ডসিও খ্রিসটিয়ানো' যাদুঘর ও অন্যান্য যাদুঘরে রয়েছে। এখন সিসিলি- আরব শিল্পের অবদান। যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন থেকে ১৯৩৯ সালে পেরি বিকট সিকলো আরাবিক আইভরিস নামে এক গবেষণাগ্রন্থে এ সম্পর্কে আরো তথ্য রয়েছে।

রজারের নৌবহরের সেনাপতিকে 'আমির' বলা হতো। আর পরবর্তীতে যে এডমিরাল শব্দ এসেছে তা মূলে ছিল আমির আল বহর। রজারের এক নৌ সেনাপতি এন্টিয়সের জর্জ (জুর্জি) উত্তর আফ্রিকায় আল মাহদিয়ার এক মুসলমান অধিপতির অধীনে চাকরি করেছিলেন। রজারের সরকারের শ্রেষ্ঠ পদের নাম ছিল 'আমিরেটাস আমিরাটোরাস' যা 'আমির আল উমারা এর অপভ্রংশ। দ্বিতীয় রজারের নাতি দ্বিতীয় ফ্রেডারিক (১২১৫-৫০ খ্রিস্টাব্দ) যাকে অন্যান্য ফ্রেডারিকের সঙ্গে পৃথক করতে বলা হয় 'অব হোহেনস্টওফেন' ছিলেন প্রাচ্য মানুষের মতো তার ব্যক্তিগত চালচলন ও সরকারি কাজেও। ফ্রেডারিক সিসিলি ছাড়াও জার্মানি শাসন করতেন। তাছাড়া ১২২০ সাল থেকে তিনি হলিরোমান ইম্পায়ারের সম্রাটও হলেন। তিনি ১২২৫ সালে উত্তরাধিকারিনী ব্রিয়েনের ইসাবেলের সঙ্গে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সিরিয়ায় ক্রুসেডীয় খ্রিস্টান ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজাও হলেন। ফলে তিনি সমগ্র খ্রিস্টজগতের এক নম্বর বেসামরিক কর্তৃপক্ষ ছিলেন। দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের দরবারে সিরিয়া ও বাগদাদ থেকে দার্শনিকগণ আসতেন,যাদের ছিল লম্বা দাড়ি ও লম্বা জুব্বা। ইহুদি বিদ্যনরাও আসতেন প্রাচ্য-প্রতীচ্য থেকে। তিনি মুসলিম জগতের সঙ্গে রাজনৈতিক বানিজ্য সম্পর্ক রাখতেন। মিসরের আইয়ুবী সুলতানের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল।

মিসরের আইয়ুবী সুলতান আল-কামিল (১২১৮-৩৮ খ্রিস্টাব্দ) দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, অথচ ফ্রেডারিক ক্রুসেডযুদ্ধ করতে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর ভাইয়ের ছেলে কামিল ও আশরাফ দুই ভাই মিলিতভাবে মৃত ভাই আল- মালিক আলমুয়াজ্জমের ছেলে আলভ-মাসালিকউন নাসির দাউসকে দামাস্কাস থেকে হটিয়ে দিয়ে শুধু হাররান, রোহা (এডেসা) ও রাকা শহর দিয়েছিলেন।

ফ্রেডারিক সিরিয়ায় এলেন ১২২৯ সালে (৬২৯ হিজরি)। কামিলের সঙ্গে তার খুব যোগাযোগ। দু'জনের ভেতর সন্ধি হলো ১০ বছর ৬ মাস ও ১০ দিনের জন্য। এতে কামিল জেরুজালেমকে ছেড়ে দিলেন যদিও এই শহর সালাহউদ্দিন পূনর্দখল করেছিলেন। এছাড়াও বেথলেহেম, নাজারেথ এবং জাফফা থেকে এক্কা পর্যন্ত সব শহর ফ্রেডারিককে দিলেন। জেরুজালেমে আল- আকসা মসজিদ ও ডোম অব দি রক মুসলিম নিয়ন্ত্রণে থাকলো। ফ্রেডারিক দেশে ফিরলেন। কামিল ১২৩৮ সালে ইন্তেকাল করলেন। ১২৩৯-৪০ সালে (৬৩৭ হিজরি) ক্ষুদ্র হাররানের অধিপতি আবু নসর দাউদ জেরুজালেম পুনদখল করলেন এবং এর চারপাশের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেললেন। সুলতান আল- কামিল কয়েকটি উট ও একটি জিরাফ উপহার দিয়েছিলেন। জিরাফ শব্দটাই এসেছে আরবি জারাফাহ থেকে। এগুলোকে নিয়ে তিনি বেরুতেন ভ্রমণে। জিরাফ এই প্রথম ইউরোপে নেয়া হয়। ফ্রেডারিক মিসর থেকে বিশেষজ্ঞ নিয়ে আসেন এটা পরীক্ষা

করতে যে সূর্যতাপে কিভাবে উটপাখির ডিম কৃত্রিম ভাবে ফোটানো যায় ১২৩২ সালে আরেকজন আইয়ুবী সুলতান দামাস্কাসের আল আশরাফ থেকে তিনি উপহার পেয়েছিলেন একটি 'প্লানেটারিয়াম' (গ্রহ-তারকা প্রদর্শক যন্ত্র) যাতে চাঁদ-সুরুজের ঘূর্ণনের সময় সাদা করে। ফ্রেডারিক দামাস্কাসে একটি সাদা ভালুক ও ময়ূর পাঠান।

কারেন আমস্ট্রং বলেন, ফ্রেডারিকের রাজকীয় মিছিল ছিল প্রাচ্য দেশের খলিফা ও সুলতানদের মিছিলের মত হাতি এসেছিল মিসরের সুলতান আল-কামিলের উপহার হিসেবে। কারেন বলেন, সমগ্র ফ্রেডারিক দরবার ছিল চেহারায় প্রাচ্য দেশীয় (পৃষ্ঠা ৪২০) তার দরবারে নাকি বোরকা পরা মুসলিম মেয়েরাও ছিল। খ্রিস্টান লেখক আর্নেস্ট কানটোরা উইকজ সন্দেহ করেন, ফ্রেডারিক কি হারেম রাখতেন ? ("ফ্রেডারিক দি সেকেন্ড, ১১৯৪-১২৫০" ইংরেজি অনুবাদ ই ও লরিমার, লন্ডন, ১৯৩১ পৃষ্ঠা ৩১০-৩১১)। তবে ফ্রেডারিক বলতেন যে, এই মেয়েরা গৃহদাসী, সুচিশিল্পী ও নতর্কী- গায়িকা হিসেবে থাকতো, যেমনভাবে দরবারে দড়ি-নতর্ক, ভাড় ও সাহড়ে থাকতো। দরবারে হিজড়া ও আরব কৃতদাসও ছিল, যারা সুদৃশ্য পোশাক পরে উট চালনা করতো। কারেন বলেন, "অবশেষে তাদের এমন একজন শাসক আসেন যিনি মার্জিত সংস্কৃতির মুসলমান শাসক বায বাইজানটাইন সম্রাটদের সমপর্যায়ের। এতদিন পর্যন্ত তারা ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের ব্যঙ্গ করতো। সে সময় মুসলমানরা ভয়ংকরভাবে শক্তিশালী ছিল। ফ্রেডারিকের দরবার- দৃশ্য তার সমর্থকদের আশ্বস্থই করতো। (হলিওয়ার পৃষ্ঠা ৪২০-৪২১)।

[মিসরের আইয়ুবী সুলতান আল- কামিলের নিকটও আরো অন্যান্য মুসলিম শাসকদের নিকট ফ্রেডারিক কতকগুলো গাণিতিক, জ্যামিতিক, জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত ও দার্শনিক প্রশ্ন পাঠান তথ্য ও প্রহেলিকাস্বরূপ। জনৈক মিসরীয় বিদ্যান এগুলোর সমাধান করে জবাব পেশ করেছিলেন আল- মাওসিল (মোসল) শহরে এসবের জবাব মিলে। একই ধরনের প্রশ্নাবলী ইবন সাবিনের (১২১৭-৬৯ খ্রিস্টাব্দ) নিকটও পাঠান ফ্রেডারিক। ইবন সাবিন স্পেনের মুরসিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। সূফী ইবন আরাবীরও মুরসিয়াতে জন্ম। দু'জনেই সূফী মতবাদের বিদ্যান ছিলেন। ফ্রেডারিকের পাঠানো প্রশ্নের জবাবে ইবন সাবিন লিখেই ফেললেন "আল-সিকিল্লিয়া" সিসিলীয় প্রশ্নের জবাবসমূহ') প্রশ্নগুলো ছিল পদার্থের অনন্তকালীনতা, আত্মার প্রকৃতি ও অমরত্ব, ধর্মতত্ত্বের লক্ষ্য ও এই ধরনের বিষয়ে। এসব জবাব মুওয়াহিদ শাসক আব্দুল ওয়াহিদ আল-রশিদ (১২৩২-৪২ খ্রিস্টাব্দ) পাঠিয়েছেন। প্রশ্নের সঙ্গে সিসিলির রাজার পুরস্কারও এসেছিল। ইবনে সাবিন অর্থ গ্রহণে আপত্তি জানালেন। তবে তিনি সিসিলির রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে সত্য পথে আনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।]

ফ্রেডারিক সিরিয়া থেকে বাজপাখির বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আসেন। তারা বাজপাখিদের প্রশিক্ষণ দিলে তা তিনি দেখতেন। তিনি পাখিগুলোর চোখ বন্ধ করে দেখতেন যে সেগুলো গন্ধ শুকে খাবার খুঁজে পায় কিনা। ফ্রেডারিক তার দরবারের

> "এই যে পর্যবেক্ষণের আধুনিক আবেগ, গবেষণা ও নিরীক্ষা যা ফ্রেডারিকের দরবারের বৈশিষ্ট্যতা ছিল ইতালির রেনেসার (নবজন্মের) শুরু। (মুসলিম স্পেনের লাগোয়া দক্ষিণ ফ্রান্সের প্রভেন্স ও আরবি (মুসলিম স্পেনের মাধ্যমে) প্রভাবে ইতালির কবিতা ও সঙ্গীত প্রস্ফুটিত হলো।" (পৃষ্ঠা ৬১১-৬১২)। হিট্টির মতানুযায়ী সিসিলির নরম্যান রাজাদের আরবি তথা মুসলমান জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাই ইতালির রেনেসাঁর মূলে।"

অনুবাদক- জ্যোতির্বিদ এন্টিয়স থেকে আসা থিওডোর (যাদুরি) নামে খ্রিস্টানকে বলেন বাজপক্ষী শিক্ষাদান বিষয়ে একটি আরবি বইকে অনুবাদ করতে। হিট্টি বলেন, এর অনুবাদ এরা আরেকটি বই পারস্য থেকে আনা ফ্রেডারিকের বাজপক্ষীবিদ্যার উপরে কার্যের ভিত্তি হয়, আর তা আধুনিক প্রকৃতিবিদ্যার শুরু (পৃষ্ঠা ৬১০) থিওডের স্বাস্থ্য বিধি সম্পর্কিত 'সির আল আসরার" নামে এক আরবি বইয়েরও অনুবাদ করেন সম্রাটের জন্য। তবে ফ্রেডারিকের দরবারে মাইকেল স্কট নামে এক স্কটিশ বিদ্যান ১২২০ থেকে ১২৩৬ সালে সিসিলি ও ইতালিতে মুসলিম স্পেনের বিদ্যার প্রতিনিধিত্ব করতেন (পৃষ্ঠা ৬১৯)। মাইকেল স্কট স্কটল্যান্ড থেকে মুসলিম স্পেনে এসে লেখাপড়া করেন। আরবি ভাষায় বিদ্যান হন, পরে টলেডো শহরে আর্চবিশপ প্রথম রেমন্ড (১২২৬-৫২) এর অধীনে আরবি বইয়ের অনুবাদকের কাজ করেন। মাইকেল স্কট পরে সিসিলিতে ফ্রেডারিকের দরবারে যান। স্কট সম্রাটের জন্য আরবি থেকে এরিস্টটলের প্রাণীবিদ্যা- জীববিদ্যা বইগুলোর তরজমা করেন ল্যাটিনে। এ সংক্রান্ত ইবনে সিনার ভাষাও তিনি তরজমা করে 'এব্রিভিয়েসিও আভিসেনে ডি এনিম্যালিবাস' নামে সম্রাটকে উৎসর্গ করেন। স্কট টলেডো থাকাকালীন সময়ে অনুবাদ করেছিলেন আল- বিটরুজির জ্যোতির্বিদ্যার বই 'আল- হায়্যা ও ইবন রুশদের ভাষ্য সহ এরিস্টটলের ডি কোয়েলো এট মুন্ডো'।

হিট্টি মন্তব্য করেন "এই যে পর্যবেক্ষণের আধুনিক আবেগ, গবেষণা ও নিরীক্ষা যা ফ্রেডারিকের দরবারের বৈশিষ্ট্যতা ছিল ইতালির রেনেসার (নবজন্মের) শুরু। (মুসলিম স্পেনের লাগোয়া দক্ষিণ ফ্রান্সের প্রভেন্স ও আরবি (মুসলিম স্পেনের মাধ্যমে) প্রভাবে ইতালির কবিতা ও সঙ্গীত প্রস্ফুটিত হলো।" (পৃষ্ঠা ৬১১-৬১২)। হিট্টির মতানুযায়ী সিসিলির নরম্যান রাজাদের আরবি তথা মুসলমান জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাই ইতালির রেনেসাঁর মূলে। আর নরম্যানরা সিসিলির প্রশাসন নেওয়ার পূর্বে তো মুসলমানরা আড়াইশ' বছর সেখানে রাজত্ব করে মুসলিম জ্ঞান- বিজ্ঞান সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত করেছিল। নরম্যানরা তো তা আরো এগিয়ে নেয়। অনেক পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞ আবার ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে উসমানী তুর্কীদের হাতে কনসটান্টিনোপলের পতনকে রেনেসাঁর কারণ বলেন। তবে সে মন্তব্যের মূল্য এতটুকু যে, কনসটান্টিনোপল থেকে যেসব জ্ঞানীগুনী মানুষ সেখান থেকে সরে আরো পশ্চিমে গেলেন তারা তো সমৃদ্ধশালী মুসলিম জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়েই গিয়েছিলেন আর মুসলিম স্পেনই দক্ষিণ ফ্রান্সের প্রভেন্স এলাকাতে মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাব ফেলে। মুসলিম স্পেন-প্রভেন্সই হোক, আর সিসিলির দক্ষিণ ইতালি হোক বা কনসটান্টিনোপলই হোক- তিনদিক থেকে মুসলিম জ্ঞান বিজ্ঞান- সংস্কৃতি ইতালির মূল ভূ-খন্ডে পৌছে। হিট্টি বলেছেন, ল্যাটিন ছাড়া স্থানীয় ভাষাগুলোতে যে কবিতা চর্চা- তা আরবি কবি ও সঙ্গীতজ্ঞদের প্রভাবেই। (আমরা একইভাবে সংস্কৃত ছাড়া স্থানীয় ভাষাতে সাহিত্যচর্চা মুসলিম প্রভাবে বাংলাসহ উপমহাদেশে দেখি)। হিট্টি বলেন, যে আন্দালুসিয়ার মুসলমানদের লৌকিক

কবিতার ছন্দের মতোই হলো মূলত ইতালির জনপ্রিয় কবিতা যা দেখা যায় ইতালির উৎসব সঙ্গীতেও 'ব্যালাটা' (ব্যালাড)।

[হিট্টি বলেন যে রাজা ফ্রেডারিকের সর্বশ্রেষ্ঠ একক কীর্তি হলো নেপলস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ১২২৪ খ্রিস্টাব্দে যা একটা দিকনির্দেশনা দিয়ে করা হয়। ফ্রেডারিক বলেন, তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিশালসংখ্যক আরবি গ্রন্থ প্রদান করেন। ইবন রুশদের গ্রন্থসমূহ অনুবাদ করালেন তিনি। আর তা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে ঢোকানো হলো। ইবন রুশদের অনুবাদের কপি প্যারিস ও বোলগনা বিশ্ববিদ্যালয়েও পাঠানো হলো। চতুর্দশ ও পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে কিছু ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন অক্সফোর্ড ও প্যারিসে আরবি বিষয় পড়ানো হয়। তবে তা খ্রিস্টধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে।]

হিট্টি বলেন যে, সিসিলির পালারমো শহরে গ্রিক আরবি ও ল্যাটিন তিন ভাষাই ব্যবহৃত হতো, এমনকি সরকারিভাবেও পালারমোর অধিবাসীরা ছিল নানা ভাষী। রাজা দ্বিতীয় রজারের সময়ে ১১৬০ খ্রিস্টাব্দের পালারমোর এক বিদ্যানকে তার মূল নাম ইউজিনের সঙ্গে 'আমির' নামে ডাকা হতো (পৃষ্ঠা ৬১২)। দ্বিতীয় রজারের উত্তরাধিকারী রাজা প্রথম উইলিয়াম আরবি ভাষা জানতেন। তিনি টলেমির নামে চালু 'অপটিকা' গ্রন্থের ল্যাটিন অনুবাদ করান আরবি থেকে। এর গ্রিক পাণ্ডুলিপি গায়েব হয়ে গেছে। তিনি আরবি 'কালিলা' গল্পগ্রন্থ গ্রিক ভাষায় অনুবাদ করান। আর রাজীর চিকিৎসা গ্রন্থের ল্যাটিন অনুবাদ করেন সিসিলির ইহুদি চিকিৎসক ফারাজ বেন সলিম ১২৭৯ সালে, তবে আঞ্জু শহরের প্রথম চার্লসের বিদ্যোৎসাহে। এর বহু কপি কয়েক শতাব্দী ধরে বিতরন করা হয়। সিসিলিতে জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতের প্রচুর বই আরবি থেকে অনূদিত হয়।

হিট্টি বলেন, যেহেতু নরম্যান রাজাগণ ও তাদের উত্তরাধিকারীগণ সিসিলিসহ দক্ষিণ ইতালি শাসন করতেন, তাই তাদের মাধ্যমে মুসলিম সংস্কৃতি উপদ্বীপ ও মধ্য ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। দশম শতাব্দীর মধ্যে আরব জ্ঞান-বিজ্ঞান স্পষ্টভাবে আলাপস পর্বতের উত্তরে পাওয়া গেল। "(পৃষ্ঠা ৬১৩)।

ইতালির দান্তের 'ডিভাইনি কমেডি' কাব্যগ্রন্থে আসমান- স্বর্গ- নরক ভ্রমণ তো মিরাজের কাহিনীর বিকৃতরূপ। হিট্টি বলেন "এটা (দান্তের গ্রন্থের বিষয়াবলী) নিশ্চিতভাবে মূলে প্রাচ্য দেশীয়। " (পৃষ্ঠা ৬১৩)। হিট্টি বলেন, "এই যে প্রাচ্য থেকে অনুপ্রবেশ বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে তা কলা বিজ্ঞান ও সাহিত্যে স্পষ্ট।" (পৃষ্ঠা ৬১৩)।

সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালি মুসলমানরা রাজনৈতিকভাবে হারালেও খ্রিস্টান আমলের প্রথমদিকে মুসলমান শিল্পী ও কারিগরগণ সেখানে কর্মরত ছিল। এর প্রমাণও তখনকার মোজাইক ও লিপিশৈলীতে। পালারমোর প্যালেস্টাইন চ্যাপেলই তার বড় প্রমাণ। মুসলমান শাসকগণ পালারমোর প্রাসাদ এলাকায় বসিয়েছিলেন কাপড়ের প্রখ্যাত কারখানাসমূহ। এসব কারখানা থেকে রাজকীয় পোশাক তৈরি হয়ে আরবি লিপিশৈলীসহ ইউরোপীয় রাজন্যবার্গ ও অভিজাতদের প্রাসাদে যেতো। প্রথম ইতালয়ি বস্ত্র-পোশাক প্রস্তুত কর্মীরা তাদের এই প্রযুক্তি ও নানা ডিজাইন সিসিলিতে মুসলমানদের নিকট থেকেই শিখে। সিসিলি ডিজাইনের বস্ত্র ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। হিট্টি বলেন, যেমনভাবে

সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালি মুসলমানরা রাজনৈতিকভাবে হারালেও খ্রিস্টান আমলের প্রথমদিকে মুসলমান শিল্পী ও কারিগরগণ সেখানে কর্মরত ছিল। এর প্রমাণও তখনকার মোজাইক ও লিপিশৈলীতে। পালারমোর প্যালেস্টাইন চ্যাপেলই তার বড় প্রমাণ। মুসলমান শাসকগণ পালারমোর প্রাসাদ এলাকায় বসিয়েছিলেন কাপড়ের প্রখ্যাত কারখানাসমূহ। এসব কারখানা থেকে রাজকীয় পোশাক তৈরি হয়ে আরবি লিপিশৈলীসহ ইউরোপীয়...

পালারমো আর (স্পেনের) কাডিজে, তেমনি ভেনিস, ফেরেরা ও পিসা শহরে প্রাচ্যদেশীয় শিল্পীগণের কলোনি থেকে স্থানীয় 'ন্যাটিভদের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। তাদের মধ্যে ছিল সহযোগিতা। হিট্টি বলেন, "প্রাচ্যদেশীয় বস্ত্রের এতো চাহিদা ছিল যে ইউরোপে এমন এক সময় ছিল, যখন কোনো ইউরোপবাসী নিজেকে প্রকৃত সুসজ্জিত মনে করতো না, যদি না সে একপ্রস্থ এ ধরেনর পোশাকের অধিকারী হতো। "(পৃষ্ঠা ৬১৩)। পঞ্চদশ শতকে ইতালির সমৃদ্ধশালী ভেনিস শহর প্রচন্ডভাবে শিল্পকলায় মুসলিম ফ্যাশন গ্রহণ করে। এ সময় ইতালির কারখানাগুলোতে যে বই-পুস্তকসমূহ বাঁধাই হতো, তা প্রাচ্যদেশীয় বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ছিল। খ্রিস্টান বইগুলোতেও আরবি বাঁধাই পদ্ধতিতে বইয়ের সামনের খোলা ঢাকতে 'ফ্ল্যাপ' (বাড়তি লম্বা আবরণী) দেয়া হতো। তাছাড়া বিভিন্ন ইতালীয় শহরে পুস্তকে চামড়ার আবরনী দিয়ে নতুন পদ্ধতিতে বাঁধাই ও অলংকরণের ব্যাপারে প্রাচ্যদেশীয় শিল্পীদের কাছ থেকে ইতালীয় কারিগরগণ প্রশিক্ষণ নিতো। ভেনিস শহর আরবের আর একটা শিল্পে নাম করলো। এটা হলো সোনা-রুপা বা লাল তামা দিয়ে পিতলের দ্রব্যে মীনা করা। এই শিল্প দ্বাদশ শতকে মেসোপটেমিয়ার মোসল শহরে প্রচলিত হয়। আরবিতে এই শিল্পকে 'আজিমীনা' বলা হতো। শব্দটা এসেছে আরবি 'আজামী' অর্থাৎ অনারব বিদেশী, ফার্সি অর্থে। হিট্টি বলেন, সামগ্রিকভাবে মুসলিম সংস্কৃতির প্রসারের গুরুত্বে সিসিলি স্পেনের পরের স্থানটি দাবি করতে পারে, আর সিরিয়ার চেয়েও বড় যখন খ্রিস্টান ক্রুসেডররা সেখান থেকে শিখে আসে। (পৃষ্ঠা ৬১৪)।

উম্মিয়া শাসন আমলে একটা বিভাগ খোলা হয়েছিল যার কাজ ছিল অভিযোগ নিরীক্ষণ। নাম "দিওয়ান আল- নজর ফি আল-মাজালিম" এটা কতকটা আপিল আদালত বা সুপ্রিম কোর্টের মতো। এতে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দফতরসমূহে কোনো বিচারের ইনসাফ না হলে তা সংশোধন করা হতো। **[তদানীন্তন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আল মাওয়ারদী বলেছেন যে উম্মিয়া খলিফা আবদুল মালিকের সময়ে প্রথম একটা দিন নির্দিষ্ট থাকতো যেখানে তিনি সরাসরি জনগনের আপিল ও অভিযোগ শুনতেন। তিনি আরো লিখেছেন যে, উম্মিয়া খলিফা দ্বিতীয় ওমরের সময় এটা উৎসাহের সঙ্গে অনুসরণ করা হয়। আব্বাসী খিলাফতে খলিফা আল- মাহদি এটা চালু করেন। তার উত্তরাধিকারী খলিফাগণ যেমন আল-হাদী, হারুন ও আল-মামুন এবং পরবর্তীগণ প্রকাশ্য দরবারে অভিযোগ শুনতেন। আল-মুহতাদি (৮৬৯-৭০খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত এটা চালু ছিল। এম আমারী, ভনক্রেমার ও হিট্টি প্রমুখ ঐতিহাসিক বলেন, সিসিলি দ্বীপের নরম্যান রাজা দ্বিতীয় রজার (১১৩০-৫৪) এই প্রতিষ্ঠান সেখানে খোলেন। তারপর এটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। আসলে হযরত মুহম্মদ (সা.) ও খোলাফায়ে রাশিদিনরা জনগণের অভিযোগের কথা সরাসরি শুনতেন। তাঁরা তাঁদের কুটিরের দরজায় দারোয়ান রাখতেন না। তাঁদের আদর্শই পরবর্তীতে অন্যান্য মুসলিম শাসকও অনুসরন করেন।]**

রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন : প্রসঙ্গ বাংলাদেশ

বাংলাদেশের রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার আগে 'রাজনীতি' ও 'দুর্বৃত্তায়ন' পদবাচ্যদ্বয় সম্পর্কে ধারণা নির্মাণ আবশ্যক। আভিধানিক রাজনীতি হচ্ছে, Human activity concerned with making and implementing decisions vested with authority of the society for which the decisions are made," রাজনীতির প্রধানতম বিষয় ক্ষমতা এবং তাই ক্ষমতা লাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকেই অনেকে রাজনীতি বলে অভিহিত করে থাকেন। এ কারণে প্রভাব ও প্রভাবশালীদের অধ্যয়নকে রাজনীতি অধ্যয়ন বলে আধুনিককালে চিহ্নিত করা হয়। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথা স্মরনীয় যে, ক্ষমতা কিংবা প্রভাব রাজনীতির বিষয় হলেও একমাত্র বিষয় নয়। [**সর্বযুগে সর্বকালে রাজনীতি অধ্যয়ন ও প্রয়োগে নৈতিকতা, ধর্ম, মানবকল্যান ইত্যাদি বিষয় সগৌরবে গুরুত্ব লাভ করেছে। নৈতিকতা, বিবেক ও মানবকল্যাণের বিষয় যুক্ত না হলে রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন প্রবল হয়ে ওঠে। পাপ, দোষ দুর্নীতি, অধর্ম, অনাচার , ব্যভিচার, বদঅভ্যাস ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ বা আচ্ছন্ন রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতি বলা যায়। আমদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, রাজনৈতিক ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে না। ব্যবস্থার পরিচালকরাই হন ব্যবস্থাটির ক্রিয়াকর্মের সার্বিক নির্ধারক। এ কারণে উত্তম কিংবা অধম রাজনীতি বলতে প্রধানত, রাজনীতির নট কিংবা ক্রিয়াশীলদের কাজকর্মকে বোঝাতে হয়।]**

রাজনৈতিক সংগঠনে রাজনৈতিক নেতৃত্বই binding force এবং driving force বলা যায়। দলীয় লক্ষ্য বাস্তবায়নের নিমিত্তে দলকে তৈরি করা এবং এগিয়ে যাওয়া দলীয় নেতৃত্বের দায়িত্ব। নেতৃত্বের যোগ্যতা ও সাফল্যের উপরই তাই রাজনৈতিক সংগঠনের সাফল্য প্রধানত নির্ভরশীল । শিক্ষা, প্রজ্ঞা, দুরদৃষ্টি, সাহস, সততা, ব্যক্তিগত ত্যাগ, ধৈর্য, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকর করার ক্ষমতা প্রভৃতি একজন আধুনিক রাজনৈতিক নেতার প্রধান গুণাবলী বলে বিবেচিত হতে পারে। যে রাজনৈতিক সংগঠনে উপরিউক্ত গুনাবলীসম্পন্ন নেতৃত্ব রয়েছে, সে রাজনৈতিক সংগঠন একটি দেশের বিশেষত একটি উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতিতে তুলনামূলকভাবে অধিকতর যথার্থ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে বলে ধারণা করা যায়। প্রত্যেক মানুষের জীবনে যেমনি সমকালীন রাজনীতি দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। ঠিক তেমনি রাজনৈতিক নেতৃত্বের ধ্যান ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ইত্যাদি দ্বারা মানুষের সমাজ জীবন যেমন রাজনীতি, সরকার ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ইত্যাদিও হয় ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর সমাজের যেমনি প্রভাব থাকে, ঠিক তেমনি সমাজকেও পভাবিত করে থাকেন রাজনৈতিক নেতৃত্ব। রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষমতা ও প্রভাবের এ ব্যাপকতার কারণেই এরা নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত হবেন- নিয়ন্ত্রিত হবে এটিই ছিল বেশিরভাগ রাষ্ট্র

পাশ্চাত্যসহ পৃথিবীর সব দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সেসব দেশের মানুষের বিশ্বাস বিশেষতঃ ধর্ম বিশ্বাসের গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়। ব্যাপক মানুষের উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলনই বাংলাদেশ সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে বিধৃত হয়েছে। এতে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার ও গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ১৯, ২৭, ২৮ ও ২৯ ধারায় আইনের শাসন, সকল মানুষের সমতা ইত্যাদি তথা নীতি ও নৈকিতার ওপর গুরুত্বারোপিত হয়েছে। রাজনীতির একাডেমিক আলোচনাতেও ...

চিন্তকের/দার্শনিকের প্রত্যাশা। এরিস্টটল নীতিশাস্ত্রকে রাষ্ট্রশাস্ত থেকে আলাদা করে দেখলেও রাষ্ট্রকে মূলতঃ একটি নৈতিক প্রতিষ্ঠান বলে চিহ্নিত করেছেন। মধ্যযুগের ধর্ম প্রভাবিত রাজনীতি মূলতঃ ধর্মীয় নৈতিকতা দ্বারা রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস বলা যায়। ধর্ম ও নৈতিকতার পথ অনুসরণ করে রাষ্ট্র যদি তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারে তাহলে সেটি হবে সর্বোত্তম বলে আধুনিক রাষ্ট্র চিন্তার পুরোধা নিকেলো ম্যাকিয়াভেলিও মত প্রকাশ করেছেন। মার্কস ও মার্কসবাদীরা শ্রেণীভিত্তিক নৈতিকতার বিরোধিতা করলেও সার্বজনীন অভিন্ন নৈতিকতা বা সমতার নীতিরই মূলতঃ প্রচারক ছিলেন। পরবর্তীকালে মার্কসবাদ কার্যত একটি নীতি বা আদর্শে পর্যবসিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় সব মানুষই ধর্ম ও নৈতিকতা বিশ্বাসে আস্থাশীল। এ কারণে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এবং এখানকার জনগণের বিশ্বাস, অনুভূতি, দৃষ্টিভঙ্গিও ব্যাপকভাবে ধর্ম ও নৈতিকতা প্রভাবিত। অবশ্য এক্ষেত্রে বাংলাদেশ কোনো ব্যতিক্রম নয়। পাশ্চাত্যসহ পৃথিবীর সব দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সেসব দেশের মানুষের বিশ্বাস বিশেষতঃ ধর্ম বিশ্বাসের গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়। ব্যাপক মানুষের উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলনই বাংলাদেশ সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে বিধৃত হয়েছে। এতে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার ও গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ১৯, ২৭, ২৮ ও ২৯ ধারায় আইনের শাসন, সকল মানুষের সমতা ইত্যাদি তথা নীতি ও নৈকিতার ওপর গুরুত্বারোপিত হয়েছে। রাজনীতির একাডেমিক আলোচনাতেও তত্ত্বও প্রয়োগের পার্থক্য স্বীকৃত হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের রাজনীতিতেও এটি স্পষ্ট- হয়তো বেশি করেই সত্য। যে আদর্শ ও নৈকিতার কথা বাংলাদেশ সংবিধান ধারণ করেছে আমাদের নেতারা বক্তৃতায়/লেখনিতে যেসব আদর্শের কথা উল্লেখ করে থাকেন তার অনেকটাই কার্যতঃ তাদের কর্মে অনুপস্থিত দেখা যায়। বাংলাদেশের রাজনীতিকদের স্বার্থপরতা, অসাধুতা, অনায্য নীতি অনুসরণ প্রবণতা ইত্যাদি বহু দোষ-ত্রুটির জন্য নিম্নোক্ত কারণগুলোকে সাধারণত দায়ী করা হয়। যেমন-

১. রাজনৈতিক নেতৃত্বের সুশিক্ষা ও আদর্শবাদীতার অভাব;

২. উত্তরাধিকারভিত্তিক নেতৃত্বের কারণে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের সঠিক মূল্যায়নের অনুপস্থিতি; ৩. রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থপর মনোভাব- কেবল নিজের ও নিজের পারিবারিক উত্তরাধিকারীদের কল্যাণ কামনা;

৪. রাজনৈতিক নেতাদের পারস্পরিক দ্বন্দ-

সংঘাত (আন্তঃ ও আন্তঃ দলীয়);
৫. দুর্নীতিপরায়ণতা;
৬. রাজনৈতিক নেতৃত্বের সামন্ত মানসিকতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অভাব;
৭. দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চার অনুপস্থিতি,
৮. দলের নেতৃত্ব ও নির্বাচনে সৎ ত্যাগী ও শিক্ষিত লোকদের পরিবর্তে অবৈধ ধন-সম্পত্তির মালিকদের অধিষ্ঠান ইত্যাদি। রাজনৈতিক নেতৃত্বের নীতিহীনতা, স্বার্থপরতা, সুবিধাবাদিতা ইত্যাদি কারণে ন্যায়নিষ্ঠ, শিক্ষিত ও মার্জিত তথা ভদ্রলোকরা বাংলাদেশের রাজনীতির প্রতি ক্রমেই অনীহ হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশের গণতন্ত্র হয়ে পড়ছে ক্রমশঃ কালো টাকা ও পেশীশক্তি নির্ভর। এ অবস্থার আশু পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। **[মাহাত্মা গান্ধী নাকি স্বাধীন ভারতের জনগণের দুর্দশা দেখে বলেছিলেন, The heart of India's problems is the heartlessness of her educated people. বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করা যায় নিম্নোক্তভাবে- The heart of Bangladesh problems is the heartlessness of her political leadership. বাংলাদেশের রাজনীতিকে সুস্থ, আদর্শনির্ভর, সুস্থির করতে হলে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অর্থের উৎস, ব্যয়ের হিসাব ইত্যাদির স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করতে হবে। আমাদের স্মরন রাখা প্রয়োজন যে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে একটি দেশের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে বিধায় এরা সৎ স্বচ্ছ ও নীতিবান হলে রাষ্ট্র ও সরকারের অন্যান্য পদে আসীন ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরাও অসৎ হওয়া কঠিন হতে বাধ্য। মোদ্দা কথায়, বাংলাদেশের রাজনীতিকে সততা, ন্যায়নিষ্ঠা তথা নৈতিকতার মানদন্ডে উন্নীত করতে হলে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে নৈতিক করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।]** সৎ নিষ্ঠাবান ও যোগ্য ব্যক্তিবর্গ যাতে রাজনৈতিক নেতৃত্বে আসীন হতে পারেন সেটি নানাভাবে করতে হবে নিশ্চিত। রাজনৈতিক নেতার আশপাশেও সৎ ও যোগ্য লোকদের সমাহার ঘটাতে হবে। কারণ অযোগ্য, অসৎ ও তোষামোদকারীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থেকে বহু অনন্য ও গুনসম্পন্ন সৎ ও যোগ্য নেতাও কিভাবে বিচ্যুত এবং অধঃপতিত হয়েছেন তার বহু নজির ইতিহাসের পাতায় রয়েছে। সম্ভবতঃ এ কারণেই মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রবেত্তা নিজামুল মূলক বলেছিলেন তিনি ভালো শাসক যিনি জ্ঞানী ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে থাকেন। আর তিনিই অধম বুদ্ধিজীবী যিনি শাসকের সান্নিধ্য কামনা করেন।

বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরে কেউ কেউ এ রাষ্ট্রটি টিকে থাকার প্রশ্নে সংশয় প্রকাশ এবং একে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলে উপহাস করলেও অচিরেই বাংলাদেশ ঘুরে দাড়াবার সাহস প্রদর্শনে সক্ষম হয়। বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখে। প্রাথমিক অব্যবস্থা, অস্থিরতা, নেতৃত্বের অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরমানসিকতা, কল্পনা-বিলাসিতা ইত্যাদি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বাংলাদেশ সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণে হয় অগ্রসর হয়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান,স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ, বৈদেশিক কর্মসংস্থানসহ উন্নয়নের সকল শাখায় উৎকর্ষতা অর্জিত হতে থাকে। দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ার উদীয়মান ব্যাঘ্রসমূহের ন্যায় দ্রুতগতিতে নাহলেও চলতে থাকে। অগ্রগতির অভিযাত্রা। জোয়ার-ভাটার মতো আসা-যওয়া করলেও নানা পরীক্ষা- নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে অবশেষে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর

সৎ নিষ্ঠাবান ও যোগ্য ব্যক্তিবর্গ যাতে রাজনৈতিক নেতৃত্বে আসীন হতে পারেন সেটি নানাভাবে করতে হবে নিশ্চিত। রাজনৈতিক নেতার আশপাশেও সৎ ও যোগ্য লোকদের সমাহার ঘটাতে হবে। কারণ অযোগ্য, অসৎ ও তোষামোদকারীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থেকে বহু অনন্য ও গুনসম্পন্ন সৎ ও যোগ্য নেতাও কিভাবে বিচ্যুত এবং অধঃপতিত হয়েছেন তার বহু নজির ইতিহাসের পাতায় রয়েছে। সম্ভবতঃ এ কারণেই মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রবেত্তা নিজামুল মূলক বলেছিলেন তিনি ভালো শাসক যিনি জ্ঞানী ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে থাকেন। আর তিনিই অধম বুদ্ধিজীবী যিনি শাসকের সান্নিধ্য কামনা করেন।

বাংলাদেশের গণতন্ত্র হতে থাকে সুস্থির। ডাল-ভাতের রাজনীতির স্তর পার হয়ে বাংলাদেশ প্রবেশ করতে থাকে মাছ- ভাতের রাজনীতিতে। কাছাকাছি পৌছে যায় মধ্যম মানের আয়ের মর্যাদাবিশিষ্ট দেশে পরিণত হওয়ার। **এ প্রেক্ষাপটেই ঘটে অথবা ঘটানো হয় ২৮ অক্টোবর ২০০৬ এর ভয়াবহ বীভৎসতা ও জানুয়ারি ১১, ২০০৭ পূর্ব অরাজক অবস্থার।** এ নিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতি পর্যবেক্ষকদের রয়েছে দুই ধরনের অভিমত। এক. ১/১১- পূর্ব অরাজক অবস্থা বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের হটকারিতা, স্বার্থপরতা ও অগণতান্ত্রিক মানসিকতার ফসল। দুই. এটি হচ্ছে বাংলাদেশ বিরোধী জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রীদের এক যৌথ পরিকল্পনার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। উভয়পক্ষের বক্তব্যে কিছু কিছু যথার্থতা থাকলেও এটি সম্ভবতঃ নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, একটি দেশের সুষ্ঠু পরিচালনা ও ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় প্রধানত, প্রধানত, রাজনৈতিক নেতৃত্বের দেশপ্রেম, সততা, অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার ওপর। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ১/১১ এর ঘটনা এড়ানো কিংবা প্রতিহতকরণে আমাদের জাতীয় নেতৃত্ব সফল হয়নি। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে স্বার্থত্যাগ ও ছাড় দেয়ার যে বড় মানসিকতা দেখানোর প্রয়োজন হয় সেটি প্রদর্শনেও তারা হয়েছেন অসফল। অত্যাবশ্যকীয় দৈনন্দিন কাজ সম্পাদনের বাইরে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠানই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানতম কাজ। কিন্তু এবারের তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেমনি তাদের মেয়াদসীমা ছাড়িয়ে গেছে তেমনি বাড়িয়েছে তাদের কর্মপরিসর। যে প্রেক্ষাপটেই হোক আমরা আশা করি অন্যান্য সরকারের ন্যায় এ সরকার সূচিত ভালো উদ্যোগগুলো আগামী নির্বাচিত সরকার কর্তৃক ধারাবাহিকতা পাবে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও দুর্নীতি আদৌ কমেনি বরং ক্ষুদ্রাকারের দুর্নীতি বেড়েছে বলে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের বাংলাদেশ চ্যাপ্টার সংবাদ সম্মেলন করে বলেছে। আমাদের প্রত্যাশা- দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে জনমত সৃষ্টি হয়েছে সেটি লালনে আগামী সরকারও চেষ্টিত হবে। দুর্নীতি দমন কমিশন হয়ে উঠবে আরো শক্তিশালী ও কার্যকর। ব্যক্তিগত দ্বন্দ, অর্থনৈতিক লাভালাভ ও আদর্শনির্ভর সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ কঠোর হস্তে নির্মূলের যে অভিযান বিগত চারদলীয় জোট সরকার গ্রহণ করেছিল বর্তমান জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের পরও সেটি অব্যাহত থাকবে। এটি না হলে সভ্যতার দ্বন্দে' তত্ত্বে বিশ্বাসী এক মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বের প্রধান নেতা, এ শক্তির অন্যান্য দোসর এবং তাদের নতুন কৌশলগত মিত্র উপমহাদেশীয় আধিপত্যবাদী শক্তিটি বাংলাদেশের সকল ক্ষেত্রে আরো নাক গলানোর সুযোগ লাভ করবে। এক্ষেত্রে স্মরনীয় যে, প্রগতিশীলতার নামে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে

অত্যন্ত সক্রিয় ও প্রভাবশালী একটি গোষ্ঠীও উপর্যুক্ত বৈরি দেশসমূহকে রাষ্ট্রঘাতি হয়েও সহায়তা দিতে কুণ্ঠিত করে না। তাই বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী ও ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী মানুষকে সমসময় এদের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে সচেতন, ঐক্যবদ্ধ ও সোচ্চার হতে হবে।

একথা আজ আর অস্বীকার করার উপায় নেই যে, নানা দুর্বলতা সত্ত্বেও মন্দের ভালো ব্যবস্থা হলেও নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার আর কোনো ভালো বিকল্প অদ্যাবধি বের করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম ইসলামের সঙ্গে গণতন্ত্র অন্য যে কোনো সরকার ব্যবস্থার তুলনায় কাছাকাছি। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থাতেই চূড়ান্ত বিচারে দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা উন্নয়ন, স্বাবলম্বন, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় মূল্যবোধ সংরক্ষণ সম্ভব হয়। বৈশ্বিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপটেও বাংলাদেশের জন্য গণতন্ত্রই সবচেয়ে বেশি জুতসই ব্যবস্থা হতে পারে। ১/১১ এর পূর্বে বাংলাদেশের গণতন্ত্র যে সংকটে পতিত হয়েছিল সেটি থেকে উত্তরণ এবং ভবিষ্যতে যাতে এ জাতীয় সংকট না দেখা দেয় সে জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গৃহীত হতে পারে।

১. দেশের জনগণকে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে যাওয়ার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ; ২. ধনী-দরিদ্র ও পশ্চাদপদ এবং সুবিধাভোগীর মধ্যকার ব্যবধান কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; ৩ কার্যকর অর্থে সরকার ব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রন ও ভারসাম্য নীতি প্রবর্তন; ৪. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও উন্নয়ন অভিযাত্রা ব্যাহত করে এমন সকল কর্মসূচি (হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ, লাগাতার সংসদ বর্জন ইত্যাদি) নিষিদ্ধকরণ; ৫. সরকারের সকল পদে বিশেষতঃ উচ্চ পদসমূহে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণ বন্ধের লক্ষ্যে মেধা ও যোগ্যতাকে একমাত্র নির্ধারক হিসেবে গ্রহণ; ৬ সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমনে কঠোরতম অবস্থান গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত আইন প্রণয়ন এবং সেগুলো কার্যকরকরণ; ৭. বিচার বিভাগকে দক্ষ ও শক্তিশালীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ ৮. বিকেন্দ্রীকরণ ও অংশ গ্রহণের কার্যকর কাঠামো তৈরি; ৯. ক্যাম্পাস রাজনীতি বন্ধকরণ; ১০ দেশের জনগনকে সৎ ও দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার জন্য যুগোপযোগী বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও মূল্যবোধবর্ধক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন; ১১. নিবন্ধনের শর্ত পালনরে জন্য হলেও রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চায় উৎসাহিত করণ : ১২ গ্যাস কয়লাসহ জাতীয় সম্পদের সুরক্ষা এবং দেশের জনগনের কল্যানে ব্যয় নিশ্চিতকরণ ; ১৩. জাতির দীর্ঘমেয়াদি স্পর্শকাতর বিষয়সমূহে জাতীয় ঐক্যমত ব্যতীত সিদ্ধান্ত গ্রহন না করা ইত্যাদি।

বর্তমানের বিশেষ ধরনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক দলসমূহের যে সংলাপ চলছে সেটি ফলপ্রসূ করার জন্য ইতোমধ্যে আওয়ামীলীগ প্রধান শেখ হাসিনাকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল প্রধান বেগম খালেদা জিয়াসহ অন্যান্য জাতীয় নেতার ক্ষেত্রেও এ নীতি অবিলম্বে কার্যকর হওয়া উচিত। আমরা অবশ্যই সুশাসন ও আইনের শাসন নীতিতে বিশ্বাসী এ কারণে আইনের চোখে সবাই সমান এবং আইনের নৈর্ব্যক্তিক ব্যাখ্যা অবশ্যই অনুসৃত হতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্মরন রাখা প্রয়োজন যে, কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হওয়া মানেই তিনি অপরাধী নন। স্বচ্ছ, প্রভাবমুক্ত ও নির্মোহ এবং বিচারের মাধ্যমেই নির্ধারিত হবে কে অপরাধী আর কে অপরাধী নয়। আর দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির কথা বললে অবশ্যই বলতে হবে যে, বাংলাদেশের রাজনীতিকরা কেবল এ দোষে দুষ্ট নয়। আমলাতন্ত্রসহ সরকারের অন্যান্য শাখাতেও কেবল রাজনীতিকদেরকে একপক্ষীয়ভাবে দায়ী করলে সমাজ জীবন ও সরকারযন্ত্রে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়ে জনবিচ্ছিন্ন শক্তি আরো বেপরোয়া হয়ে উঠার সুযোগ পাবে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাদের সাংবিধানিক বক্তব্যের বাইরে যে সকল কাজে হাত দিয়েছিল তার অধিকাংশে সফলতা আসেনি। দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক উর্দ্ধগতি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংকট ইত্যাদি কারণে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। দেড় বছরের মাথায় টিআইবি বলছে, এ সরকারের আমলে দুর্নীতি আরো বেড়েছে।ব্যবসা-বানিজ্য ও বিনিয়োগে এসেছে স্থবিরতা। সর্বত্র এক ধরনের অস্বস্তি ও অন্তবর্তীকালীনতা চলছে। এ অবস্থার অবসান প্রয়োজন। প্রয়োজনে শিগগিরই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান। একটি স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান যেমনি বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরাপদ নিষ্ক্রমণ পথ হতে পারে, ঠিক তেমনি হতে পারে রাজনৈতিক দলসমূহের ক্ষমতার বৈধ সোপান।

বাংলাদেশ ভৌগোলিক আয়তনের ছোট দেশ হলেও জাতি হিসেবে আমরা অনেক বড়। এদেশের চৌদ্দ কোটি মানুষ জনসম্পদে পরিণত হলে এটি হয়ে উঠবে অমিত সম্ভাবনার দেশ। প্রাকৃতিক সম্পদ ও অস্ত্রবলে বিশেষ বলীয়ান না হলেও উন্নত প্রযুক্তি, ব্যবস্থাপনা এবং মানবসম্পদের গুণে জাপান আজ সমগ্র বিশ্বে বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত দেশ। মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশ মালয়েশিয়া ষাটের দশকেও আমাদের চেয়ে কোনো ক্ষেত্রেই উন্নত ছিল না। সৎ, যোগ্য ও নৈতিকতার বলে বলীয়ান নেতৃত্ব এবং সে দেশের জনগণের পরিশ্রমের ফলেই মালয়েশিয়ার পক্ষে এ অবস্থায় উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশ ভৌগোলিক আয়তনের ছোট দেশ হলেও জাতি হিসেবে আমরা অনেক বড়। এদেশের চৌদ্দ কোটি মানুষ জনসম্পদে পরিণত হলে এটি হয়ে উঠবে অমিত সম্ভাবনার দেশ। প্রাকৃতিক সম্পদ ও অস্ত্রবলে বিশেষ বলীয়ান না হলেও উন্নত প্রযুক্তি, ব্যবস্থাপনা এবং মানবসম্পদের গুণে জাপান আজ সমগ্র বিশ্বে বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত দেশ। মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশ মালয়েশিয়া ষাটের দশকেও আমাদের চেয়ে কোনো ক্ষেত্রেই উন্নত ছিল না। সৎ, যোগ্য ও নৈতিকতার বলে বলীয়ান নেতৃত্ব এবং সে দেশের জনগণের পরিশ্রমের ফলেই মালয়েশিয়ার পক্ষে এ অবস্থায় উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছে। জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদি অবস্থার ক্ষেত্রে সাযুজ্য ও সমতা উপমহাদেশের যে কোনো দেশের তুলনায় বেশি। এ কারণে সৎ, যোগ্য ও নৈতিকাসম্পন্ন নেতার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ জাতি আগামীতে জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে আনতে পারে কাঙ্খিত পরিবর্তন ও উন্নয়ন। আধুনিক শিক্ষা, সুসংগঠিত সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মনস্কতা, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা এবং কঠোর পরিশ্রমই এক্ষেত্রে হবে আমাদের প্রধান পাথেয়। সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বেও সৎ ও যোগ্য অনুসারীদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই কেবল এসব অর্জন সম্ভব হতে পারে। আসুন দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতি পরিহার করে সততা ও মূল্যবোধভিত্তিক স্বাবলম্বী গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আমরা ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হই।

লেখক: রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ইতিহাসের দুঃসময়ে ভারতীয় মুসলমানদের নতুন পথের দিশারী শাহ ওয়ালীউল্লাহ (১৭০৩-৬৩)

ড. নুরুল ইসলাম মনজুর

প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ,জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

অবিভক্ত ভারতের সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, স্থাপত্যকলা, শিল্পকলা, শিক্ষা, অর্থনীতি, ভাষা প্রভৃতি জীবন ও জ্ঞান প্রবাহের সকল শাখায় মুসলমানদের অবদান অপরিসীম। ইতিহাসের যুগ পরম্পরায় বিভিন্ন জাতি ভারতে আগমন করলেও তাদের নিজস্ব জীবন ও দর্শন দুর্বল হওয়ার পটভূমিতে তারা ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে মিশে গেছে। মুসলমানরাই একমাত্র জাতি যারা ভারতে আগমন করেছিল। নিজস্ব জীবনধারা, দর্শন, ধর্ম জীবন ও জগতের প্রতি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি নিয়ে, ফলে স্বাভাবিকভাবে মুসলমান সমাজ নিজেদের জীবন, দর্শন, ধর্ম আর মূল্যবোধকে পরিহার করে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে বিলীন হয়ে যায়নি। তাদের সামগ্রিক মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী, জীবনবোধ, ধর্ম, দর্শন এবং বানিজ্যিক গুনাবলী দিয়ে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। আবার একই সঙ্গে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির যা কিছু সত্য সুন্দর তা গ্রহণ করেছে অবারিত ভাবে এই ভাবে মুসলমান সংস্কৃতি ও ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে আদান- প্রদান ও সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় সমাজ নতুন গতি লাভ করেছে। ভারতীয় ইতিহাসের সুলতানী যুগেই এখনকার সমাজ সংস্কৃতি, জীবনধারা, শিক্ষা, স্থাপত্য বাংলা শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুসলমান অবদানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। ক্রমে ভারতবর্ষ মুসলিম সভ্যতার প্রভাব বলয়ে এসে যায়। পরবর্তী মুঘল শাসনামলে ভারতবর্ষে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই অগ্রগতির ধারা অব্যাহত থাকে। মুঘল জামানায় সমগ্র ভারতবর্ষ এক পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়। কিন্তু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মুঘল আমলে ভারতে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করে। ১৭০৭ সালে শক্তিশালী মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ভারতে মুসলিম শাসন পতনের দিকে ধাবিত হয়। ভারতীয় মুসলমানদের ধর্ম সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, মনন এবং জীবনধারা পতিত হয় চরম সংকটে। ভারতীয় মুসলমানদের এই চরম দুর্দিনে তাদের পথ চলার নতুন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ ১৭০৩ সালে দিল্লীতে মতান্তরে উত্তর প্রদেশের মুজাফফরগড়ে জন্ম করেন। ছোট বেলায় তার নাম ছিল কুতুবুদ্দীন। ক্রমে বয়স বৃদ্ধি হলে ধর্ম ও জ্ঞান সাধনার প্রতি গভীর আগ্রহ লক্ষ করে তার পিতা নতুন নাম দেন ওয়ালীউল্লাহ (আল্লাহর বন্ধু। তার পিতার নাম শাহ আবদুর রহীম। শাহ ওয়ালী উল্লাহর লেখা আনফাস আল আরফীন' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে ওয়ালীউল্লাহর পরিবার হচ্ছে খলিফা ওমরের (রা) ...

বর্তমান প্রবন্ধে শাহ ওয়ালীউল্লাহর জীবন ও কর্মের উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হবে।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ ১৭০৩ সালে দিল্লীতে মতান্তরে উত্তর প্রদেশের মুজাফফরগড়ে জন্ম করেন। ছোট বেলায় তার নাম ছিল কুতুবুদ্দীন। ক্রমে বয়স বৃদ্ধি হলে ধর্ম ও জ্ঞান সাধনার প্রতি গভীর আগ্রহ লক্ষ্য করে তার পিতা নতুন নাম দেন ওয়ালীউল্লাহ (আল্লাহর বন্ধু)। তার পিতার নাম শাহ আবদুর রহীম। শাহ ওয়ালী উল্লাহর লেখা আনফাস আল আরফীন' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে ওয়ালীউল্লাহর পরিবার হচ্ছে খলিফা ওমরের (রা) বংশধর। ভারতে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগেই এই পরিবার আরব থেকে ভারতে আগমন করেছিল। এই পরিবারের অধিকাংশ সদস্য ছিল পেশায় সৈনিক। যুগের পর যুগ তারা ভারতীয় মুসলিম সেনাবাহিনীতে কাজ করেছে। শাহ ওয়ালীউল্লাহর পিতাসহ শাহ ওয়াজউদ্দীন ছিলেন সম্রাট আতরঙ্গজেবের সেনা বাহিনীর একজন অফিসার। আওরঙ্গজেবের সময়কালে তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। শাহ আবদুর রহীম পিতার সৈনিক জীবনকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন নি। তিনি ছিলেন ধর্ম প্রাণ, সূফী এবং ইসলাম নিয়ে পড়ালেখায় প্রবলভাবে আগ্রহী। সম্রাট আঙ্গরজেবের কালজয়ী গ্রন্থ ফতোয়া ই- আলমগিরীর অন্যতম সংরক্ষক ছিলেন শাহ আবদুর রহিম। দিল্লীর বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'মাদ্রাসা ই- রহিমীয়া'র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শাহ ওয়ালীউল্লাহর পিতা। ১৮৫৭ [সালের পূর্বে এটিই ছিল ভারতীয় মুসলমানদের অন্যতম প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শাহ আবদুর রহিম এই বিদ্যায়তনে অধ্যাপনা করতেন। তাঁর শিক্ষা ও গবেষনার বিষয় ছিল কোরান, হাদিস, ইসলামী জীবনধারা, মূল্যবোধ এবং ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। ইসলামী শাস্ত্রে অগাধ পান্ডিত্যের

অধিকারী অধ্যাপক পিতার চিন্তাধারা শাহ ওয়ালিউল্লাহকে প্রভাবিত করেছিল।

ছোটবেলায় পিতার কাছেই শাহ ওয়ালীউল্লাহর লেখাপড়ার হাতেখড়ি। ক্রমে পিতার তত্ত্বাবধানে তিনি কোরান ও হাদিস শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেন। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি কোরান, হাদিসের পাশাপশি ফিকাহ, ইসলামী দর্শন এবং ইসলামী বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন। অসাধারণ মেধাবী শাহ ওয়ালীউল্লাহ মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে রহিমীয়া মাদ্রাসায় শেষ করেন প্রাতিষ্ঠানীক শিক্ষা। শিক্ষা সমাপ্তির পরপরই তিনি রহিমীয়া মাদ্রাসায় কনিষ্ঠতম শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। এই সময় তিনি পিতার নির্দেশে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। পনেরো বছর বয়সে শাহ ওয়ালীউল্লাহ পিতার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেন। রহিমীয়া মাদ্রাসায় একটানা বারো বছর শিক্ষকতা করার পর তিনি হজ্জব্রত পালনের জন্য হেজাজ রওয়ানা হন। পবিত্র আরব ভূমিতে চৌদ্দ মাস অবস্থান কালে তিনি দুইবার হজ পালন করেন। মক্কা ও মদিনায় অবস্থানকালে তিনি মুসলিম বিশ্বের অনেক আলেম, ওলামা, মাশায়েখের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। আরবে অবস্থানকালে শাহ ওয়ালীউল্লাহ ছিলেন মদিনার কোরআন ও হাদিস এবং ফেকাহ শাস্ত্রে অসাধারণ পন্ডিত শেখ আবু তাহির বিন ইব্রাহীমের শিষ্য। তার সংস্পর্শে ক্রমে ওয়ালিউল্লাহ তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের অবস্থা, তুর্কী খিলাফতের বহুমুখী সংকট এবং একই ভাবে ভারতীয় মুসলমানদের প্রকৃত অবস্থা দূর থেকে অনুধাবন করতে সক্ষব হন। আবু তাহির বিন ইব্রাহীমের কাছথেকে তিনি ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভের সুযোগ লাভ করেন। ১১৪৫ হিজরী সনে একত্রিশ বছর বয়সে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে ভারতীয় মুসলমানদের দুরবস্থা, দূরবস্থার কারণ, মুসলমানদের দূরবস্থা ও অবনতি নিরসনের প্রয়াস প্রভৃতি বিষয় অনুসন্ধানের প্রয়াস চালান।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুঘল দরবারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে পান যে মুঘল প্রশাসনের কেন্দ্রীয় কাঠামোর অভ্যন্তরে এক চরম অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে। মহান মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর (১৭০৭) থেকেই মুঘল সাম্রাজ্য পতনের দিকে ধাবমান। এই সময়ের পর থেকে পরপর ছয়জন মুঘল সম্রাটের মধ্যে প্রথম দুইজন অর্থাৎ আওরঙ্গজেবের পরবর্তী দুইজন ছিলেন একজন মুঘল জেনারেল জুলফিকার আলী খানের হাতের পুতুলমাত্র। প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতো এই জেনারেল। পরবর্তী চারজন সম্রাট ছিলেন দরবারের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাসী গ্রুপের থাতে ক্রীড়া নক। এই চারজনকে নিয়ন্ত্রন করতো একটি সৈয়দ পরিবারের সদস্যরা। কেন্দ্রীয় শাসন কাঠামোতে এই চরম বিশৃঙ্খলার সুযোগে দরবারের মন্ত্রী, আমীর, আমাত্য, অভিজাত প্রমুখরা দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়েন এবং নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে উদ্ধারে মনোনিবেশ করেন। আমীর অমাত্যদের সাথে বৃদ্ধি পায়, স্বার্থগত কোন্দল, ক্ষমতার লড়াই এবং দুর্বল সম্রাটকে চাটুকারীতার মাধ্যমে বশীভূত রাখা। মুঘল কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে আসার পটভূমিতে সর্বভারতীয় পর্যায়ে আঞ্চলিক শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। ১৭২০ সালে দক্ষিণ ভারতে নিজাম উল মুলক দিল্লীর অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে বিস্তৃত অঞ্চলের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় একই সময়ে অযোধ্যার সুবাদার ঘোষণা করেন। স্বাধীনতা তিনি ছিলেন মূলতঃ একজন ইরানী ব্যবসায়ী। বাংলায় মুর্শিদকুলী খান দিল্লীর অধীনতা থেকে অনেকটা মুক্ত হয়ে যান। রোহিলাখন্ডের নবাব ঘোষণা করেন স্বাধীনতা। এক কথায় বলা যেতে পারে যে সমগ্র ভারতে আঞ্চলিক শাসকগন দিল্লীর প্রতি তাদের বশ্যতা অস্বীকার করতে থাকে। একই অর্থে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে ভারতীয় আঞ্চলিক শক্তি। বিশেষতঃ দক্ষিণের মারাঠা শক্তি এবং পাঞ্জাবের শিখ শক্তি। মুসলমানদের এই অনৈক্যের সুযোগে মুসলমান সমাজকে ভারত থেকে বিতাড়িত করতে উদ্যত হয়। এই দুই শক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে শুরু করে সন্ত্রাসী ও গুপ্ত হামলা।

ভারতে মুসলিম শাসনের এই দুঃসময়ে অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত হতে থাকে। রাস্তাঘাটে এবং নৌপথে যাতায়াতের ক্ষেত্রে চরম নিরাপত্তাহীনতার কারনে মুঘল সাম্রাজ্যের বানিজ্য ও শিল্প উৎপাদন চরম ভাবে ব্যহত হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবে মুঘল সম্রাটের পক্ষে কর আদায় করা অসম্ভব হয়ে দাড়ায়। একই সাথে মুসলিম অভিজাত সমাজে গোষ্ঠীগত কোন্দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। ভারতে মুসলিম শাসনের শুরু থেকেই মুসলমান সমাজ ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। উপরন্তু এদের একটা বড় অংশ ছিল শহরবাসী। আঠারো শতকে ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেলেও গোষ্ঠীগত কোন্দলের কারনে তাদেরকে শক্তিহীন করে দেয়। মুসলমানদের সাথে অভ্যন্তরীন কোন্দলের কারনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব ক্ষীন হয়ে আসে। এভাবে ভারতীয় মুসলমান সমাজ একটি দরিদ্র, অসহায় শ্রেণীতে পরিনত হতে থাকে। ভারতে মুসলিম শাসনের সুদীর্ঘ ইতিহাস তাদের কাছে পরিচয় হয় কেবল অতীতের স্মৃতিতে।

নিজের দেখা সামজিক ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা, পবিত্র মক্কা মদিনায় অবস্থান করে ভারতবর্ষের মুসলমানদের অবস্থা পর্যবেক্ষন করে শাহ ওয়ালীউল্লাহ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে তাদের মুল সমস্যা হলো ইসলাম ধর্ম, দর্শন, মূল্যবোধ এবং ইসলামী জীবন বোধ অনুশীলনের অভাব। তিনি আরও সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ভারতীয় মুসলমানদের আর্থ সামাজিক সংকট থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র পথ হলো ইসলামী আদর্শ, মূল্যবোধ এবং ইসলাম নির্দেশিত জীবন ধারায় ফিরে যাওয়া। এই বাস্তব অবস্থায় দাড়িয়ে তিনি লেখনী, পরিচালনা করেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এই কাজে ব্রতী ছিলেন। তিনি প্রথমেই মুসলমানদের গোষ্ঠীগত কোন্দল ভুলে ইসলামের আদর্শে বলীয়ান হয়ে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস চালান। শাহ ওয়ালীউল্লাহের লেখনীর পটভূমিতে সমগ্র ভারতের ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম সমাজে তার নাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। দিল্লী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের চিন্তায় অগ্রণী মুসলমানদেরকে গভীরভাবে আন্দোলিত করে। তাঁর গৃহীত পদক্ষেপে মুগ্ধ হয়ে মুঘল সম্রাট মুহাম্মদ শাহ তাঁকে মাদ্রাসা ই- রহিমীয়ার কর্ম তৎপরতা বাড়ানোর জন্য দিল্লী শহরে মাদ্রাসার জন্য একটি ভবন দান করেন। ক্রমে তার নাম সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়লে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আলেম সমাজ তাঁর সাথে যোগাযোগ করতে থাকে। এইভাবে শাহ ওয়ালীউল্লাহর ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি ঐক্যের ডাক, ইসলামের আদর্শ ও জীবন

ধারায় ফিরে যাওয়ার আহ্বান ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার বকরে। বস্তুতঃ ভারতীয় মুসলমান সমাজ সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর প্রায় চার দশক পরে নতুনের আহ্বান শুনতে পায়।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দিল্লীর বাস্তব অবস্থান পর্যবেক্ষন ও বিশ্লেষন করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মুঘল সাম্রাজ্যের এই দুরবস্থার জন্য প্রধানতঃ দায়ী হলো মুঘল সম্রাটদের জীবনাচরন ও অযোগ্যতা। তিনি সম্রাট এবং দরবারের আমীর অমাত্যদের উশৃঙ্খল জীবনাচরনের বিরুদ্ধে তীব্র লেখনী ধারন করেন। তিনি তাদের অদক্ষতা, ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বার্থপরতা, দরবারের বিভিন্ন দলের অভ্যন্তরীন কোন্দলে জড়িয়ে পড়া প্রভৃতির তীব্র সমালোচনা করে মুঘল সম্রাটদেরকে খোলা চিঠি লিখতে থাকেন। তিনি শাসকদেরকে বিলাসী জীবন, ভোগবাদী কর্মকান্ড বন্ধের আহ্বান জানান। তিনি মুঘল সেনা বাহিনীর জীবন ধারা ও কর্মকান্ডের তীব্র সমালোচনা করেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ বলেন যে, মুসলিম জীবন যাপন হবে খুবই সাধারণ মানের। তাদের মধ্যে থাকবে সকল প্রকার দুর্নীতি, অপকর্ম, অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদের মনোভাব। মুসলিম সৈনিকদের জীবন পরিচালিত হবে ইসলামের নির্দেশিত বিধি বিধান ও শরীয়ত মোতাবেক। তিনি বাদশাহ, আমীর ওমরা, সরকারী কর্মকর্তা এবং সৈনিকদের নিজস্ব আয়ের ভিত্তিতে জীবন ও সংসার পরিচালনার উদাত্ত আহবান জানান। বলা প্রয়োজন যে, দরবারের অভ্যন্তরে বিলাসী জীবন যাপনের ফলে অর্থের অপব্যয় এই সময় একটি নৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। অর্থের এই অপব্যয় সম্পর্কে শাহ ওয়ালীউল্লাহর আহ্বান ক্ষয়িষ্ণু মুঘল দরবারের চিন্তাশীল সকলকে সচেতন করে তোলে।

ভারতে মুসলিম শাসনের শুরু থেকে দেশের বিশিষ্ট আলেম, ওলামা , জ্ঞানী কবি, ঐতিহাসিক লেখকরা সরকার বা দরবার থেকে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতেন। মুলতঃ এটা ছিল মুসলিম সভ্যতার ঐতিহ্যের অংশ। এশিয়া, আফ্রিকার বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে এবং ইউরোপের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় আলেম, ওলামা, জ্ঞানী, কবি লেখক, দার্শনিক, রাষ্ট্র বিজ্ঞানী ইতিহাসবিদ প্রমুখদের জীবন যাপন, জ্ঞানচর্চা এমনকি বিভিন্ন দেশ ভ্রমনের জন্য সরকারের তরফ থেকে তাদেরকে নিয়মিত ভাবে অর্থ প্রদান করা হতো। মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতায় জ্ঞানবিজ্ঞানে চরম উন্নতি সাধনের এটা ছিল অন্যতম প্রধান কারন। মুসলিম শাসিত ভারতের এই ঐতিহ্যবাহী ধারা চালু ছিল। সুলতানী ও মুঘল দরবারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় মুসলিম কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, আলেম, ওলামারা কার্যকরী অবদান রাখতে সক্ষম হয়। মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিকশিত হয় ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা। আরবী, ফারসী এবং উর্দু সাহিত্যে যোগ হয় যুগান্তকারী অবদান। এইক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিকদের কালজয়ী অবদান। ১৭০৭ সালে সম্রাট আওরঙ্গজের পরবর্তী সময়ে মুঘল রাজদরবারে চরম সংকটের দিনে সৃষ্টিশীল লেখনীধারা দুর্বল হয়ে আসে। এই সময়ে অনেক কবি, সাহিত্যিক, আলেম, ওলামা কোন প্রকার গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড ও অবদান ছাড়াই দরবার থেকে অর্থ গ্রহণ করতে থাকে। এইভাবে অপচয় হতে থাকে সরকারী অর্থের। শাহ ওয়ালীউল্লাহ এই সরকারী অর্থের অপচয় বন্ধের আহ্বান জানান। একই অর্থে তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান বিনা প্রয়োজনে সরকারী চাকরীতে নতুন নিয়োগের। দরবারের, আমীর ওমরাহদের, প্রশাসকদের ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের আর্থিক দাবীর মুখে সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী,কৃষক ও শ্রমিকদের উপর অহেতুক করারোপের বিরুদ্ধে তিনি মুঘল সম্প্রাটকে হুশিয়ার করে দেন।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুঘল সম্রাটকে ইসলামী বিধি মোতাবেক জীবন পরিচালনা এবং একই সঙ্গে মুঘল সাম্রাজ্য পরিচালনায় ইসলামী রীতি অনুসরনের আহবান জানান। আঠারো শতকের ত্রিশের দশকে এসে মুঘল সম্রাট দুর্বলতার সুযোগে দরবারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদ চাটুকারীতার মাধ্যমে হিন্দু উচ্চবিত্ত শ্রেণী দখল করে নেয়। মুঘল সম্রাট এদের হাতের ক্রীড়নকে পরিনত হন। দরবারের নীতি নির্ধারনে হিন্দুরা নিরাপদ শক্তির ভূমিকায় অবতীন হয়। এই সময়ে ভারতের পূর্বাঞ্চলে বানিজ্যরত ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাথে উচ্চবিত্ত হিন্দুদের একটি আর্থিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠে এই সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে হিন্দু উচ্চ শ্রেণী মুসলমানদের পরিবর্তে ইংরেজ শক্তিকে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য প্ররোচিত করতে থাকে। এই প্রক্রিয়ারই চূড়ান্ত ফলশ্রুতি হলো ১৭৫৭ সালের পলাশী ট্রাজেডি। সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে শাহ ওয়ালীউল্লাহ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে মুসলমানদের মাঝে নতুন রাজনৈতিক অচলায়তন রোধ করা সম্ভবপর। এই জন্য তিনি সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করে ছিলেন মুসলিম সমাজের নেতৃত্বের আত্মশুদ্ধির উপর।

আঠারো শতকের চল্লিশের দশকে মুঘল সাম্রাজ্যের পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারন করে। মারাঠা ও শিখদের হামলায় ভারতের দক্ষিন ও পশ্চিমাঞ্চলে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। জাঠ শক্তি পূনঃ পূনঃ দিল্লী লুন্ঠন করে। এই পরিস্থিতিতে জন সাধারনের চলাচলের পথ এবং ব্যবসা বানিজ্য পরিচালনা সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও রাস্তাঘাটে সেনাবাহিনী মোতায়েনের জন্য সম্রাটের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি সম্রাটের প্রতি ভালবাসা বা দুর্বলতার বশবর্তী হয়ে সম্রাটকে পত্রলেখা এই সকল বক্তব্য প্রদান করতেন না। দেশের প্রতি দেশের মানুষের প্রতি গভীর আগ্রহ ও ভালবাসা থেকে তিনি মুঘল শাসনের কেন্দ্রে শক্তিশালী সরকার, দেশের স্থিতিশীলতা এবং উন্নতি কামনা করতেন। তাঁর মুল লক্ষ্য ছিল ভারতের মুঘল সাম্রাজের ঐতিহ্য আর এই জন্য তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন লেখা পড়া, জ্ঞান এবং আদর্শে সমৃদ্ধ সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব। পাশাপাশি তিনি দেশের সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে ইসলামের আদর্শ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালনের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। মুসলমানদের মধ্যে গোষ্ঠী প্রীতি, গোত্রপ্রীতি, আন্তঃ সামাজিক সংঘাত প্রভৃতি কাজকে তিনি ইসলাম বিরোধী বলে ঘোষনা করেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ চিন্তা ও মনন ভাবনায় সময়ের চেয়ে অনেক অগ্রবর্তী ছিলেন।

পবিত্র কোরান শরীফ আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হওয়ায় ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে পরবর্তী সুদীর্ঘকাল এই মহাগ্রন্থ অন্য কোন ভাষায় অনুদিত হয়নি। অবশ্য এর অন্যতম প্রধান কারন ছিল ইসলামী সভ্যতায় আরবী ভাষা মুসলমানদের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রধান ভাষা হিসেবে প্রচলিত ছিল। ইসলামী সভ্যতার অগ্রগতির সাথে আরবীর পাশাপাশি প্রথমে ফারসী এবং পরে উর্দু ইসলামী সংস্কৃতির বাহন হয়ে দাড়ায়। এই পরবর্তী ভাষা দুটির প্রভাব বলয় ছিল। বিশেষতঃ ইরান, মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে। সমগ্র আরব ও উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলে ছিল একাচেটিয়া আরবী ভাষার প্রাধান্য। আর অন্যান্য ভাষার মধ্যে তুর্কী ভাষায় ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, ঐতিহ্য ইসলামী সাহিত্য প্রভৃতির চর্চা হয়েছে। ভারতের মুসলিম দরবারে আরবীর পরিবর্তে ফারসী প্রধান ভাষা হয়ে দাড়ায়। বস্তুতঃ ফারসী ছিল ভারতীয় মুসলিম শাসনের দরবারের ভাষা এবং একই সাথে জ্ঞানবিজ্ঞানের বাহন। ভারতীয় অভিজাত মুসলমান সমাজের ভাষা ছিল ফারসী। ক্রমে উনিশ শতক থেকে আরবী ও ফারসীর সংমিশ্রনে সৃষ্ট উর্দু ভাষা হয়ে উঠে ভারতের শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রসর মুসলমানদের ভাষা। শাহ ওয়ালীউল্লাহ এটা অনুধাবন করতে সক্ষম হন যে আঠারো শতকে অগ্রসর মুসলিম সমাজে এমনকি সাধারণ মুসলমান সমাজে আরবীর চেয়ে ফারসীতে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা এবং আদান প্রদানের পরিমান অনেক বেশী। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আরবীর পাশাপাশি অন্যান্য ভাষায় পবিত্র কোরান শরীফের অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন। এর মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষ কোরানের আদর্শ, শিক্ষা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়ার সুযোগ লাভ করবে। এই গভীর উপলব্ধি থেকে শাহ ওয়ালিউল্লাহ পবিত্র কোরআন শরীফের আরবী থেকে ফারসীতে তরজমা করেন। আঠারো শতকের ত্রিশের দশকের শেষদিকে তাঁর এই তরজমা প্রকাশিত হয়। এটা ছিল ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ, আরবী ও ফারসী ভাষায় অসাধারণ পারদর্শী, কোরান ও সুন্নাহর একনিষ্ঠ সাধক শাহ ওয়ালিউল্লাহ হলেন পবিত্র কোরান শরীফের প্রথম তরজমাকারী। ফারসী ভাষায় পবিত্র কোরানের তরজমা ভারতীয় মুসলিম আর্থ-সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

আরবী এবং ফারসী ভাষায় শাহ ওয়ালীউল্লাহর কমপক্ষে ২৫টি করে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো- "সাবাতুবাত' এই গ্রন্থে তিনি মুঘল বাদশাহ, আমীর, ওমরাহ প্রমুখদেরকে ইসলামের আদর্শ, নির্দেশিত পথ এবং হজরত মুহম্মদ (সঃ) এর জীবনী অনুসরন করে জীবন ও রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশ প্রদান করেন। পবিত্র ইসলাম ধর্ম নিয়ে তাঁর লেখা গ্রন্থ হলো হুজাতুল্লাহ উল বালাগা। আরবী ভাষায় লেখা এই গ্রন্থে তিনি ইসলামের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। তিনি হাদীসে এবং ইসলামী বিচার ব্যবস্থা নিয়ে একাধিক গ্রন্থ লিখেছেন। সুফীবাদে প্রসার ব্যবস্থা নিয়ে একাধিক গ্রন্থ লিখেছেন। সুফীবাদে প্রচুর জ্ঞানের অধিকারী হলেও তিনি ছিলেন পীর পুজার বিরুদ্ধে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দার্শনিক ইবনুল আরাবী এবং মুজাদ্দেদ ই আলফে সানীর মত নিয়ে রচনা করেন 'ফয়সালা ই- ওয়াদাত উল ওয়াজুদ ওয়া ওয়াদুত ইল সুহুদ গ্রন্থ। বস্তুত তিনি হলেন আঠারো শতকের ভারতীয় মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ, লেখক, গবেষক। এই লেখনীমালার মধ্য দিয়ে তিনি সমগ্র জাতিকে নতুন পথের সন্ধান প্রদান করেন। আজীবন কোরান ও হাদীসের অনুশীলনকারী, লেখ, গবেষক, মুসলমানদের পথ নির্দেশনা প্রদানকারী শাহ ওয়ালীউল্লাহ ১৭৬৩ সালে (১১৭৬ হিজরী সনের মহরম মাসে) ইন্তেকাল করেন। তাঁর চারপুত্র শাহ রফিউদ্দীন, শাহ আবদুল কাদির, শাহ আবদুল আজিজ এবং শাহ আবদুল গনি পরবর্তী সময়ে ভারতের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে স্থায়ী হন। শাহ রফিউদ্দীন ও শাহ আবদুল কাদির পবিত্র কোরান শরীফের প্রথম উর্দুতে তরজমা করেন। শাহ আবদুল আজিজ উনিশ শতকে ভারতীয় মুসলমানদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন।

> মুসলিম সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সমস্যাবলী চিহ্নিত করে এগুলি দূর করার পথ নির্দেশনা প্রদান করেন। এখানে তিনি একজন সমাজ বিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ। মৌলিক আদর্শ, ইসলামের জীবনবিধান, রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতি, ইসলামী...

শাহ ওয়ালীউল্লাহ ছিলেন একজন ধর্মতত্ত্ববিদ, চিন্তাবিদ ও দার্শনিক। আজীবন অতিবাহিত করেছেন লেখনী পরিচালনা করে। ভারতীয় মুসলিম শাসনের চরম দুঃসময়ে মুঘল দরবার ও মুঘল শাসনের বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করতে সক্ষম হন তিনি। মুসলিম সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সমস্যাবলী চিহ্নিত করে এগুলি দূর করার পথ নির্দেশনা প্রদান করেন। এখানে তিনি একজন সমাজ বিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ। মৌলিক আদর্শ, ইসলামের জীবনবিধান, রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতি, ইসলামী জীবনাদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে নতুনভাবে সচেতন করে তোলে। ভারতীয় মুসলমানদের দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে একমাত্র ইসলামের মৌলিক আদর্শ ও নীতিমালাকে রাষ্ট্রীয়, সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে প্রয়োগ এবং অনুশীলন ছাড়া তাদের মুক্তির কোন পথ খোলা নেই। তাঁর সমগ্র লেখনীমালা, পরিচালিত হয়েছিল এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে। দিল্লীর মাদ্রাসা ই- রহিমীয়াতে শিক্ষকতা, ইসলামের দর্শন, চিন্তা, ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্পর্কে ভারতীয় মুসলমানদের দুরবস্থা নিরসনে বাস্তব পথ নির্দেশ, তৎকালীন শিক্ষিত ও চিন্তায় অগ্রণী তরুন সমাজকে গভীর ভাবে আন্দোলিত করেছিল। দিল্লীর রহিমীয়া শিক্ষার্থীরা শাহ ওয়ালিউল্লাহর বানী ও আহ্বান পৌছে দেয় সর্ব ভারতীয় পর্যায়ে। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শুরু হয় ভারতীয় মুসলিম সমাজে নতুন আন্দোলনের। ক্রমে এই আন্দোলন পর্যবসিত হয় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি সংগ্রামে। ভারতীয় মুসলমানদের জাতি সত্বার স্বাতন্ত্র্যতা তিনিই প্রথম তুলে ধরেন। সামগ্রিক মূল্যায়নে বলা যায় ইতিহাসের দুঃসময়ে ভারতীয় মুসলমান সমাজের নতুন পথের দিশারী হিসেবে শাহ ওয়ালীউল্লাহ ইতিহাসে অবিস্মরনীয় হয়ে থাকবেন।

ইসলাম আধুনিক বিজ্ঞানের জনক

সৈয়দ আশরাফ আলী

আমরা ছোট বড় সকলেই আকাশে চাঁদের দিকে কোন না কোন সময়ে তাকিয়ে দেখেছি- কেউ আহ্বান করেছি চাঁদ মামাকে টিপ দিয়ে যাবার জন্য বাচ্চার কপালে। কেউ দেখেছি সেই অতি পুরাতন বুড়ীকে চরকা কাটতে, কেউ খুঁজে পেয়েছি চাঁদের স্নিগ্ধ রূপের প্রিয়তমাকে, কেউ বা আবার পূর্ণিমার চাঁদকে দেখেছি ঝলসানো রুটি হিসাবে। কিন্তু বিভিন্ন রূপে সকলেই চাঁদকে অবলোকন করা সত্বেও আমরা অনেকেই এখনো জানিনা যে, এই চন্দ্রপৃষ্ঠ আদৌ মসৃন নয়, এই চন্দ্রপৃষ্ঠ ক্ষত-বিক্ষত, এই চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রায় এভারেষ্টের মতই সুউচ্চ শৃঙ্গ রয়েছে। শুধু তাই নয়, খুব অল্প মানুষই জানে যে, এই চন্দ্রপৃষ্ঠের তিন তিনটি CRATERS বা আগ্নেয়গিরি মুখের নামকরন করা হয়েছে তিনজন বিশ্ববিখ্যাত মুসলমান বৈজ্ঞানিকের নামে। সেই বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিকগণ হচ্ছেন। আল বিরুণী, ইবনে সিনা ও ওমর খৈয়াম।

মুসলমান বৈজ্ঞানিকদের নামে চন্দ্রপৃষ্ঠের CRATERS এর এই নামকরণ কিন্তু আমরা মুসলমানরা করিনি, এই নামকরন করা হয়েছে অমুসলিমদের দ্বারা। ১৯৭১ সালে International Congress of Astronomical Union কর্তৃক। কিন্তু কেন মুসলমান বৈজ্ঞানিকদের নামে এই নামকরন? এর কারণ বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই তিন ক্ষণজন্মা পুরুষের অবদান অসীম ও অনস্বীকার্য্য।

এটি Petro- Dollar এর প্রভাবযুক্ত কোন পদক্ষেপ নয়। কারণ ১৯৩৫ সালেও মুসলিম নিয়ন্ত্রিত International Astronomical Union চন্দ্রপৃষ্ঠে ১৩টি "Lunar Formation" ১৩ জন মুসলমান বৈজ্ঞানিকগনের নামে নামকরন করেছিল। তাঁরা ছিলেন ঃ আব্দার রহমান আল- সূফী উলুগ বেগ, মাশা' আল্লাহ, আল ফারগানী, আল বাতানী, সাবিত ইবনে কুররা, আল হাসান আল হাইশাম, আল জারকালী, জাবির ইবনে আফলাহ, নাসির আল- দীন, আল বিতরুজী, আবু। আল ফিদা ও আল মামুন ইবনে হারুনুর রশীদ।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে পেট্রো- ডলারের আদৌ কোন প্রভাব ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৫ ও ১৯৭১ সালের উল্লেখিত ঐতিহাসিক নামকরণ ছিল বিজ্ঞানের বৈচিত্র্যময় অঙ্গণে মুসলমানদের বর্ণাঢ্য ও অবিস্মরনীয় অবদানের সহজ- সরল স্বাভাবিক স্বীকৃতি মাত্র। এর কারণ আধুনিক বিজ্ঞান বলতে যা বোঝায় তার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন এঁরা এবং এঁদের মতই অন্যান্য মুসলমান বৈজ্ঞানিকেরা।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে পেট্রো- ডলারের আদৌ কোন প্রভাব ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৫ ও ১৯৭১ সালের উল্লেখিত ঐতিহাসিক নামকরণ ছিল বিজ্ঞানের বৈচিত্র্যময় অঙ্গণে মুসলমানদের বর্ণাঢ্য ও অবিস্মরনীয় অবদানের সহজ- সরল স্বাভাবিক স্বীকৃতি মাত্র। এর কারণ আধুনিক বিজ্ঞান বলতে যা বোঝায় তার ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করেছিলেন এঁরা এবং এঁদের মতই অন্যান্য মুসলমান বৈজ্ঞানিকেরা।

এটাই তো স্বাভাবিক! 'ইকরা' বা পড়' শব্দ মাধ্যমে যে ধর্মের শুরু, যে ধর্মে নির্দেশ প্রদান করা হয়ঃ 'উতলুবুল ইলমা ওয়ালাউ কানা বীসসীন' জ্ঞান সাধনা কর, যদিও তার জন্য সুদূর চীনে গমন করতে হয়, যে ধর্ম বলিষ্ঠভাবে ঘোষনা করেঃ "ঘন্টাখানেকের জ্ঞান-সাধনা সমগ্র রজনীর ইবাদত অপেক্ষা শ্রেয়" সেই ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা স্বভাবতঃই পৃথিবীর দিকে, চাঁদের দিকে, নক্ষত্রগুলীর দিকে দৃষ্টিপাত করেছে জ্ঞানলিপ্সু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে।

মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য উদঘাটনে তারা প্রয়াস গ্রহণ করেছে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে- শত সহস্র বৎসরের কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে বিজ্ঞানকে তারা করে তুলেছে সম্পূর্ণরূপে আধুনিক। এ কথা দাবী করলে আদৌ অত্যুক্তি হবে না যে, আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে ইসলামেরই জন্য। আধুনিক বিজ্ঞান বলতে যা বোঝায় তার জনক ভারতীয় বা গ্রীক বা মিশরীয় বৈজ্ঞানিকগণ নন সত্যিকার অর্থে আধুনিক বিজ্ঞানের জনক হচ্ছেন মুসলমান বৈজ্ঞানিকগণ। অনেকে হয়ত মনে করবেন যে, মুসলমান বলেই আমরা এ দাবী করছি। কিন্তু আমাদের এ দাবীর স্বীকৃতি প্রদান করেছেন অমুসলিম মনীষীবৃন্দ। বিশ্ববিখ্যাত John William Draper যিনি অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন যে, পাশ্চাত জগৎ তথা মানবজাতির গর্ব রেনেসাঁর জন্ম হয়েছে ইসলামের জন্য (Ranaissance owes its birth to Islam) সেই ড্রেপারই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন ঃ

'Not one of the purely mathematical or mixed or practical sciences was omitted by the Arabs;

[A History of the Intellectual Development of Europe, Vol. II, London, 1875, Page- 38]

লেলিনের ঘনিষ্ঠ সহচর, স্তালিন, ট্রটস্কী, গোর্কীর সহকারী বিশ্ববিখ্যাত মনীষী

এম.এন.রয় যিনি আদৌ কোন ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না, যথার্থই ঘোষণা করেছেন যে, মুসলমানদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই অবহিত রয়েছে ইতিহাসের রঙ্গ-মঞ্চে মুসলমানদের কি বিশাল অবদান রয়েছে। (Very few of the Muslims of our time are aware of the great role played by Islam in the play-house of history.)

তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, বিদ্বেষপূর্ণ কুৎসা ও বাস্তবিবর্জিত কল্পকাহিনী পরিহার করে আবেগহীন বিজ্ঞান- ভিত্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, মানব ইতিহাসে ইসলাম আবির্ভূত হয় অভিশাপ হিসাবে নয়, কল্যাণময় আশীর্বাদরূপে। (When dispassionate scientific study of history dissipates legend and discriedits malicious Tales the rise of Islam stands out as a scourge but a blessing for makind. (The Historical Role of Islam, Calcutta, 1931).

রেভারেন্ড বসওয়ার্থ স্মীথ এর ন্যায় একজন ধর্মপ্রাণ পাদ্রীও তাই নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করেছেন ঃ

"Islam is the most complete,the most sudden and the most extraordinary revolution that has come over any nation on earth."

(Mohammad and Mohammedanism, London, 1874, Page- 105)

মনীষী হামবোল্ড দ্বিধাহীনচিত্তে ঘোষনা করেছেনঃ

"The Arabians are to be considered the proper founders of the physical sciences, in the signification of the term which we are now accustomed to give it" (Alexander von Humboldt, Cosmos, Vol. II)

মনীষী রবার্ট বিফ্রো আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে উল্লেখ করেছেন ঃ

Science is the most momentous contribution of Arab civilization to the modern world.

The debt of our science to the Arabs does not consist in startling discoveries or revolutionary theories; science owes a great deal more to Arab culture, it owes its existence. (Robert Briffault, The Making of Humanity, London, 1919, Page- 191)

অর্থাৎ আধুনিক বিজ্ঞান শুধুমাত্র চমকপ্রদ আবিস্কার বা যুগান্তকারী তত্ত্বকথার জন্যই মুসলমানদের কাছে ঋণী নয়, আধুনিক বিজ্ঞান তার অস্তিত্বের জন্যই মুসলমানদের নিকট চিরঋণী।

বলা বাহুল্য, ইসলামের আবির্ভাব না ঘটলে আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম হতো না। হলেও তা নিশ্চিতরূপে যথেষ্ট বিলম্বিত হ'ত।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক- রাজনীতিবিদ পন্ডিত জওহরলাল নেহরুও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকৃতি প্রদান করেছেন,

"Among the ancients we do not find the scientfic method in China or India. We find Just a bit of it in old Greece. In Rome again it was absent. But the Arabs had the scientific spirit of inquiry, and so they may be considered the fathers of modern science. [Pundit Jawaharlal Nehru, Glimpses of world History, London, 1931, Page- 151].

কিন্তু এই অসাধ্য-সাধন সম্ভব হলো কি করে? প্রায় নিরক্ষর, অসভ্য ও বর্বর আরবজাতি আকস্মিকভাবে কোন যন্ত্রবলে জ্ঞান- বিজ্ঞান সাধনার চরম শীর্ষে আরোহন করতে সক্ষম হলো ?

এর উত্তর অত্যন্ত সহজ ও সরল। এই অসাধ্য - সাধন সম্ভব হয় ইসলামের প্রতি আরব জাতি তথা মুসলমানদের সুদৃঢ় বিশ্বাস ও ঐকান্তিক একনিষ্ঠার দরুন।

ফিলিপ কে হিট্টী যথার্থই উল্লেখ করেন ঃ

"After the death of Prophet sterile Arabia seems to have been converted as if by magic into a nursery of heroes the like of whom both in number and quality is hard to find anywhere. (Philip K. Hitti, History of are Arabs, London, Tenth edition, 1970, Page- 142)

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে অভূতপূর্ব বিজ্ঞান সাধনাই হচ্ছে এই চমকপ্রদ, অনন্যসাধারণ সাফল্যের একমাত্র কারণ। যে জাতি কুরআনে বিশ্বাস করে দৃঢ়ভাবে, যে জাতি রাসুলের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার পথপরিক্রমা নির্ধারণ করে, সে জাতির এহেন সাফল্যে বিস্ময় বা সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। কেননা, পবিত্র আল-কুরআন হচ্ছে বিজ্ঞান সমৃদ্ধ এক অনন্য পুস্তক যার রচয়িতা হচ্ছেন সর্বজ্ঞানের আধার সর্বশক্তিমান রাব্বুল আলামীন স্বয়ং। স্বভাবতঃই এ মহান গ্রন্থে বিজ্ঞান- বিরুদ্ধ কোন বক্তব্য থাকতে পারে না।

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মরিস বুকাইলি নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করেছেন যে, কুরআন শরীফে এমন একটিও তথ্য নেই যা বিজ্ঞান- বিরোধী। তাঁর ভাষায় ঃ

The Qur'an does not contain a single scientific statement that is unacceptable. (Maurice Bucaille, The Bible, the Qu'ran and Science 1978, Page- 125)

এ কুরআন মাজীদের প্রথম শব্দই হলো 'ইকরা'- পড়'। শুধু তাই নয়, প্রথম যে ৫টি আয়াত হীরা পর্বতের গুহায় নাযেল হয়, তাতে আল্লাহ তা'আলা নিজের মহত্ব ও মাহাত্ম্য প্রকাশের নিমিত্ত ঘোষনা করেছেন ঃ "পড়! তোমার প্রভু হচ্ছেন মহিমান্বিত! যিনি শিখিয়েছেন কলমের

দ্বারা! শিখিয়েছেন মানুষকে তা' যে সম্পর্কে সে ছিল অজ্ঞ।" অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারীর জন্য জ্ঞানার্জন অন্বেষণের শক্তি- সামর্থ্য রাব্বুল যআলামীনই প্রদান করেছেন।

কুরআন মজিদ আরও ঘোষণা করেছে ঃ "ইন্না ফি যালিকা লা আয়াতিল লীল আযীমীন।" অর্থাৎ এর মধ্যে নিহিত রয়েছে জ্ঞানীদের জন্যই নিদর্শন। তাই, পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব সন্তান হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ঘোষণা করেছেন ঃ তাবাবুল ইলমী ফারিজাতুন আ'লা কুল্লি মুসলিমিন ওয়া মুসলিমাতীন। অর্থাৎ, প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারীর জন্য জ্ঞানার্জন হচ্ছে ফরজ। অবশ্যপালনীয়।

স্বভাবতঃই তাঁর পক্ষে এ মর্মেও দুঃসাহসিক ঘোষণা প্রদান সম্ভব হয়েছেঃ জ্ঞানার্জনে ব্যবহৃত মসী শহীদের রক্ত অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান।

ফলে, কুরআন ও সুন্নাহ এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিজ্ঞান সাধনায় আকণ্ঠ নিমগ্ন হলো আরব তথা মুসলমান জাতি। ফেরেস্তাদের ন্যায় তারা ঘোষণা করতে সম্মত হলো না যে,"লা ইলমা লানা ইল্লা মা আল্লামতানা" অর্থাৎ যা কিছু আমাদের শিখিয়েছেন, তার বেশী কোন কিছুতো আমাদের জানা নেই। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে উদ্ভাসিত সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ রাসূলের উম্মতগণ সৃষ্টিকর্তার নিকট ঐকান্তিক আবেদন পেশ করলো ঃ রাব্বী যিদনি ঈলমা।

হে আমার প্রভু, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর। যাতে আমি তোমাকে সঠিকভাবে জানতে পারি। তোমার সর্ববিস্তৃত জ্যোতির্ময় অস্তিত্ব যেন সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধি করতে পারি। মুসলমান জাতি জানতে চাইলো সর্বত্র বিরাজমান সেই মহান অস্তিত্বকে যা কবির ভাষায় ঃ

আছ অনল অনিলে, চির নভনীলে
ভূধরে সলিলে গহনে।
আছ বিটপী লতায়, জলদের গায়
শশী তারকায় তপনে।

নিমগ্ন হলো তারা সেই অন্তহীন অস্তিত্বের সন্ধান- প্রয়াসে ইবনে রুশদের ভাষায়, 'সুপ্ত থাকে পাথরের বুকে, স্বপ্ন দেখে জীবজন্তুর মধ্যে, জেগে ওঠে মানুষের মাধ্যমে।'

(Which sleeps in the stone, dreams in the animal and wakes in the man. (The spirit of Islam, Syed Ameer Ali, 1949 Edition, Page- 478.)

মুসলমানদের এই জ্ঞান অন্বেষণ নিঃসন্দেহে ছিল স্বাতন্ত্র্যের দাবীদার। অভূতপূর্ব এই জ্ঞান- সাধনা ছিল পুরোপুরি তৌহীদ ভিত্তিক। আল্লাহ তা'আলার পাক কালাম নির্দেশ দেয় ঃ 'ইকরা' পড়'। কিন্তু একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়ঃ "বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক।" 'পড়! সেই রব এর নামে যিনি সৃজন করিয়াছেন।" জ্ঞান-অন্বেষণের প্রয়াস বহু ধর্মেই, বহু সভ্যতায় ইতিপূর্বেও গৃহীত হয়েছে। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার পবিত্র নামে, সৃষ্টিকর্তাকে সঠিকভাবে জনার উদ্দেশ্যে, সৃষ্টিকর্তাকে সত্যিকার অর্থে হৃদয়ঙ্গম করার ঐকান্তিক বাসনায় জ্ঞান- সাধনা মুসলমানেরাই প্রথম প্রবর্তন করে। স্বভাবতঃই রাব্বুল আলামীনের রহমতপুষ্ট তাদের এই অভূতপূর্ব প্রয়াস যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন করে। ইতিহাস রচনা করে। রাসূল- আল্লাহ(দঃ) জ্ঞান আহরনের জন্য দু-দূরান্তরে, সুদূর চীনে যাবার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। সেই নির্দেশ অনুক্রমে মুসলমানেরা পৌছালো সুদূর চীনে, ভারতে, মিশরে। গ্রীক পুস্তকাদিও সংগ্রহ করল। শুরু হলো অভূতপূর্ব অনুবাদকরণ। খলিফা আল-মনসূর (৭৫৪-৭৭৫), হারুনুর রশিদ (৭৮৬-৮০২) এবং আল মামুনের (৮১৩-৮৩৩) শাসনামলে এই অনুবাদ কর্মকান্ড নজিরবিহীন রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলেও জ্ঞানার্জনের এই প্রশংসনীয় প্রয়াস সাফল্যের শীর্ষে উন্নীত হয় বিশ্ববিখ্যাত হারুনুর রশিদের সুযোগ্য পুত্র খলিফা আল মামুনের নেতৃত্বে। তদানীন্তন দুই লক্ষ দিনার ব্যয়ে ৮৩০ খৃষ্টাব্দে আল মামুন বাগদানে 'বায়তুল হিকমা' বা দারুল-হিকমত' নামে এক বহুমূখী একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন। সুবিশাল এক গ্রন্থাগার ও মানমন্দির সম্বলিত এই একাডেমীতে বিজ্ঞান-চর্চার পাশাপশি পূর্ণোদ্যমে গ্রীক, সিরিয়াক, সংস্কৃত ও মিশরীয় গ্রন্থাদির অনুবাদ ও অনুলিপিকরণ চলতে থাকে। এটি সত্যিই বিস্ময়কর যে, অঢেল ধন-সম্পদে ভরপুর তদানীন্তন মুসলিম সাম্রাজ্যের খলিফা-বাদশাহগণ শুধুমাত্র ভোগ- বিলাসে মত্ত না থেকে- জ্ঞান অন্বেষণে নিজেদেরকে সর্বান্তঃকরণে নিয়োজিত করেন। শুধুমাত্র রাজা-বাদশাহরা নন, আমীর ওমরাহ এবং অন্যান্য ধনাঢ্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যেও তথ্য আহরণ ও জ্ঞানার্জনের এ নজিরবিহীন ফলপ্রসূ প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। একথা দাবী করা অযৌক্তক হবে না যে, শাসকবর্গ ও ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের জ্ঞানান্বেষণে এহেন ব্যাপক ও সুবিস্তৃত প্রয়াস ইতিহাসে আর কখনও পরিলক্ষিত হয়নি। জ্ঞানঅর্জনই রাজা- রাদশাহ, আমীর- ওমরাহদের জীবনের মূখ্য কর্মকান্ডরূপে পরিচিহ্নিত হয়। রবার্ট ব্রিফো যথার্থই উল্লেখ করেছেন,

"The Princes of Bangdad, Shiraz and Cordova Pursued Culture with the personal ardour of an overwhelming craving. Never before and never since on such a scale has the spectecle been witnessed of the ruling classes throughout the length and breadth of a vast empire given over entirely to a frenzied passion for the acquirement of knowledge. Learning seemed to have become with them the chief business of life. (Robert Briffault, ibid, Page- 188)

শত-সহস্র ভারতীয়, গ্রীক ও অন্যান্য দেশীয় পুস্তক অনূদিত হলো আরবী ভাষায়। গ্রীক, সিরীয় ও Chaldaic ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদির অনুবাদ- কর্মের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ছিলেন লিউক- এর পুত্র কোষ্টা। ফার্সী ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহের অনুবাদ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পিত হয় ইয়াহিয়া বিন হারুনের ওপর। সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহের অনুবাদের তত্ত্বাবধান করেন দুবান নামে এক ব্রাহ্মণ (Duban the Brahmin) পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, এই অনুবাদ

ও অনুলিপিকরণের মূল উদ্দেশ্যই ছিল দর্শন ও বিজ্ঞানসম্পৃক্ত তথ্য আহরণ। প্রাথমিক পর্যায়ে বিদেশী কবিতা বা ইতিহাস তথ্যানুসন্ধানী আরবদের তেমন আকৃষ্ট করেনি। (But the choice of the Arab) Collectors and the object of their interest were very different. Of the poets and historians of Greece, beyond satisfying their curiosity by a few samples, they took little account (Robert Briffault, ibid, Page-192) এ ছাড়াও প্রয়োজনানুযায়ী দুস্প্রাপ্য বা প্রায় অবলুপ্ত বহু মূল্যবান গ্রন্থ অনুলিপিকরণের ব্যবস্থা সাধিত করা হয়।

এরপর শুরু হয় মুসলমানদের বৈপ্লবিক গবেষণা- প্রসূত স্বকীয় অবদান। কুরআন ও সুন্নাহ এর আলোকে বিজ্ঞান সাধনার মাধ্যমে আকাশের নিলীমায়, চন্দ্রের সুষমায়, পবনের হিল্লোলে, সমুদ্রের কল্লোলে, হৃদয়ের স্পন্দনে, আত্মার ক্রন্দনে, সকল আনন্দ উল্লাসে, সকল ব্যথা- বেদনার সেই অন্তর্যামীর, সেই রাব্বুল আলামীনের সন্ধান সাধনা! ফলশ্রুতিতে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে অসাধারণ, অতুলনীয়, অনুকরনীয় অবদান রাখতে মুসলমানেরা সক্ষম হয় তা সত্যিই বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ। দ্য লেসী ও লিয়ারীর ভাষায় ঃ "The Greek materials received by the Arab were not simply passed on by them to others who came after. It had a very real life and development in its Arab surroundings.The Arabs not only extended what they had received from the Greeks but they checked and corrected older records and very real advance was made. [De Lacy O'Leary, Arabic Thoughts in History] স্বভাবতঃই লন্ডনস্থ বিজ্ঞান যাদুঘরে (Science Museum) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিধৃত রয়েছে যে, ইসলামের আবির্ভাব না ঘটলে গ্রীকদের জ্ঞানভান্ডারের পক্ষে তমসাচ্ছন্ন মধ্যযুগে টিকে থাকা সম্ভব হত না। (Were it not for Islam, Greek learning might not have survived the Dark Age).

গ্রীক, ভারতীয়, মিশরীয়, সিরীয়াক প্রভৃতি ভাষায় রচিত বিজ্ঞান- সম্পৃক্ত গ্রন্থাদির আরবী ভাষায় অনুবাদকরণ এবং একই সঙ্গে আরবী ভাষায় বিজ্ঞান সম্পর্কিত মৌলিক রচনা প্রণয়ন এমনই অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে যে, আরবী ভাষা মানবজাতির সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল ও বৈজ্ঞানিক ভাষারূপে সার্বজনীন স্বীকৃতি রাভ করে। **[কোন ব্যক্তি সে যুগে সম্যকরূপে অবহিত, তথ্যপুষ্ট বা যুগোপযোগী হতে আগ্রহী হলে তার জন্য আরবী ভাষায় জ্ঞান অপরিহার্য বলে বিবেচিত হত। মুসলিম ও অমুসলিম সকল জ্ঞান-সাধককেই আরবী ভাষায় অধ্যায়ন করতে হত। পোপ জারবার্তের (১০৯৯-১১০৩) ন্যায় বিখ্যাত ধর্ম- সংস্কারক ও শিক্ষাবিদকেও কর্ডোভার মাদ্রাসাতে অধ্যায়ন করতে হয়। রজার বেকনের ন্যায় মনীষীও আরবী ভাষায় জ্ঞান আহরণ করে দ্বিধাহীনচিত্তে তাঁর অনুসারীদের অবহিত করেন যে, সত্যিকার অর্থে জ্ঞান আহরণের একমাত্র উপায় হল আরবী ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন।]** জর্জ সার্টন তাঁর বহুলপঠিত, বিশ্বনন্দিত "An Introduction to the History of Science" গ্রন্থে দ্বর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেনঃ

"The most valuable of all, the most original and the most pregnant (works), were written in Arabic. From the second half of the eighth to the end of the eleventh century, Arabic was the sientific, the progressive language of mankind. During that period anyone wishing to be well informed, up-to date, had to study Arabic. A large number of non Arabic speaking people did so. Roger becon learned Arabic. Neither Roger Bacon not his later namesake has any title to be credited with having introduced the experimental method Roger Bacon was no more than one of the apostles of Muslim science and method to Christian Europe, and he was never wearied of declaring that knowledge in Arabic and Arabic Science was for his contemporaries the only way to true knowledge. [George Sarton, An Introduction to the History of Science, Vol. I, Baltimore, 1927, Page- 17.]

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলমানরা যে অভূতপূর্ব, অনন্যসাধারন, যুগান্তকারী অবদান রাখতে সক্ষম হয় তা সত্যি বিস্ময়কর। সংক্ষেপে এ কথা উল্লেখ করা যায় যে, বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা প্রশাখায় মুসলমানদের অবদান ছিল অসাধারণ ও চমকপ্রদ। আল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে উদ্ভাসিত, ইসলামের অনুপম আদর্শে উদ্বুদ্ধ মুসলমানদের অবদান সত্যিই ছিল বহুবিস্তৃত ও যুগান্তকারী। বিজ্ঞানে এমন কোন অঙ্গন ছিল না যেখানে মুসলমানদের বলিষ্ঠ ও সাবলীল পদচারণা অসাধারণ সাফল্যের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়নি। জর্জ সার্টন যথার্থই উল্লেখ করেছেন যে, সে যুগে মানবজাতির প্রধান কর্তব্য মুসলমানেরাই সম্পাদন করে। তাঁর ভাষায় ঃ "The main task of mankind was accomplished by Muslims." [George Sarton, An introduction to the History of Science, Vol. I, Page- 624].

তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কয়েকটি উদাহরণও তিনি উল্লেখ করেছেন ঃ "The greatest philosopher, al-Farabi, was a Muslim; the greatest mathmaticians, al-Khwarizmi, Abul Kamil and Ibrahim Ibn Sinan were Muslims; the greatest historian, al-Tabari,was still a Muslim. (George Sarton, Ibid, Page- 624].

এ প্রেক্ষিতে, রেভারেন্ড বসওয়ার্থ স্মিথ তাঁর Mohammed and Mohammedanism গ্রন্থে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই উল্লেখ করেছেন ঃ

"During the Darkest period of

European history the Arabs for five hundred years held up the torch of learning to humanity."

আর এ অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র একটি কারণে একটি ব্যতিক্রমধর্মী, অনন্যসাধারণ জ্ঞানসাধনার নিমিত্তে। সৃষ্টিকর্তার মহান সত্ত্বা সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করার লক্ষ্যে বিজ্ঞানসাধনা নিমিত্ত। অভূতপূর্ব সে বিজ্ঞান সাধনা ছিল নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অ্যালেক্সি ক্যারলের ভাষায় ঃ "Science by worshipping the Maker of Matter and not matter exclusively, which restores to man the summit of his development in intelligence, in moral science, in virility,"

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলমানেরা যে অভূতপূর্ব, অনন্যসাধারণ, যুগান্তকারী অবদান রাখতে সক্ষম হয় তা সত্যিই বিস্ময়কর। স্বল্প পরিসরে ঐ বর্ণাঢ্য, বৈচিত্রময় কর্মকান্ডের বর্ণনা প্রদান কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তবে, সংক্ষেপে দু'একটি বিষয় তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া যেতে পারে।

হামবোল্ড এর ন্যায় বিশ্ববিখ্যাত অমুসলিম মনীষীর মতে- আরবের মুসলমানেরাই আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের বা Modern Chemistry এর জন্মদাতা। আবু মুসা জাবীর ইবনে হাইয়ান আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের জনক হিসাবে সর্বজনস্বীকৃত। জোসেফ হেল অতি প্রাজ্জল ভাষায় উল্লেখ করেছেন, "The increase in the number of artificially prepared substances; the perfection of methods handed down from the Greeks, the application of these methods to most diverse meterials, are the striking achievements of the striking acheivements of the Arabs in the domain of chemistry. If,in this direction, they advanced considerably beyond the Greeks, it was due to the fact that in place of hazy, mystical speculation they introduced objective experiments into the study of nature.' [Joseph Hell, Arab Civilization, Page- 98

ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট অধিকতর বলিষ্ঠভাবে অকুণ্ঠচিত্তে এ মর্মে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন যে, রাসায়ন শাস্ত্রের উদ্ভাবনই হয়েছে আরবদের আবিস্কারের মাধ্যমে। তাঁর ভাষায়, "Chemistry, alembics, sun-dials, cloks and the numerical signs owe their existence to Arab invention" (Napoleon Bonaparte, as quoted in Bonapart et I'Islam, Page- 105).

মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল খাওয়ারিজমী বিরচিত 'হিসাব আল জবর ওয়াল মুকাবেল্লাহ' গ্রন্থটি থেকেই Algebra শব্দের উদ্ভব ঘটে। আল খাওয়ারিজমীকেই আধুনিক বীজগণিত এর জনক বলে অভিহিত করা হয়। H.G. Wells তাঁকেই "শুন্যের" অর্থাৎ zero এর প্রকৃত আবিস্কারক হিসাবে The Outline of History গ্রন্থে পরিচিহ্নিত করেছেন। যদিও ভারতীয়রাই শুন্যের আবিস্কার করে মর্মে অনেকে দাবী করেন, কিন্তু এর সার্থক ও সফল প্রয়োগের জন্যই আল-খাওয়ারিজমী "শুন্যের আবিস্কারক" বলে নন্দিত হন। Modern Trigonometry বা আধুনিক ত্রিকোণমিতির জনক বলেও আল-খাওয়ারিজমী পরিচিত হন।

এইচ, জি, ওয়েলস এর ভাষায়, The zero, it is stated, was unknown until the ninth century, when it was invented by a Muslim mathematician named Muhammad-ibn- Musa, who also was the first to use the decimal notation and who gave the digits the value of position ——- Thye Arabs develo[ped spherical trigonometr6y, inventing the sine, tangent, and cotangent." (H.G. Wells, The Outline of History, Page- 631)

জর্জ সার্টন সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, "earliest Muslim zero is the dot in a manuscript dated 873. The earliest Hindu exampleof a zero is an inscription of 876 at Gwalior. (numbers 50, 270)" [George Sarton, Ibid Vol. I, Page- 601]

গ্রেগরীয়ান ক্যালেন্ডার বর্তমান বিশ্বে সার্বজনীনভাবে ব্যবহৃত হলেও ওমর খৈয়াম প্রনীত ক্যালেন্ডার এই ইংরেজী' বা গ্রেগরীয়ান ক্যালেন্ডার অপেক্ষা অধিকতর নিখুঁত বলে পাশ্চাত্য মনীষীবৃন্দও স্বীকৃতি প্রদান করেন। P.K. Hitti এর ভাষায় ঃ "The researches of Omar al-Khayyam and his colloborators resulted in the production of the calender named after his patron, al Tarikh al- Jalali, Which is even more accurate than the Gregorian calendar. The latter leads to an error of one day in 3330 years, whereas al-Khayyam's apparently leads to an error of one day in 5000 years" (P.K. Hitti, History of the Arabs, Tenth edition, London, 1972, Page- 377).

আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার জন্ম দিয়েছে মুসলমান জ্যোর্তিবিজ্ঞানীরাই। এদের মধ্যে উলুগ বেগের অবস্থান সর্বশীর্ষে। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে মরণোত্তর খেতাব প্রদান করে এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ছয়জন জ্যোতির্বিদদের মধ্যে তাঁকে অন্যতম বলে পরিচিহ্নিত করে। আবদুর রহমান আসসূফী বিরচিত কিতাব আল কওয়াকিব আল- সাবিত আল মুসাওয়ারা' প্রথম বিজ্ঞানসম্মত নক্ষত্র-মানচিত্র বা STAR ATLAS হিসাবে আজও স্বীকৃত হয়।

এই গ্রন্থেই প্রায় ২২ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত ANDROMEDA GALAXY প্রথমবারের মত সুনির্দিষ্টভাবে পরিচিহ্নিত হয়।

আজ থেকে এক হাজার বছর পূর্বেই আল-বিরুণী আহ্নিক গতির কথা উল্লেখ করেন। অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ নিখুঁতভাবে পরিমাপ

করেন। F.W.CASSIDY এর অভিমতে তিনি অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের এক হাজার বছর পূর্বেই THEORY OF RELATIVITY এর ইঙ্গিতও প্রদান করেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আল-বিরুণীর অবদান এমনই অসাধারণ ও চমকপ্রদ ছিল যে, তাঁর তুলনায় গ্রীক ও চৈনিক বৈজ্ঞানিকদের রচনাসমূহ শিশুপাঠ্য বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের কর্মকান্ড বলে মনে হত। G. Buhlar এর অভিমতে "Both the accounts left to us by the Greek and the Chinese scientists read, by the side of Biruni's works like Children's books or the compilation of uneducated superstitious men."

আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের জনকও মুসলমান বৈজ্ঞানিকগণ। এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য আর-রাজী, ইবনে সিনা ও আল জাহরাওয়ী। H.G Wells তাঁর বিশ্ববিখ্যাত "The Outline of History" গ্রন্থে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকৃতি প্রদান করেছেন যে, "At the time when in Europe the practice of medicine was foridden by the Church, which expected cures to be effected by religious rites performed by the clergy, the Arabs had a real science of medicime" [The outline of History, Page- 631]

চিকিৎসা শাস্ত্রের যুবরাজ বা Prince of Physicians রূপে পাশ্চাত্য জগৎ কর্তৃক পরিচিহ্নত AVICENNA বা ইবনে সিনা বিরচিত 'আল কানুন ফি আল-তীব' গ্রন্থটি প্রায় ছয়শত বৎসর ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে চিকিৎসা- শাস্ত্রের মূল পুস্তক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। হিট্টীর ভাষায় ঃ "From The Twelfth to the seventeenth centuries this work served as the chief guide to medical science in the West." [P.K Hitti, History of the Arabs, Tenth edition London, 1970, Page- 368]
William Osler এর অভিমতেঃ Al-Qanun has remained a Medical Bible for a longer period than any other works" [William Oslen Evolution of Modern Science.]

মানবদেহে রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতিও আবিস্কার করেন ইবনে আল নাফীস। যদিও অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে উইলিয়াম হার্ভে ও মিগুয়েল সার্ভেটাসকে এখনও অনেকে এর আবিস্কার বলে পরিচিহ্নিত করেন। উল্লেখ্য, হার্ভে ও সার্ভেটাস এর তথাকথিত আবিস্কারের প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্বেই ইবনে আল নাফীস Pulmonary System of Blood Circulation আবিস্কার করেন। FRENCH ACADEMY OF MEDICINE ১৯৫৩ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সেমিনারের মাধ্যমে ইবনে আল নাফীসকে এই আবিস্কারের স্বীকৃতি প্রদান করেন।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে ইউরোপের খ্রীষ্টীয় সমাজে বিরাজমান অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের সঙ্গে মুসলিম স্পেনে অনুসৃত বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা ব্যবস্থার তুলনা করে এক চমককার চিত্র বর্ণনা প্রদান করেছেন। ড্রেপারের ভাষায়, "How different was all this from the state of things in Europe: the Christian peasant, fever-stricken or overtaken by accident, hied to the nearest saint- shrine and expected miracle; the Spanish Moor relied on the prescription or lancet of his physician, or the bandage and knife of his surgeon." (John William Draper, The Intellectual Development of Europe, Vol.II, London 1882, Page- 40)

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা দ্বিধাহীনচিত্তে স্বীকৃতি প্রদান করে যে, আবুল কাশেম খালাদ ইবনে আব্বাস আল জাহরাওয়ী বিরচিত "কিতাব আল-তসরীফ লিমান আজায আল-তালিফ" শিরোনামীয় গ্রন্থটি শল্যশাস্ত্রের মূল পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ইউরোপে সুদীর্ঘ পাঁচশত বৎসর ব্যবহৃত হয়। ব্রিটানিকার ভাষায় ঃ "Al-Tasrif stood for nearly 500 years as the leading text book on surgery in Europe, preferred for its concise lucidity even to the works of the classic Greek medical authority Galen."

আবু বকর মহাম্মদ ইবন জাকেরিয়া আল-রাজী বিরচিত "কিতাব আল যাদারী ওয়াল হাসবা" গুটি বসন্ত সম্পর্কিত আদিমতম বিজ্ঞানসম্মত পুস্তকরূপে নন্দিত হয়। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা কর্তৃক The Greatest physician of the Islamic World" হিসাবে পরিচিহ্নত আল-রাজী বিরচিত বিশ্ববিখ্যাত "কিতাব আল-হাউয়ী" বহু শতাব্দীব্যাপী পাশ্চাত্য জগতে পঠিত ও সমাদৃত হয়। Seton এর আবিস্কারক এবং Conditioned Reflex এর জনক (ভুলক্রমে শেরিং ও নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্যাভলো জনকরূপে পরিচিহ্নিত হয়ে থাকেন) আল রাজীর ৩৭ টি পরিচ্ছদ সম্বলিত চিকিৎসা সম্পৃক্ত এই বিশালাকার বিশ্বকোষটি ল্যাতিন ভাষায় ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে অনূদিত হয় এবং পরবর্তীকালে ১৫৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ঘন ঘন ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রকাশিত ও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। জর্জ সার্টনের ভাষায় ঃ "The Persian al-Razi was not simply the greatest clinician of Islam and of the whole Middle Ages; he was also a chemist and physicist ——————- He may be considered one of the forerunners of the iatrochemists of the Renaissance. He wrote an immense medical encyclopadia called Al-hawi (Continents)" and a monograph on measles and small-pox which is the masterpiece of Muslim medicine. Many contributions to gynaecology, obstetrics, and opthalmic surgery can be traced back to him —— Galenic in theory, he combined with his immense true Hippocratic wisdom —— —- His standing indeed was

so high that his contemporaries surnamed him The Experienced." [George Sarton, ibid, Vol. I, Page- 587, 609]

থ্যাচার ও শুইল যথার্থই উল্লেখ করেছেন ঃ

"In medicine they made great advances over the work of the Greeks. They studied physiology and hygiene, and their materia medica was practically the same as ours to-day. Many of their methods of treatment are still in use amoung us. Their surgeons understood the use of anaesthetics, and performed some of the most difficult operations known. At the time when in Eurpe the Practice of medicine was forbidden by the Church, Which expected cures to be effected by religious rites performed by the clergy, the Arabs had a real science of medicine." (Thatcher and Schwill, A General History of Europe, as quoted in H.G Wells' The outline of History, Page- 631).

পৃথিবীতে সত্যিকার অর্থে হাসপাতালও প্রথম নির্মীত হয় মুসলমানদের দ্বারা- দামাস্কাসে। খলিফা আল ওয়ালিদের নির্দেশে। ৭০৭ খৃষ্টাব্দে এই হাসপাতাল নির্মিত হয়। ক্রুসেডের মাধ্যমে মুসলমানদের সংগে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের পরই ইউরোপীয় খৃস্টানরা প্রথমবারের মত প্যারিসে একটি হাসপাতাল চালু করে। হিট্টীর ভাষায় ঃ

"When during the Crusades, Europe at last began to establish hospitals, they were inspired to do so by the example set for them by the Arabs of the Near East ——— ——————— The first hospital in Paris, Les Quinze-Vingt, was founded by Louis IX after his return from the Crusade" (Philip K. Hitti, History of the Arabs,Tenth edition. 1972)

একথা সর্বজনবিদিত এবং সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত যে, আহমদ ইবনে মজিদের সহায়তায় ভাস্কো দ্য গামা ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ভারতের কালিকট বন্দরে পৌছাতে সক্ষম হন। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার বর্ণনানুক্রমে আহমদ ইবনে মজিদ প্রণীত "রোটাইরস" (Roteiros) শীর্ষক "নৌপথ- নির্দেশিকা" (Sailing Directions) সম্বলিত পুস্তিকাটি নৌচালনার ক্ষেত্রে অবিস্মরনীয় অবদানের দাবী রাখে। আহমদ ইবন মজিদকেই দিকদর্শন যন্ত্রের (Compass) আবিস্কারক বলে পরিচিহ্নিত করা হয়। ফোরান্ত তাঁর Onstructions Nautiques গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "Sailors remembered himd as Shaykh Majid, the inventor of the mariner's compass and recited the Fatiha in his memory when they embarked on certain seas".

Harold J. Greenburg এর অভিমতে কলম্বাসও আমেরিকা আবিস্কারের ক্ষেত্রে মুসলমানদের উদ্ভাবিত Navigational পদ্ধতিই ব্যবহার করেন। তাঁর ভাষায় "Christopher Columbus reached the shores of America only by employing the principles of navigation developed by Muslim scientists" (Harold J. Greendburg, The First American to Discover Islam, Woking U.K. 1959)

মুসলমানেরাই যে প্রথম ক্যাম্পাস সার্থক ও সফলভাবে ব্যবহার করে তার স্বীকৃতিও পাওয়া যায় অন্যান্য অমুসলিম ঐতিহাসিকদের রচনা মাধ্যমে। Hitti উল্লেখ করেন,

"An important invention connected with this maritime activity of the Crusader is the compass. The Chiness were probably the first to discover the directive property of the magnetic needle, but the Moslems, who very early carried on lively trade between the presian Gulf and Far Eastern waters, were the first to make practical use of that discovery by applying the needs to navigation. The application must have taken place in the eleventh century, if not earlier, but for commercial reasons was kept secret". (P.K Hitti, History of the Arabs, London. Tenth edition, 1972, Page 669).

জর্জ সার্টনের ভাষায় ঃ

The Chinese were the first to perceive the directive property of the magnetic needle, but they failed to apply it to any rational purpose.

"Muslim sailors were probably the first to apply the directive property of a magnetic needle to navigational purposes, and as far as we can know, that anonymus invention was made toward the end of the eleventh century." [George Sarton, Ibid, Vol. I, 1927, Page- 741]

পন্ডিত জওহরলাল নেহরুও তাঁর "Glimpses of World History" গ্রন্থে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেন,

"They (the Arabs) made the first telescope and the mariner's compass." (Pundit Jawaharlal Nehru, Glimpses of World History, London, 1945 1945, Third edition, page 151).

ইসলামের নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর বিরুদ্ধে বিষোদগার করলেও, এইচ জি ওয়েলস বিজ্ঞানের বিভিন্ন অঙ্গনে

মুসলমানদের অবিস্মরনীয় সাফল্যের কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর ভাষায় ঃ "In manufactures they outdid the world in variety and beauty of design perfection of workmanship. They worked in all the metals- gold, silver, copper, bronze, iron and steel. In textile fabrics they have never been surpassed. They made glass and pottery of the finest quality. They knew the secrets of dyeing, and they manufactured paper. (H.G. Wells, the Outline of History, Page- 632).

হিট্টী আরও বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে বর্ণনা প্রদান করেন,

"..... the local manufacture of writing-paper is one of the most benefical contributions of Islam to Europe. Without paper, Printing from movable type, which was invented in Germany about the middle of the fifteenth century, would not have been successful, and without paper and, printing popular education in Europe, on the scale to which it developed, would, not have been feasible, From Morocco, into which the manufacture of paper was introduced from the East, the industry passed into Spain in the middle of the twelfth century. A philological reminder of the historical fact is English "ream" which is derived through Old French rayme from spanich resma, a loan-word from Arabic rizonah, a bundle. After Spain the art of paper- making was established in Italy (ca. 1268-76), also as a result of Moslem influence, presumably from Sicily. France owed its first paper-mills to Spain, and not to returning Crusaders as claimed by some. (P.K Hitti, History of the Arabs, Tenth edition, Page- 564.)

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে উদ্ভাসিত মুসলমানদের বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবদান এতই সুবিস্তৃত, বহুশাখা ও সুদূরপ্রসারী ছিল যে, ইউরোপের একটি যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের দরুন ইউরোপের সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে যায় বলে ঐতিহাসিকবৃন্দ অভিমত প্রকাশ করেন। এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয় ৭৩২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে অর্থাৎ ১১৬ হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে। এটি ইতিহাসে 'পয়টিয়ারস- এর যুদ্ধ' (Battle of Poitiers) বলে চিহ্নিত। অনেকে এটি 'ট্যুরস- এর যুদ্ধ' (Battle of Tours) নামেও অভিহিত করেন। ফ্রান্সের পয়টিয়ারস ও ট্যুরস এর মধ্যবর্তী একটি স্থানে সংঘটিত এই যুদ্ধে বিখ্যাত সেনানায়ক আবদুর রহমানের নেতৃত্বে মুসলমানরো বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েও পরিশেষে দুঃখজনকভাবে পরাজয় বরণ করে চার্লস মার্টেলের নেতৃত্বাধীন খৃষ্টান ও অন্যান্য অমুসলিমদের সম্মিলিত সৈন্যবাহিনীর কাছে।

ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, এই ঐতিহাসিক যুদ্ধে পরাজয় বরণ না করলে মুসলমানেরা অতি সহজেই সমগ্র ইউরোপ দখল করে নিতে পারতো। ফলশ্রুতিতে তাদের মাধ্যমে অন্ধকারাচ্ছন্ন তদানীন্তন ইউরোপের সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি নিঃসন্দেহে ত্বরান্বিত হত। পন্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁর Gimpses of world History গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ

"On the plains of Tours the Arabs lost the empire of the world when almost in their grasp" (Punsit Jawaharlal Nehru, ibid, Page- 146)

এই যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় না হলে,তাঁর অভিমতে, খৃস্টধর্মের পরিবর্তে ইসলামই হতো ইউরোপের ধর্ম এবং সর্বপ্রকার মঙ্গলময় পরিবর্তন সাধিত হত। "Instead of Christianity Islam would then have become the religion of Europe and all manner of other changes might have taken place. "(Pundit Jawaharlal Nehru, ibid, Page- 146)

এডওয়ার্ড ক্রীসী তাঁর "The Fifteen Decisive Battles of the World' শিরোনামীয় গ্রন্থে পয়টিয়ারস এর যুদ্ধকে ইতিহাসে সংঘটিত ১৫ টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের অন্যতম বলে পরিচিহ্নিত করেছেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন জ্যাক আনাতোল ফ্রঁস Jacques Anatola France) তাঁর বিশ্বনন্দিত La Vie en Fleur গ্রন্থে তিনি এ মর্মে দাবী করেছেন যে, ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা মর্মন্তুদ ঘটনা এই পয়টিয়ারস এর যুদ্ধ শুধুমাত্র মুসলমানদের পরাজয় ছিল না। এ যুদ্ধে পরাজয় হয়েছিল অসভ্যতা ও বর্বরতার নিকট বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও সভ্যতার। তাঁর অনুপম ভাষায় ঃ "The most tragic event in history is that of the Battle of Tours when the science, art and civilization of Arabia fell back before the bararism of the Franks."

জর্জ সার্টনের একটি অমর উদ্ধৃতি মাধ্যমেই এ নিবন্ধের সমাপ্তি ঘটবে। কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শালোকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে কারও মনে সন্দেহ থাকলে, সার্টন বলেছেন, "কয়েকটিমাত্র নাম উল্লেখ করে দিও। তাদের সকল প্রতিবাদ স্তব্ধ হয়ে যাবে, সকল সন্দেহের নিরসন ঘটবে। আর সেই নামগুলি হচ্ছে ঃ জাবির ইবনে হাইয়ান, আল কিন্দি, আল খোয়ারিজমী, আল ফারগানী, আর রাজী সাবিত ইবনে দুররা, আল বাতানী, হুনাইন ইবনে ইসহাক, আল ফারাবী, ইব্রাহিম ইবনে সিনান, আল মাসুদী, আবুল ওয়াফা, আবুল কাশেম, আল বিরুণী, ইবনে সিনা, ইবনে ইউসুফ, ইবনে হিশাম, আলখারকী, আল যারকালী ও ওমর খৈয়াম। বিজ্ঞান গগনে এই অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কসমূহের আবির্ভাব ঘটে মাত্র ৩৫০ বৎসরের পরিসরে। ৭৫০ থেকে ১১০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে"।

সাবেক মহাপরিচালক
ইসলামী ফাউন্ডেশন
বাংলাদেশ।

চট্টগ্রামের বৌদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য

ভারতীয় উপমহাদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থল চট্টগ্রাম। এখানকার বৌদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য অতি সুপ্রাচীন কালের। সুস্পা কাহ্নপো লিখিত 'পাগসাম-জোন-জন সূত্রে জানা যায় যে, চট্টগ্রামের আদি নাম ছিল 'জালনধারা'। পরবর্তীতে জলন্দর রূপ প্রাপ্ত হয়। এর অর্থ তপ্ত জল সমন্বিত অঞ্চল। সম্ভবত এখানকার ভূগর্ভ থেকে নিঃসৃত উষ্ণ জলের প্রস্রবনধারা দেখে এ নামের উৎপত্তি। (সীতাকুন্ড পর্বতের বাড়বকুন্ড, কুমারীকুন্ড, লবণাক্ষ প্রভৃতি কুন্ড থেকে আজো উষ্ণ জলের প্রস্রবনধারা প্রবাহিত হয়।) সিন্ধু দেশীয় বৌদ্ধ বালপাদ এখানে কিছুকাল বাস করে সাধনা করেছিলেন বলে জালন্ধরী পাদ নামে খ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর অপর নাম হাড়িফা। তিনি ঝাড়ুদার হাড়ির কাজ করেছিলেন বলে এই নামেও পরিচিত ছিলেন।

সুপ্রাচীন কাল থেকে খিষ্ট্রীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যবর্তী কালের চট্টগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। সম্ভবত তখন এখানে অরণ্যচারী আদিম জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। আরাকানের প্রাচীন রাজাদের ইতিহাস রাজোয়াং সূত্রে জানা যায় যে ১৪৬ খ্রিষ্টাব্দে মগধের চন্দ্রসূর্য নামক একজন সামন্ত সৈন্য-সেনা নিয়ে আদিম জড়োপাসক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত ও পশ্চাদপদ অঞ্চল চট্টগ্রাম আরাকান অধিকার করেন। এবং তিনি সেখানকার রাজা হন। তাঁর সঙ্গে আগত মগধের হিন্দু- বৌদ্ধ সেনারা সেখানে, হিন্দু- বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। তিনি আরাকন মহামুনী বুদ্ধ মন্দির ও মূর্তি স্থাপন করেন। তখন থেকে খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতক অবধি চট্টগ্রাম ও আরাকান একটি অখন্ড রাজ্য রূপে আরাকানের চন্দ্রসূর্য রাজবংশের রাজাদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল। ষষ্ঠ শতকে চট্টগ্রাম সমতটের খড়গ রাজবংশের বৌদ্ধ রাজাদের শাসনাধীনে ছিল। সপ্তম শতকে চট্টগ্রাম সমতটের বৌদ্ধদের রাজবংশের রাজাদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল। অষ্টম শতকের প্রথমার্ধে চট্টগ্রাম আরাকানের রাজাদের অধীনে ছিল। অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে চট্টগ্রাম পাল সাম্রাজ্যভূক্ত হয়। আরব ভৌগলিক সুলায়মান য(৮৬১ খ্রি.) খুরদাদ বেহ (৯২২ খ্রি.), আল মাসুদী (৯৫৬ খ্রি.) প্রমূখের লিখিত বিবরণ অনুসরনে ডক্টর হোদীওয়ালা ৫ ও ডক্টর আহমদ হাসান দানী ৬ বলেন যে, গুজ্জর (JURZ) প্রতিহাররাজ ও দাক্ষিণাত্যের বল্লভ রায় (BALHR) এর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ধর্মপালের (৭৭০-৮১০ খ্রি.) রাজত্ব কালে চট্টগ্রাম পাল সাম্রাজ্যভূক্ত ছিল। রাজা ধর্মপাল শাসিত বাংলার দক্ষিণ- পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলের রাজধানী ছিল রাহমী বা রাহমা, বৃহত্তর চট্টগ্রামের রামু। পাল রাজাদের তাম্রশাসন বর্ণিত তাঁদের 'সমুদ্রকুল উদ্ভূত' উক্তি থেকে আধুনিক গবেষকদের অভিমত যে, বৃহত্তর চট্টগ্রামের বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী রামু অঞ্চলেই বাংলার পালরাজ বংশের উৎপত্তি। নবম শতকে বৃহত্তর চট্টগ্রাম নোয়াখালী ও কুমিল্লা জেলা নিয়ে গঠিত হরিকেল রাজ্যভূক্ত ছিল। হরিকেলের রাজধানী 'বর্ধমানপুর' এ উৎকীর্ণ রাজা কান্দিদেবের তাম্রশাসনটি আবিস্কৃত হয়েছিল পটিয়া থানার 'বড়উঠান' অঞ্চলে।

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক বলেন, এই বর্ধমানপুর পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান অভিন্ন। ডক্টর সুনীতিভূষন কানুনগো বলেন, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান হরিকেলেরর রাজধানী বর্ধমানপুর হতে পারে না। কারণ ইউ-হে নামক একজন চৈনিক ভ্রমনকারী হরিকেল রাজ্যের অবস্থান সম্পর্কে বলেন, হরিকেল রাজ্য সিংহল থেকে সমুদ্র পথে তিরিশ দিনের পথে এবং নালন্দা থেকে একশত যোজন বা আটশত মাইল দূরে অবস্থিত। ইউ-হের বর্ণনা মতে হরিকেল সমুদ্র তীরবর্তী রাজ্য ছিল ও নালন্দা থেকে আটশত মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। রাজা কান্তিদেবের তাম্রশাসনের প্রাপ্তিস্থান বড়উঠান বঙ্গোপসাগরের দুতিন মাইলের মধ্যেও বর্ণিত নালন্দার আটশত মাইল দূরত্বের সাথে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কমিল্লার সামগ্রিক ভূখন্ডের পরিমাপ মিলে যায় মোটামুটিভাবে। সুতরাং আমাদের মতে সম্ভবত এই বড়উঠানেই হরিকেলের রাজা কান্তি দেবের রাজধানী অবস্থিত ছিল। বড়উঠান বর্ধমানপুরের বিকৃত রূপ।[১০]

১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে উক্ত বড়উঠান গ্রামের পাঁচ মাইল দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত আনোয়ারা উপজেলার 'ঝিয়রী' গ্রামের সহর আলী বাড়ি তৈরি করার জন্য ভিটির মাটি কাটার সময় ছেষট্টিটি পিতলের তৈরি বুদ্ধমূর্তি আবিস্কৃত হয়। লোকমুখে এ সংবাদ জেনে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজের পালি ভাষার তৎকালীন অধ্যাপক ধর্মবংশ মহাথেরো দীপংকর নামক একজন ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে ঝিয়রী গ্রামের সহর আলী বলীর বাড়িতে যান এবং তাঁকে প্রাপ্ত মুর্তিগুলো চট্টগ্রাম শহরের বৌদ্ধ বিহারে সংরক্ষিত করার জন্য দান করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সহর আলী বলী দিতে অস্বীকার করেন। তখন অধ্যাপক ধর্মবংশ শহরে ফিরে এসে এই মুর্তি আবিস্কারের সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশ করে দেন। সে বছর এপ্রিল মাসে এ সংবাদ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি চট্টগ্রামের কালেক্টারের কাছে উক্ত প্রত্ন-স্পদ আইনবলে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি সহর আলী বলীর কাছ থেকে মুর্তিগুলো উদ্ধার করে চট্টগ্রাম ট্রেজারিতে নিয়ে আসেন এবং পরবর্তীতে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কার্যালয় কলিকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই ছেষট্টিটি মুর্তির মধ্যে উনষাটটি কলিকাতা যাদুঘরে, পাঁচটি কলিকাতার আশুতোষ সংগ্রহালয়ে ও দুটি বোম্বের ভিকটোরিয়া আলবার্ট সংগ্রহালয়ে সংরক্ষিত রয়েছে। মুর্তি বিশেষজ্ঞ অশোক ভট্টাচার্য্যের মতে,ঝিয়রীর মহাযান ও তন্ত্রযান ধারায় তৈরি বুদ্ধ মুর্তিগুলোকে ছয় ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা উপবিষ্ট ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বুদ্ধমূর্তি, দন্ডায়মান ও অভয় ব্যাখ্যান মুদ্রায়, মৈত্রেয় ও লোকেশ্বরসহ বুদ্ধমূর্তি, পদ্মপানি, লোকেশ্বর, মঞ্জুশ্রী, বসুধারা, চুন্ডামূর্তি, ছত্র সহ স্তুপ ও মহাবোধি মন্দিরের প্রতিমূর্তি। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে একদা চট্টগ্রাম ছিল ভারত ও দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধ জ্ঞানচর্চার সংযোগস্থল। এই মুর্তিগুলি নবম শতকে নির্মিত হয়েছিল।[১১] ১১ সুতরাং অনুমান করা যায় যে,

হরিকেলরাজ কান্তিদেবের রাজত্বকালে রাজধানী বর্ধমান পুরে (বড়উঠানে) এই মূর্তিগুলি নির্মিত হয়েছিল। চট্টগ্রামে বৌদ্ধ রাজত্ব অবসানের পর স্থানীয় বৌদ্ধ অধিবাসীরা লুণ্ঠন বা ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এই মূর্তিগুলো বড়উঠানের কিছুটা দুরবর্তী স্থান ঝিয়রী গ্রামে কোনো বিশেষ স্থানে মাটির নিচে লুকিয়ে রেখেছিল। পরবর্তীকালে হয়ত তারা অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হওয়ায় মূর্তিগুলো সেখানে থেকে যায়। তারপর কালক্রমে সেখানে বাস্তভিটা নির্মিত হয়েছিল।

বড়উঠানের দেয়াঙ্গ পাহাড়ের বিশ্বমূড়ার 'বিসম রাজার' বাড়ির ধ্বংসস্তুপে মাটি খুঁড়ে ইট সংগ্রহ কালে আজো মাঝেমধ্যে বিভিন্ন ধরনের বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়। [১২]

দশম শতকের প্রথমার্ধে চট্টগ্রাম পট্টিকারার চন্দ্রবংশের রাজাদের শাসনাধীনে ছিল এবং পাট্টিকারার চন্দ্র রাজবংশের সাথে আরাকানের চন্দ্রবংশের রাজাদের জ্ঞাতিসম্পর্ক ছিল। প্রচলিত মত এই যে, মহাবীর আরাকানের চন্দ্র রাজবংশের উৎখাত করলে ঐ বংশের একটি শাখা পাট্টিকারায় রাজ্য গঠন করে রাজত্ব করতে থাকেন। এই সম্পর্ক স্বীকার করার প্রধান কারণ এই যে, পাট্টিকারার চন্দ্রদের উৎকীর্ণ মুদ্রায় আরাকানের চন্দ্রদের মুদ্রার বিশেষভাবে মিল দেখা যায়। তাছাড়া পাট্টিকারার চন্দ্রদের সাথে আরাকানের চন্দ্র রাজবংশের বৈবাহিক সম্পর্কেরও বিবরণ পাওয়া যায়। ১৩ পাট্টিকারার চন্দ্র বংশের শাসনকালে চট্টগ্রামে পন্ডিতবিহার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। তিব্বত বিশেষজ্ঞ পন্ডিত শরচ্চন্দ্র দাস লামা তারানাথের তিব্বতী গ্রন্থ থেকে পন্ডিতবিহার সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেন। তৎকালীন চট্টগ্রামের পন্ডিতবিহার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল পূর্ববঙ্গে মহাযান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ক শিক্ষা ও ধর্ম প্রচারের প্রধান কেন্দ্র। পন্ডিতবিহারের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন পটিয়া উপজেলার চক্রশালা নিবাসী ব্রাহ্মণ সন্তান তিলপাদ। এই তিলপাদ নামের উৎপত্তি সম্পর্কে জানা যায় যে, তাঁর হিন্দু জীবনের যোগসাধন সঙ্গিনী তিল পিষে জীবন ধারণ করতেন বলে তিনি তিলপাদ নাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মহাযান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করার পর প্রজ্ঞাভদ্র নাম গ্রহন করেছিলেন। পরবর্তীকালে প্রজ্ঞাভদ্র পন্ডিতবিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেখানকার বৌদ্ধ পন্ডিতদের প্রধান কাজ ছিল মহাযান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধদের পূজার জন্য অসংখ্য বৌদ্ধ দেবদেবীর কল্পনা করা, তাঁদের মন্ডল আঁকা ও স্তব স্তোত্র, ধরণী মন্ত্র এবং তাদের টীকা-টিপ্পনী সমেত গ্রন্থ রচনা করা। পন্ডিতবিহারের অধ্যক্ষ প্রজ্ঞাভদ্র সংস্কৃত ও পালি মিশ্রিত ভাষায় নিম্নলিখিত ছয়খানি গ্রন্থ রচনা করেন :

১. শ্রী সহজ শম্বরস্বাধীষ্টান ২. অচিন্ত্য মহামুদ্রনাম ৩. তত্ত্ব চতুরোপদেশ প্রসন্নদীপ ৪. দোহা কোষ ৫. ষড় ধর্মপোদেশ ৬. মহা মন্ত্রোপদেশ। উল্লেখ্য যে, প্রজ্ঞাভদ্র রচিত তিনটি গ্রন্থে এমন কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ দেখা যায় তাতে তাঁর জন্মস্থান সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। তাঁর রচিত শ্রীসহজ শম্বরস্বাধীষ্টান গ্রন্থে তিলপাদ ও প্রজ্ঞাভদ্র এই দুই নামের উল্লেখ দেখা যায়। তাঁর অচিন্ত্য মহামুদ্রনাম গ্রন্থখানি। 'যশঃপালপুর' নামক একটি জায়গায় লিখিত হয়েছিল। এই স্থান চট্টগ্রামে অবস্থিত না হলে বুঝতে হবে প্রজ্ঞাভদ্র সারা জীবন পন্ডিতবিহারে কাটান নি, হয়ত কিছুকাল উক্ত জায়গায় ছিলেন। তত্ত্ব চতুরোপদেশ প্রসন্নদীপ গ্রন্থে তিলপাদকে 'উড্ডীয়ানের লোক বলা হয়েছে। পাগসাম- জোন- জনের মতে উড্ডীয়ান তান্ত্রিক বৌদ্ধদের চারটি পীঠস্থানের অন্যতম বলা হয়েছে। এর অবস্থান নিয়ে প্রচুর মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেউ বলেন উড্ডীয়ান উত্তর- পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে (বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত), কেউ বলেন উড়িষ্যায়, কেউ বলেন আসামে, আর কেউ বলেন চট্টগ্রামে।

পন্ডিতবিহারের অবস্থান নিয়েও পন্ডিতমহলে প্রচুর মতভেদ দেখা যায়। চট্টগ্রাম শহরের আন্দরকিল্লার রঙমহল বা বর্তমান জেনারেল হাসপাতাল পাহাড়, পটিয়ার চক্রশালা, সীতাকুন্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়, দেয়াঙ্গ পাহাড়, মিরসরাইর পরাগলপুরে ছুটিখাঁর দিঘির সন্নিকটে পন্ডিতবিহার বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত ছিল বলে পন্ডিতগণ মত প্রকাশ করেন।

৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানরাজ সুলত-ইং-চন্দ্র নিজ রাজ্যের উত্তর সীমান্তবর্তী ভূখন্ডের থুরতন বা সুলতানকে পরাজিত করে কুমিরার কাউনিয়া ছড়ার দক্ষিণ তীর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে একটি বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করত তাতে চিং-তৌং-গৌং (যুদ্ধ করা অনুচিত) বাণী উৎকীর্ণ করে আরাকান ফিরে যান। এই চিং-তৌং-গৌং থেকে চট্টগ্রাম নামের উদ্ভব বলে কোনো কোনো পন্ডিত মনে করেন। [১৫]

১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী (চট্টগ্রামের) দেওয়ানী শাসনের কতৃত্ব লাভ করার পর ইসলামাবাদ বা চট্টগ্রাম শহরের নিকটবর্তী একটি স্থানে তিন হাত দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও গভীর পরিমাপের একটি ইষ্টকবেষ্টিত গুহায় আরাকানি ভাষায় উৎকীর্ণ চান্ডিল্য রাজার রৌপ্যলিপি আবিস্কৃত হয়। চট্টগ্রামের তৎকালীন ইংরেজ শাসনকর্তারা তা কলিকাতায় পাঠিয়ে দেয়। ১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দে স্যার জনশোর (লর্ড টিন মাউথ) লিপিটির মূল আরাকানি পাঠ ছাড়া একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

On the 14th Magha 904 Chandi Lal Raja, by the advice of Bowangari Rouli, who was the director of his studies and devotions and in conformity to the sentiments of twenty eight other Roulis, formed the design of establishing a piace of religious worship for which purpose a cava was dug. and paved with bricks, three cubits in depth and three cubits also in dimetre, in which were deposited one hundred and twenty bronze images of small dimension denomonated Thamudas also, twenty bronze images large than the former, denominated Languda: There was likewise a large image of stone call (Sic) Langudagari with a vessel of Brass, in which were deposited two of the bones of thacur. On a silver plate were inscribed the Hance or the mandates of the deity with that also styled Thumah Chucksowana and Tahma to the study of which twenty eight Rouils devote their time and attention; who having

celebrated the present work of devotion with festivals and rejoicings, erected over the cave a place of religious workship for the magas, in honour of the deity. [১৭]

ইহার পরে বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনী বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে।

এর সারমর্ম হলো : ১৪ মাঘ ৯০৪ সালে চান্ডিল্য রাজা স্বীয় ধর্মগুরু ভাওয়াঙ্গিরী রাউলীর উপদেশে ও তাঁর আটাশ জন রাউলী শিষ্যের সম্মতিক্রমে একটি উপাসানালয় প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করেন। সে উদ্দেশ্যে ৩ হাত দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীর পরিমাপের একটি ইষ্টক বাঁধানো গুহায় রক্ষিত হলো 'তাহমুদাস নামক একশত কুড়িটি পিতলের তৈরি ছোট মূর্তি, মাঝারী আকারের 'লাঙ্গুদা নামক কুড়িটি পিতলের মূর্তি ও একটি বড় আকারের পাথরের তৈরি লাঙ্গুদাগারী মূর্তি ও তার সঙ্গে একটি পিতলের পাত্রে রক্ষিত হয় ঠাকুরের দুটি হাড়, একটি রৌপ্য পাতে হাওকা বা দেবতার অনুশাসনাবলী উৎকীর্ণ করা হয়- থোমহা চাক- সোয়ানা থামহা। এখানে এই উপসনালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল আটাশ জন রাউলী সাধনভজন ও আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে ধর্মানুশীলন করা এবং গুহার উপর স্থাপিত উপাসনালয় মগদের ধর্মাচরণের পবিত্র পীঠস্থান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। অতঃপর বুদ্ধজীবনী উৎকীর্ণ করা হয়।

পন্ডিত শরচ্চন্দ্র দাশ উক্ত লিপির তারিখ মঘী সন ধরে ৯০৪+৬৩৮ = ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দ স্থির করে চান্ডিল্য রাজাকে আরাকানরাজ মিনবিন জবৌক শাহর (১৫৩১-১৫৫৩ খ্রি.) অধিকৃত চট্টগ্রামের সামন্ত রাজা বলে চিহ্নিত করেছেন। ১৮ ডক্টর সুনীতি ভূষণ কানুনগোও এই মত সমর্থন করেন। ১৯ কিন্তু ডক্টর আবদুল করিম বলেন তাঁদের সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। কারণ রাজার নাম উল্লেখ ছাড়া কোনো সামন্ত রাজার লিপি উৎকীর্ণ করার নিয়ম নেই এবং আরাকানি রাজার উৎকীর্ণ লিপিতে মঘীসনের সঙ্গে মঘী মাসের নাম না দিয়ে বাংলা মাঘ মাসের নাম দেওয়াতে চান্ডিল্য রাজা স্থানীয় রাজা বলেই প্রমাণিত হয়। সুতরাং উক্ত রৌপ্যলিপির সনটি শকাব্দ ৯০৪+৭৮= ৯৮২ খ্রিস্টাব্দে। ২০ উল্লেখ্য যে ৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের রাজা ছিলেন সূলত ইং-চন্দ্র। আর ৯৮২ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের রাজা ছিলেন বৈশালীর চন্দ্র রাজবংশের মিউ গোত্রের প্রধান অমাহতু (Amyahtu).

ব্রহ্মদেশের পগারাজ অনরহট ১০৫৭ খ্রিস্টাব্দে উত্তর আরাকান এবং ১০৫৯ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম ও পাট্টিকারা রাজ্য জয় করেন ২১ এবং ব্রহ্মদেশ, আরাকান, চট্টগ্রাম ও পাট্টিকারায় প্রচলিত মহাযান বৌদ্ধ মত উচ্ছেদ করে হীনযান বা থেরবাদ বৌদ্ধমত প্রচার করেন। ২২ পঁগা ও পাট্টিকারা রাজপরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। ২৩ ১২৩০ খ্রিস্টাব্দে সমতটের বৌদ্ধ রাজা দামোদর দেব (১২৩০-১২৫৩ খ্রি.) পাট্টিকারাসহ চট্টগ্রাম জয় করে ১২৫৩ খ্রিষ্টাব্দ অবধি রাজত্ব করেন। ২৪ চট্টগ্রামের ডবলমুরিং থানার রামপুর গ্রামে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে একটি ও ১৯৭৮ সালে সীতাকুন্ড থানার সলিমপুর গ্রামে দুটি, মোট তিনটি রাজা দামোদর দেবের তাম্রশাসন আবিস্কৃত হয়েছে। ২৫ ১২৫৪ খ্রিস্টাব্দে পঁগারাজ পুনরায় চট্টগ্রাম পট্টিকারা অধিকার করেন। কিন্তু দু'বার মোঙ্গল আক্রমণের ফলে পঁগারাজ দুর্বল হয়ে পড়েন। সে সুযোগে শক্তি সঞ্চয় করে পঁগা অধিকৃত উত্তর আরাকানের সামন্ত রাজা মেংদী ১২৮৩ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীন হয়ে যান এবং চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র নদের তীর অবধি ভূভাগ জয় করে আরাকান রাজ্যভূক্ত করেন। ২৬ তখন থেকে ১৩৩৯ খ্রিস্টাব্দ অবধি চট্টগ্রাম আরাকানের শাসনাধীনে ছিল।

উপরোক্ত বিবরণ পাঠ করে জানা যায় যে, ১৪৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৩৯ খ্রিষ্টাব্দ অবধি হাজার অধিক বছর কাল চট্টগ্রাম নিরবিচ্ছিন্নভাবে আরাকান, সমতট, হরিকেল, পাট্টিকারা, পূর্ববঙ্গের চন্দ্র ও ব্রহ্মদেশের পঁগার বৌদ্ধ রাজাদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল। অতঃপর ১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দে সোনারগাঁর সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহর (১৩৩৮-১৩৫ খ্রি.) সেনাপতি কদল খান গাজী আরাকানিদের বিতাড়িত করে চট্টগ্রামকে সর্বপ্রথম মুসলমান শাসনভূক্ত করেন। ২৭ তখন থেকে ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দ অবধি চট্টগ্রাম বাংলার স্বাধীন সুলতান ও আফগান শাসনভূক্ত ছিল তবে আরাকানের ইতিহাস সূত্রে জানা যায় যে, উক্ত সময়েও আরাকানের রাজারা সাময়িক কালের জন্য চট্টগ্রাম কখনো সম্পূর্ণ আর কখনো আংশিক অধিকার করে শাসন করেছিলেন। তারপর ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে আরাকানরাজ মিনফালং সিকান্দার শাহ (১৫৭১-১৫৯৩ খ্রি.) চট্টগ্রামের আফগান সোনানী শাসক জামাল খান পন্নীকে পরাজিত করে সমগ্র চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যভূক্ত করেন। ২৮ তখন থেকে ১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দ অবধি চট্টগ্রাম একাধিক্রমে পঁচাশি বছর কাল আরাকান রাজ্যভূক্ত ছিল। অতঃপর ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে চট্টগ্রামের বৃহদংশ রামু অবধি মোঘল সাম্রাজ্যভূক্ত হয়।

লেখক- চট্টগ্রামের ইতিহাস গবেষক

তথ্যপঞ্জি

১. জে. এ. এস. বি ১৮৯৮. পৃ. ২১, ২৩
২. ইতিহাস ঢাকা, ১৩৭৫ বাং. পৃ. ১৭০-১৭১
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২
৪. জেলা পরিষদ-কুমিল্লার ইতিহাস, ১৯৮৪, পৃ. ৯৭
৫. ডক্টর হোসীওয়ালা স্টাডিজ ইন ইন্ডোমুসলিম হিস্ট্রি, ১৯৩৯, পৃ.৪
৬. প্রসিডিং অফ দ্য হিস্ট্রি কনফারেন্স, করাচি, পাকিস্তান, ১৯৫৯, পৃ. ১৯৮
৭. ইন্ডিয়ান হিস্ট্রিক্যাল কোয়ার্টালি, ভল্যুম ১৬, পৃ. ২৩২-২৩৪
৮. ক) মর্ডান রিভিউ ১৯২২: নভেম্বর, পৃ. ৬১২-৬১৪
খ) ইন্ডিয়ান হিস্ট্রিক্যাল কোয়ার্টালি, ভল্যুম ২, ১৯২৬, পৃ. ৩২২
৯. প্রাগুক্ত, ভল্যুম ১২, ১৯৩৬, পান্ডটীকা, পৃ. ৭৫
১০. ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, ৭/৮ সংখ্যা, ১৩৮৫-১৩৮৬, পৃ. ৭৫
১১. অশোক কে. ভট্টাচার্য ঝিয়রী ব্রোনজ বুদ্ধজ, দেশ গ্রন্থলোক, দেশ, পৃ. ১৯৯০, ১০ নভেম্বর, ৫৮ বর্ষ, ২য় সংখ্যা
১২. আবদুল হক চৌধুরী, চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রসঙ্গ, ১৯৮২, পৃ. ১০৯
১৩. ক) জে.এ.এস.পি ভল্যুম ১,১৯৬১, পৃ.৫,২৬৭-২৭৩
খ) ইতিহাস, ১৩৭৫ পৃ. ১৭২-১৭৩
১৪. নলিনীকান্ত দাস এম.এ পন্ডিতবিহারের তিপাদ (প্রবন্ধ), শারদীয় পাঞ্চজন্য, চট্টগ্রাম, ১৩৪৫ বাং, পৃ. ১২০-১২১
১৫. জি. ই হারভে, আউটলাইন অফ বার্মিজ হিস্ট্রি, পৃ. ১৫
১৬. কক্সবাজার ফাউন্ডেশন, কক্সবাজারের ইতিহাস, ১৯৯০, পৃ. ১২
১৭. এশিয়াটিক রিসার্চেস, ভল্যুম ২, ১৭৯৪, পৃ. ২৯৯-৩০২
১৮. জার্নাল অফ দ্য বুড্ডিষ্ট টেক্সট এন্ড রিসার্চ সোসাইটি ভল্যুম, ১৭, ১৯০৫, পৃ. ৫-৬
১৯. জে. এ. এস. বি ভল্যুম XXI, নং ২, আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ৬৩
২০. কক্সবাজার ফাউন্ডেশন, কক্সবাজারের ইতিহাস, পৃ. ১২
২১. জি.ই হারভে আউটলাইন অফ বার্মিজ হিস্ট্রি, পৃ. ১৫
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
২৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ভল্যুম ২, পৃ. ২৫১-২৫৭
২৫. আবদুর হক চৌধুরী, চট্টগ্রাম-আরাকান, পৃ. ৪৬
২৬. ড. আহমদ শরীফ, ইতিহাস, ঢাকা, ১৩৭৫ বাং, পৃ. ১৭৯
২৭. ড. আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল পৃ. ১৮১
২৮. ডা. সুনীতি ভূষন কানুনগো, এ হিস্ট্রি অফ চিটাগাং, ভল্যুম ১, পৃ. ২০০
২৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ভল্যুম ২পৃ. ৩৮১
৩০. মাহবুব- উল- আলম, চট্টগ্রামের ইতিহাস নবাবী আমল, পৃ. ৬০
৩১. কক্সবাজার জেলা বর্ষপূর্তি স্মারক পুস্তিকা, মার্চ ১৯৮৫

সূত্র- আবদুল হক চৌধুরী স্মারক গ্রন্থ সম্পাদনা- মুহম্মদ সজির উদ্দীন মিয়া তসিকুল ইসলাম।

স্মৃতিতে অমলিন প্রফেসর ড. কে.এম মোহসীন (১৯৩৮-২০২১)

- অধ্যাপক মোঃ মোসলেমউদ্দীন শিকদার

পূর্ব-কথাঃ

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা থেকে বিগত শতবর্ষে বাংলাদেশের সমকালীন রাজনীতিতে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে সেক্ষেত্রে ইতিহাস বিভাগের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পাকিস্তান আন্দোলন, '৫২এর ভাষা আন্দোলন, '৬৯এর গণঅভ্যুত্থান সর্বোপরি ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ভূমিকা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকার মত। উপমহাদেশের বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালিন (১৯৩৭-৪২) উপাচার্য্য ড. আর.সি মজুমদার (১৮৮৮-১৯৮০) সহ বিভাগীয় অনেক শিক্ষক দেশ বিদেশে অনেক সুখ্যাতি ও কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। এই বিভাগের স্বনামধন্য শিক্ষক ও বিশিষ্ট ইতিহাসবেত্তা ড. এম.এ রহিম সাহেবের (মৃত্যু ৩০ জুলাই, ১৯৮১) মৃত্যুর পূর্বেরবছর (১৯৭৫-৮১) অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষনার ফসল ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সর্বপ্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস রচনার ন্যায় গুরুদায়িত্বপালন করেন। এই ইতিহাস বিভাগের অন্যতম কৃতি ছাত্র ড.কে.এম মোহসীন ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দেস্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে বিলেতে পাড়ি জমান এবং ১৯৬৬খ্রীষ্টাব্দে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি অভিসন্দর্ভ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর প্রায় চার দশক অধ্যাপনাকালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণপদে ঈর্ষনীয় সাফল্যের স্বাক্ষর রাখেন। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে ইতিহাস চর্চায় যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ড. কে.এম মোহসিন অন্যতম। বক্ষ্যমান নিবন্ধকার ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে (১৯৬৬-১৯৬৮) ইতিহাস বিভাগে স্নাতকোত্তর শ্রেনীতে ড.কে.এম মোহসীন এর প্রীতিভাজন ছাত্র হিসেবে আলোচ্য মরহুমসহ বিভাগীয় সমকালীন শিক্ষকদের প্রতি সংক্ষেপে নিম্নরূপ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

শতাব্দির ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯২১-২০২১) ইতিহাস বিভাগের সাবেক স্বনামধন্য অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান, কলা অনুষদের ডীন,সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রাধ্যক্ষ, সুপার নিউম্যারারী অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ইতিহাস একাডেমী ঢাকা ও বিশ্ব ইতিহাস পরিষদের (পূর্বাঞ্চল) সাবেক সভাপতি, বাংলা একাডেমি ও এশিয়াটিক সোসাইটির জীবন সদস্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইতিহাসবিদ, লেখক ও গবেষক, বৃহত্তর ফরিদপুরের অন্যতম কৃতি সন্তান অধ্যাপক ড. কে.এম মোহসীন সাহেবের বর্ণাঢ্য জীবন ও কর্মসম্পর্কে অত্র প্রবন্ধে বিশদ বর্ণনার সুযোগ নেই, সামর্থও নেই।২০২১ খ্রীষ্টাব্দের ২২ই ফেব্রুয়ারী এই বরেণ্য ও বর্ষিয়ান শিক্ষাবিদের ইন্তেকালের প্রায় মাস খানেক পূর্বেই তাঁর পরামর্শক্রমে লেখক কর্তৃক বক্ষ্যমান স্মৃতিচারণ প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। শ্রদ্ধেয় স্যারের পরামর্শের মধ্যে এটাও ছিল যে, শুধু তাঁকে নিয়েই নয়, প্রসঙ্গত ইতিহাস বিভাগীয় সমকালীন অন্যান্য শিক্ষকদের নিয়েও যেনো যথাসাধ্য স্মৃতিচারণ করা হয়। প্রয়াত মোহসিন স্যারের পরামর্শক্রমে তাঁর অম্লান স্মৃতিচারণের পাশাপাশি বিভাগীয় অন্যান্য প্রয়াত ও প্রবীন শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন বাহুল্য বিবেচিত হলে প্রবন্ধকার তজ্জন্য দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

ইতিহাস বিভাগের সমকালিন শিক্ষক মন্ডলী ও ড. কে.এম মোহসিনঃ

শতাব্দির ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯২১-২০২১) ইতিহাস বিভাগের সাবেক স্বনামধন্য অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান, কলা অনুষদের ডীন,সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রাধ্যক্ষ, সুপার নিউম্যারারী অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ইতিহাস একাডেমী ঢাকা ও বিশ্ব ইতিহাস পরিষদের (পূর্বাঞ্চল) সাবেক সভাপতি, বাংলা একাডেমি ও এশিয়াটিক সোসাইটির জীবন সদস্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইতিহাসবিদ, লেখক ও গবেষক, বৃহত্তর ফরিদপুরের অন্যতম কৃতি সন্তান অধ্যাপক ড. কে.এম মোহসীন সাহেবের বর্ণাঢ্য জীবন ও কর্মসম্পর্কে অত্র প্রবন্ধে বিশদ বর্ণনার সুযোগ নেই, সামর্থও নেই।

ইতিহাস বিভাগীয় প্রয়াত শিক্ষকদের স্মরণে প্রথমেই মনে পড়ে ড. এম.এ খায়ের (১৯২৯-৭১), বাবু সন্তোষ কুমার ভট্টাচার্য্য (১৯১৫-১৯৭১) ও জনাব গিয়াসউদ্দিন আহমেদের (১৯৩৩-১৯৭১) কথা। যারা ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর, স্বাধীনতার উষালগ্নে কুখ্যাত জল্লাদদের হাতে আরও বহু অধ্যাপক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবিদের সাথে নির্মমভাবে শাহাদাৎ বরণ করেন।

১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ, পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ও তার দোসরদের নৃশংশতা, দেশবাসীর শ্বাসরুদ্ধকর, জীবনযাত্রার তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে সম্ভবত স্বাধীন

বাংলায় প্রকাশিত ১ম গ্রন্থ ইতিহাস বিভাগের তৎকালীন সভাপতি প্রফেসর ড. মফিজ উল্লাহ কবির (১৯২৫-৮৬) প্রণীত, "স্বদেশে পরবাস ঃ অবরুদ্ধ বাংলাদেশে জীবন ১৯৭১" শীর্ষক তাঁর উক্ত গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে কবির স্যারের সহপাঠী প্রফেসর মুনীর চৌধুরী ও ইতিহাস বিভাগের পূর্বে উল্লেখিত প্রয়াত শিক্ষকদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে।[১]

১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ আগষ্ট এক সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রফেসর কবির স্যার (১৯২৫-৮৬) নিহত হলে তাঁর অন্যতম সুযোগ্য সহকর্মী ড.কে.এম মোহসীনের শ্রদ্ধাঞ্জলী এভাবে "জাতীয় জীবনের চারিত্রিক সংকট মূহুর্তে প্রফেসর কবির স্যার মত বিরল চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী, আমরা তাঁর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পথ নির্দেশ পেতাম.....। বিশেষ করে নানা কলুষতার আবর্তে ডুবে যাওয়া এ সমাজে বিবেকের সলতে প্রজ্বলিত রাখার জন্য তাঁর মত ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি অনুভব হয়।[২]

"বিভাগীয় সাবেক সভাপতি, কলা অনুষদের ডীন ও বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ প্রফেসর এবিএম দেলোয়ার হোসেন তাঁর এক দীর্ঘ প্রবন্ধে কবির স্যারের ইতিহাস চর্চার অবদান সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন।[৩]ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রয়াত শিক্ষকদের মধ্যে প্রবীন অধ্যাপক (১৯৫৪-৮৩), বিভাগীয় চেয়ারম্যান, প্রভোষ্ট, প্রক্টর, ডীন, সিনেট, ও সিন্ডিকেট সদস্য জনাব ওদুদুর রহমান (১৯১৮-৯৪), আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইতিহাসবিদ ড. মোহাম্মদ মোহরআলী (১৯৩২-২০০৭)ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকের শিক্ষক উপমহাদেশের অন্যতম প্রাজ্ঞ ইতিহাসবিদ প্রফেসর ড. আব্দুল করিম(১৯২৮-২০০৭) প্রমুখের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। ইতিহাস সমিতির পত্রিকা ২০-২২ সংখ্যায় মরহুম ওদুদুর রহমান সাহেবের উদ্দেশ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় শোক বার্তা উল্লেখিত। উল্লেখ্য ইতিহাস সমিতির এ সংখ্যায় "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসঃ পর্যালোচনা", ড.কে.এম মোহসীন স্যারের একটি সুলিখিত প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে (পৃষ্ঠা-৭০-৮৪)।[৪]ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের তৎকালীন রীডার, প্রাক-স্বাধীনতা কালীন প্রক্টর, পূর্ব পাকিস্তান ইতিহাস সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক (১৯৬৬-৭১) আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইতিহাসবিদ ড. মোহাম্মদ মোহর আলী (১৯৩২-২০০৭) দেশ স্বাধীন হবার প্রশ্নে রাজনৈতিক মতানৈক্যের কারনে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হয়ে দেশত্যাগে বাধ্য হন। মাতৃভূমি ও মুসলিম মিল্লাতের শেকড় সন্ধানী এ ইতিহাসবিদ মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হলেও দেশ ও জাতির প্রতি তাঁর ভালবাসা ও কর্তব্য থেকে চুল পরিমানও বিচ্যুত হননি। ১৯৮৫ সালে তিন খন্ডে সমাপ্ত প্রায় দু'হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত "হিস্টোরি অব দি মুসলিমস অব বেঙ্গল" (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাভুক্তপাঠ্য, রেফারেন্স) শীর্ষক সুবৃহৎ গবেষণা গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য ব্যারিষ্টার ড. আলী দ্বিতীয় নোবেল পুরস্কার খ্যাত মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান আন্তর্জাতিক মানের বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার-২০০০ লাভ করেন।[৫] ২০০৭ সালের ১১ এপ্রিল পূর্ব লন্ডনে এসেক্স বাসভবনে ক্যানসারে আক্রান্ত এই বিশ্বনন্দিত ইতিহাসবিদ ৭৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করায় ইষ্ট লন্ডন মসজিদে এক জনাকীর্ণ সমাবেশে জানাজা শেষে তাঁকে ওখানেই দাফন করা হয়। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে ড. এম.আলী, ড. মোহসীন সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অনেক প্রখ্যাত অধ্যাপকের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও উপমহাদেশের অন্যতম প্রাজ্ঞ ইতিহাসবেত্তা, দেশবরেন্য শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদ হিসেবে বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি কর্তৃক স্বর্ণপদক প্রাপ্ত এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ড. আব্দুল করিম ২০০৭ সালের ২৪ জুলাই চট্টগ্রাম মহানগরীর হিলভিউ আবাসিক এলাকায় ৭৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। উল্লেখ্য, বাংলায় (এমন কি ভারতে) মুসলিম শাসন, ইসলামী ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সফল ও শ্রেষ্ঠ গবেষক ড. আবদুল করিম সাহেবের গবেষণার দীক্ষাগুরু, প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ প্রত্নতত্ত্ববিদ ডা. আহমাদ হাসান দানী (১৯২০-২০০৯) ব্যতীত প্রাক স্বাধীনতাকালে ড. মোহসিন সহ ইতিহাস বিভাগীয় শিক্ষকদের অধিকাংশই বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ইতিহাস বিভাগের ড. আবদুল হালিম, ড. এ.বি.এম হাবীবুল্লাহ, ড. মুহাম্মদ ইসহাক প্রমুখ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পন্ডিত ও ইতিহাসবেত্তাদের ছবক না পেলেও সান্নিধ্য লাভ করেছেন।

১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ আগষ্ট এক সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রফেসর কবির স্যার (১৯২৫-৮৬) নিহত হলে তাঁর অন্যতম সুযোগ্য সহকর্মী ড.কে.এম মোহসীনের শ্রদ্ধাঞ্জলী এভাবে "জাতীয় জীবনের চারিত্রিক সংকট মূহুর্তে প্রফেসর কবিরের মত বিরল চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী, আমরা তাঁর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পথ নির্দেশ পেতাম.....। বিশেষ করে নানা কলুষতার আবর্তে ডুবে যাওয়া এ সমাজে বিবেকের সলতে প্রজ্বলিত রাখার জন্য তাঁর মত ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি অনুভব হয়।

ইতিহাস বিভাগীয় আরোকতিপয় শিক্ষকদের নিয়ে কিঞ্চিৎ স্মৃতিচারণঃ

প্রাক-স্বাধীনতাকালে পারিবারিক এবং আর্থিক সমস্যার দরুন অনার্স কোর্সসহ উচ্চশিক্ষা গ্রহণে সুযোগ না পেলেও শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ পড়তে খুবই স্বাচ্ছন্দ ও গর্ববোধ করতাম। ইতিপূর্বে যেসব প্রয়াত শিক্ষকদের নাম উল্লেখ করেছি তারা ব্যতিত আরও যেসব শিক্ষকের নাম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণযোগ্য তাঁদের মধ্যে শীর্ষ স্থানীয় বিভাগীয় হলেন এককালীন সভাপতি কলা অনুষদের ডীন বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতির প্রাণপুরুষ জাতীয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য্যসহ অসংখ্য কর্মকান্ডের মহানায়ক প্রফেসর ড. আবদুল মমিন চৌধুরী (১৯৪০-২০২৪)। ইতিহাস বিভাগীয় পাঠ্যক্রমে নানাভাবে পরামর্শ ও সহযোগীতাদান ব্যতিত আমার আবাসিক হল তৎকালীন মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ হলে (বর্তমান সূর্যসেন হল), তদারকি থেকে বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা (১৯৭৩)অবধি বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক মমিন স্যার আমাকে গাইড না করলে আমার পক্ষে বিগত প্রায় অর্ধশতকে এদেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত অধিকাংশ ইতিহাস সমিতির সম্মেলন ও সেমিনারে একজন প্রবন্ধকার হিসেবে অংশগ্রহণ করা হয়ত সম্ভবপর হত না।

বিগত ২৫/০২/২০১০ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ক্লাবে লেখকের সহপাঠী ইসলামী শিক্ষা বিভাগীয় অধ্যাপক আব্দুল মালেক (রহঃ) এর (১৯৪৩-২০২১) কনিষ্ঠ কন্যার বিয়ের অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় চৌধুরী স্যার ব্যতীত বেশ কয়েকজন শিক্ষক বন্ধুর সাথে একান্ত ঘরোয়া পরিবেশে সাক্ষাত লাভের বিরল সুযোগ ও সৌভাগ্য ঘটে। শ্রদ্ধেয় চৌধুরী স্যারের সাথে আমার সর্বশেষ সাক্ষাৎকার ঘটে ২০২২ সালের ১১/১২ নভেম্বর ঢাকাস্থ নায়েম ভবনে অনুষ্ঠিত ইতিহাস সমিতির ২০তম দ্বি-বার্ষিক জাতীয় সম্মেলনে। ইতিহাস চর্চায় অসাধারণ অবদানের জন্য ইতিহাস সমিতি; ইতিহাস একাডেমী, ঢাকা ইত্যাদি সংস্থা কর্তৃক স্বর্ণপদক প্রাপ্ত প্রাজ্ঞ ইতিহাসবিদ মমিন স্যারের সভাপতিত্বে ১২ নভেম্বর অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে আমার প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল আমাদের একান্ত প্রিয়ভাজন শিক্ষক মহসিন স্যারের জীবন ও ইতিহাস রচনা সম্পর্কিত স্মৃতিচারণ।

অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম, প্রফেসর ড.শরীফ উদ্দিন আহম্মদ ও প্রফেসর ড. এবিএম মাহমুদ, প্রমুখের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। অত্যন্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক হিসেবে সব স্যারদের আচরণ ও পাঠদান পদ্ধতি খুবই আকর্ষনীয় ও স্মরণীয় বটে। তবে মোহসীন স্যারের ব্যাপারটা ছিল নানা কারণে স্বতন্ত্র। স্যারের টিউটোরিয়াল গ্রুপের শিক্ষার্থী হিসেবে প্রায়ই তাঁর ব্যক্তিগত চেম্বারে বিশেষ পাঠ গ্রহণ ও স্বাক্ষাৎকারের সুযোগ নিতাম। কিন্তু একটা ব্যাপারে পাঠ্য অবস্থায় স্যারকে হতাশ করার জন্য আমি লজ্জিত ও ক্ষতিগ্রস্ত বটে। বিভাগীয় একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় এম.এ প্রথম পর্বের ফলাফলের ভিত্তিতে ফাইনালে আর কেউ না হলেও, স্যার আমার কাছে প্রথম শ্রেণির ফলাফল প্রত্যাশা করেছিলেন। পরীক্ষার বেশ আগেই স্যার আমাকে এভাবে সতর্ক সংকেত দিলেন "মোসলেম, আমি কিন্তু কথা দিয়েছি, ডোন্ট ডিসঅ্যাপয়েন্ট মি" কিন্তু এতদিন পরে আর ব্যর্থতার কারন দর্শিয়ে তথা কৈফিয়ত পেশ করে লাভ নেই। উল্লেখ্য, ঐ বছর (১৯৬৮) আমাদের বি গ্রুপ কেন, চারগ্রুপের মধ্যে একমাত্র ডি গ্রুপ থেকে সহপাঠী আপা জাহান আরা ওবায়েদুল্লাহ (পরবর্তীকালে ইতিহাস বিভাগীয় অধ্যাপক জাহান আরা হক চৌধুরী) ব্যতিত, ইতিহাস বিভাগে এম. এ ফাইনাল পরীক্ষায় আর কোন ছাত্র ছাত্রী ফাস্ট ক্লাস পাননি। পরবর্তী বছর (১৯৬৯) প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্তদের মধ্যে আমাদের 'বরিশাইল্যা জামাই' বন্ধুবর সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের কথা বেশ মনে আছে।

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের সেতু বন্ধন- বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতিও ইতিহাস একাডেমী ঢাকা ঃ

১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্রজীবন শেষ করে ১৯৬৯ সাল থেকে বরিশালে একটা ডিগ্রি কলেজে ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনায় নিয়োজিত থেকে মমিন চৌধুরী স্যার, মোহসীন স্যার সহ শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের সাথে অদ্যাবধি যে সেতুবন্ধনের মাধ্যমে আমাদের "গুরু-শিষ্য" সম্পর্ক বহাল রয়েছে এক হিসেবে তার নাম বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি এবং ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ইতিহাস একাডেমি ঢাকা।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই পূর্নগঠিত বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতির ২৫ সদস্য বিশিষ্ট প্রথম কার্যকরী কমিটিতে (১৯৭৩-৭৪) সম্মানীত স্যারদের সাথে সংযুক্ত থাকতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান বোধ করেছি। আমি নিজেকে আরো ভাগ্যবান বোধ করছি এজন্য যে ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ইতিহাস সমিতি গঠন কালে বিভাগীয় ছাত্র হিসেবে আমি ছিলাম পর্যবেক্ষক ও ১৯৭৩ সালে সমিতির পূনর্গঠনকালে আমি কার্যকরী পরিষদভুক্ত হবার সুযোগ লাভ করি। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমিতির প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সম্মেলনে মোহসীন স্যারের প্রবন্ধের বিষয় ছিল "বাঙালির রাষ্ট্র চিন্তা ১৯৪০-৪৭"আর তার সুপ্রিয় ছাত্রের প্রবন্ধের বিষয় ছিল "বাকেরগঞ্জ জেলার পুরাকীর্তি"।[৬] একই বছরে নভেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের অনুষ্ঠিত শেরে বাংলার জন্মশত বার্ষিকী (১৮৭৩-১৯৭৩) আন্তর্জাতিক সেমিনারে আমার প্রবন্ধের বিষয় ছিল,?যুক্তবাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় এ.কে. ফজলুল হকের ভূমিকা (১৯০৫-১৯৫০)"। তিনদিন ব্যাপি উক্ত আন্তর্জাতিক মানের সেমিনারে চারজন ভারতীয়সহ দেশী বিদেশী মোট ১১জন প্রবন্ধকারের মধ্যে আমার প্রবন্ধ উপস্থাপনের সুযোগ লাভের কৃতিত্ব আল্লাহর রহমতে মমিন চৌধুরী ও মোহসিন স্যার এর, যারা আমাকে যথাসম্ভব গাইড করেছেন।[৬]অতঃপর জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল, সিলেট, দিনাজপুর, কুমিল্লা, খুলনা, বগুড়া প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত সেমিনার ও সম্মেলন সমূহে মোহসীন স্যার সহ অন্যান্য স্যারদের সাথে এমনভাবে স্বাক্ষাৎকার সংগঠিত হত যেন একান্ত আপনজনের বার্ষিক মিলনমেলা। এই মিলনমেলায় সিনিয়র আর জুনিয়র, নবীন প্রবীনরা, যেন সব একাকার হয়ে যেতাম। মোহসীন স্যারের ঘনিষ্ঠ বাল্যবন্ধু, ভাঙ্গা কলেজের অধ্যক্ষ, মরহুম গুলজার ভাই, প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ভাই, প্রফেসর ড. এ.বি.এম দেলোয়ার হোসেন, অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ, প্রফেসর ড. শরীফ উল্লাহ ভূইয়া, প্রফেসর ড. নুরুল হুদা আবুল মুনসুর, প্রফেসর জাহেদা আপা, প্রফেসর ডালিয়া আপা,প্রফেসর খোদেজা আপা, প্রয়াত ড. রতন লাল চক্রবর্তী, অধ্যাপক মোহাম্মদ শাহ প্রমুখের কথা স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে মাঝে মধ্যে প্রেরণা যোগায়।

কিন্তু পরকালীন স্থায়ীজীবনে এঁদের সাথে পুনর্মিলনে আমি ভীত-শংকিত।

একজন প্রচার বিমুখ গবেষক ও আদর্শ সংগঠক ঃ

আমার পরম সৌভাগ্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের একজন অখ্যাত ছাত্র হয়েও বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি ও ইতিহাস একাডেমির প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে আমি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের সাথে জীবন সদস্য হিসেবে এ পর্যন্ত সমিতিতে খানিকটা সংযুক্ত থাকতে পেরেছি। ইতিহাস সমিতির একজন বড় মাপের কর্মকতা হয়েও মোহসিন স্যার ইতিহাস একাডেমি, ঢাকার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং তিনি আমার ন্যায় অনেককে ইতিহাস একাডেমীর জীবন সদস্য হতে উৎসাহিত করেন।

২০০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইতিহাস একাডেমীর প্রতিষ্ঠা অবধি প্রায় প্রতিবছর একাডেমীর সেমিনার ও সম্মেলনে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক প্রফেসর ড. সামিনা সুলতানা, প্রফেসর ড. শরীফ উদ্দীন আহমদ, ড. নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, ড. নাজমা খান মজলিস, ড. এ.কে.এম শাহনেওয়াজ, প্রফেসর ড. সৈয়দা শায়লা তায়েফ, অধ্যাপক মিলি রহমান, বিশিষ্ট আমলা রোকন-উদ-দৌলা, ড. মোঃ শাহিনুর রশীদ, ড. এস.এম মুস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক মিলি রহমান প্রমুখের সাথে পুনর্মিলনেও আনন্দ পেয়ে থাকি।বর্তমান শতকের উষালগ্নে এমনকি গত শতকের শেষদিকে জগন্নাথ কলেজে (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়) ইতিহাস বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক ড. সামিনা সুলতানা ইতিহাস একাডেমি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার ইতিহাস অনুরাগীদের নিয়ে আরো ব্যপকভাবে ইতিহাস চর্চা ও গবেষণার যে স্বপ্ন লালন করতেন মরহুম ড. কে.এম মোহসিন স্যারের ন্যায় একজন উঁচু মানের ও উদার মনের ইতিহাস স্কলার তথা জ্ঞানতাপসের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অপূর্ব সাংগঠনিক দক্ষতার সমন্বয়ে অনধিক দেড় যুগের মধ্যে (২০০৫-২১) ইতিহাস একাডেমি, ঢাকা একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। স্যার ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ জ্ঞানের অন্বেষী ও গ্রন্থকীট। বরিশাল অঞ্চলে আমার ন্যায় একজন শেরেবাংলা ভক্ত কবি এ.কে জয়নুল আবেদীন সংকলিত 'মেমোরেবল স্পিসেস অব শেরে বাংলা' শীর্ষক বইটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনুবাদ করতে গেলে তার মূল বইটি আমার কাছে চাইলেন,বইটা দূর্লভ হলেও তা আমি স্যারকে দিতে পারায় নিজেকে কৃতার্থ বোধ করেছি।

উল্লেখ করা যেতে পারে,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ও বিশিষ্ট গবেষক ড. সিরাজুল ইসলাম স্যারের Fazlul Haque Speaks in Councilশীর্ষক গ্রন্থটি বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি কর্তৃক ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশনায় প্রবন্ধকারকে শের-ই-বাংলা এ.কে ফজলুল হক সম্পর্কে লেখালেখিতে আরো প্রেরণা যোগায়। আর শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ড. মফিজুল্লাহ কবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য্য থাকা অবস্থায় ০৪/০৭/১৯৭৭ইং উক্ত গ্রন্থের (Memorable Speeches of Sher-e-Bangla) অভিমত(preface)লিখে দিয়েছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে ড.কে.এম মোহসীন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করে গবেষনা, অধ্যয়ন ও বক্তৃতা প্রদান উপলক্ষ্যে বৃটেন, ভারত, জাপান ইত্যাদি ২৩টি দেশে গমন করেন এবং ৩০টির উপর তাঁর গবেষনামূলক প্রবন্ধ দেশী-বিদেশী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানের জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বাংলা একাডেমীর জীবন সদস্য ছিলেন এবং আমাকে নিয়ে ২০০৮-০৯ সালে বাংলা একাডেমীর পক্ষে ?এ.কে ফজলুল হকের জীবন ও কর্ম" সম্পর্কে একটি পান্ডুলিপি প্রায় আধাআধি সম্পন্ন করে বিশেষ কারণ বশতঃ উহা স্থগিত রাখা হয়। দুঃখজনক স্যারের শোকার্ত পরিবার উক্ত অসমাপ্ত পান্ডুলিপিটি আমাকে দিতে পারেনি। পড়ন্ত বয়সেও স্যার একজন তরুন গবেষকের ন্যায় বহুবিধ গ্রন্থ অধ্যয়নের পাশাপাশি সমকালীন পত্র-পত্রিকা পাঠে অভ্যস্ত ছিলেন। অনধিক এক যুগের মধ্যে (২০০৫-১৬) ইতিহাস অনুরাগী ও দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গবেষনা পত্রিকা মাসিক ইতিহাস অন্বেষা ও উহার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও প্রকাশক অধ্যাপক এস.এম নজরুল ইসলাম প্রণীত এক ডজনের অধিক গ্রন্থাবলীর তিনি নিয়মিত পাঠক ছিলেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ও প্রবীন ভাষাসৈনিক অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের (১৯২৫-২০১৪) আত্মকাহিনী "জীবনে যা দেখলাম" তার ৮টি খন্ডই স্যার সাগ্রহে সংগ্রহ করেছেন। শ্রদ্ধেয় স্যারের পারিবারিক গ্রন্থাগারে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত জ্ঞান গবেষনামূলক বিশাল গ্রন্থরাজী সম্পূর্ণ না হলেও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ উত্তরাস্থ বিআইআইটি এবং স্থানীয় মসজিদ পাঠাগারে দান করা হলে স্যারের পরকালীন নাজাতের জন্য ছদকায়ে জারীয়া হিসেবে 'অসীলা' হতে পারে। এদিকে মরহুমের উত্তরাধিকারীদের সবিনয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

নীতি নৈতিকতার প্রশ্নে তিনি অত্যন্ত কঠোর ও আপোষহীন ছিলেন বিধায় তাঁর কোন কোন বন্ধুমহলে তিনি হয়তো অপ্রিয়ভাজন ও সমালোচিত হয়ে থাকবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন

নীতি নৈতিকতার প্রশ্নে তিনি অত্যন্ত কঠোর ও আপোষহীন ছিলেন বিধায় তাঁর কোন কোন বন্ধুমহলে তিনি হয়তো অপ্রিয়ভাজন ও সমালোচিত হয়ে থাকবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে তিনি কতটা জনপ্রিয় ছিলেন যে, তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর শোকসংবাদ পেয়ে দেশে-বিদেশে অবস্থানরত অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী ব্যতীত পরে বহুমুখি কর্মব্যস্ততা নিয়ে বাংলাদেশের ***মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা****, স্যারের একমাত্র পুত্র ওমির কাছে শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের প্রশংসা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সহানুভূতি জানিয়েছেন বলে প্রকাশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ ২০২৪ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিকে প্রবীণ শিক্ষক মমিন চৌধুরীর স্যারের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের সাথে মহসিন স্যার...*

আদর্শ শিক্ষক হিসেবে তিনি কতটা জনপ্রিয় ছিলেন যে, তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর শোকসংবাদ পেয়ে দেশে-বিদেশে অবস্থানরত অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী ব্যতীত পরে বহুমুখি কর্মব্যস্ততা নিয়ে বাংলাদেশের **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা**, স্যারের একমাত্র পুত্র ওমির কাছে শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের প্রশংসা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সহানুভূতি জানিয়েছেন বলে প্রকাশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ ২০২৪ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিকে প্রবীণ শিক্ষক মমিন চৌধুরীর স্যারের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের সাথে মহসিন স্যার সহ আরো কতিপয় বিভাগীয় শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন বলে প্রকাশ। ২০২৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী মমিন চৌধুরী স্যার ইন্তেকাল করেছেন এবং ঐ বছরের ২৫ ফেব্রুয়ারী এশিয়াটিক সোসাইটির মিলনায়তনে ইতিহাস বিভাগীয় ১৯তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রয়াত ইতিহাসবিদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

মোহসীন স্যারের শোকাহত পরিবার ঃ

মোহসীন স্যারের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে আমার বিশেষ কিছু বলার নেই। যতটুকু জানি, তিনি একজন আদর্শ স্বামী ও আদর্শ পিতা হিসেবে আমাদের কাছে অনুকরণযোগ্য। স্যারের কর্মজীবনের শেষ দিকে মাত্র চার বছরের ব্যবধানে স্বীয় সহধর্মিনী জেরিনা মোহসীন আলো ও তাদের একমাত্র কন্যা জাবিন মোহসীন সংগীতার বিয়োগব্যথা ভুলে স্বাভাবিক কাজকর্ম করা যে কত কঠিন তা ভুক্তভোগী ব্যতিত অপরকে বোঝানো যায় না। শুনেছি, ক্যানসারে আক্রান্ত বেগম মোহসীন (আলো ভাবী) এর চিকিৎসায় স্বোপার্জিত সবসম্পদ ব্যয় করে অবশেষে ঢাকায় নির্মীত সুন্দর বসতবাড়িটা বিক্রি করে স্ত্রীর সর্বোচ্চ চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। অতপরঃ উত্তরার ৭নং সেক্টরে খরিদকৃত একটা ফ্লাটে শোকাহত পরিবার পরিজন নিয়ে শেষ জীবন কাটিয়েছেন। উল্লেখ্য ২০০৮ খ্রীষ্টাব্দে স্ত্রীকে না ফেরার দেশে পাঠানোর পূর্বে তার একমাত্র কন্যা সংগীতা ইন্তেকাল করেন। কন্যাকে স্যার কত স্নেহ আদর করতেন তার মাত্র একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে ইচ্ছা হয়। পৈত্রিক জেলা রাজবাড়ীর পাংশা উপজেলায় শতবর্ষী (১৯১৮-২০২০) হাবাসপুর কে.রাজ উচ্চ বিদ্যালয়ে সংগীতা পড়ালেখা না করেও উক্ত বিদ্যালয়ে সংগীতার স্মরণে **'সংগীতা'** নামাঙ্কিত এবং ছাত্র শিক্ষকদের মূল্যবান রচনায় সমৃদ্ধ একটি বার্ষিকী প্রতি বছর বের হয়ে আসছে সৌজন্য ও শান্তনা দানের অভিপ্রায়ে।[৭] অন্যেরা কিছুটা মেনে নিলেও ওমির মেয়ে আরদী ও সঙ্গীতার সন্তানেরা আরো অনেকদিন হয়ত তাদের অকালে হারিয়ে যাওয়া দাদা-দাদু ও নানা-নানুর শুন্যতা আজীবন অনুভব করবে।

শেষকথাঃ

গভীর ব্যক্তিত্বসম্পর্ণ, মিতভাষী, অসম্প্রদায়িক আচরন ও নির্মল চরিত্রে আলোকিত ড. কে.এম মোহসীন সারাজীবন অধ্যাপনা ও গবেষনার পাশাপাশি আর্ত-মানবতার সেবা এবং স্কাউট আন্দোলনের সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তার ৭টি গ্রন্থ ও ৩৫টি গবেষণাকর্ম রয়েছে। এই প্রচারবিমুখ নিরব গবেষকের অপ্রকাশিত পুস্তকের কয়েকটি পান্ডুলিপি ও অসংখ্য প্রবন্ধ তার বাসভবনসহ, বিভিন্ন স্থানে, বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকার কথা। মৃত্যুর পরে স্যারের উত্তরার বাসায় গিয়ে এবং অন্যত্র যোগাযোগ পূর্বক পূর্ণ তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারা যায়নি বিধায় 'ড. কে.এ মোহসিনের ইতিহাস চর্চার ধারা ও প্রকৃতি' নিয়ে প্রত্যাশিত রচনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের সম্ভাব্য পরামর্শ ও সহযোগীতা কামনা করছি। ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডন থেকে বৃটিশ শাসনে বাংলাদেশ সম্পর্কিত মরহুমের পিএইচডি সন্দর্ভের আলোকে ২০১৪ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার উত্তরাস্থ আন্তর্জাতিক মানের গবেষনা ও প্রকাশনা সংস্থা বি.আই.আই.টি কর্তৃক প্রকাশিত 'বেঙ্গল ফরম পার্টিশন টু পার্টিশন' (১৯০৫-৪৭) শীর্ষক সর্বশেষ গবেষনা গ্রন্থের রিভিউ* ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশনার পথে প্রক্রিয়াধীন বলে জানি।* প্রয়াত স্যারের 'বেঙ্গল ফরম পার্টিশন টু পার্টিশন' শীর্ষক গ্রন্থের রিভিউ করেন ড.এ.কে.এম ইয়াকুব আলী, প্রফেসর এমিরিটাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রফেসর ড. মুঈনউদ্দিন আহম্মেদ খান, অধ্যাপক (অবঃ), ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।[৮] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে শ্রদ্ধেয় স্যারের আকস্মিকভাবে পরলোকগত কন্যা ও প্রিয়তমা সহধর্মিনী তাদের পছন্দের এই গ্রন্থটির প্রকাশনা দেখে যেতে পারেননি বলে, লেখক তার বক্তব্যে শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন এবং তাদের উদ্দেশ্যে বইটি উৎসর্গ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিপূর্ণ অবসর নিয়ে, ঢাকা ইন্ট্যারন্যাশনাল ইউনিভারসিটিতে প্রথমে অধ্যাপনা ও মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত উপাচার্যের গুরুদায়িত্ব পালনের ব্যস্ততা না থাকলে হয়তো এ জাতীয় প্রকাশনা কর্মাদি আরও আগে সম্পাদিত হতে পারত। পরিশেষে বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতির প্রয়াত কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দসহ আলোচ্য মরহুমের পরলোকগত পরিবার পরিজন বিশেষত তাঁর নিজের পারলৌকিক কল্যাণ কামনান্তে-

তারিখঃ ১৪/০৫/২০২৪

গভীর ব্যক্তিত্বসম্পর্ণ, মিতভাষী, অসম্প্রদায়িক আচরন ও নির্মল চরিত্রে আলোকিত ড. কে.এম মোহসীন সারাজীবন অধ্যাপনা ও গবেষনার পাশাপাশি আর্ত-মানবতার সেবা এবং স্কাউট আন্দোলনের সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তার ৭টি গ্রন্থ ও ৩৫টি গবেষণাকর্ম রয়েছে। এই প্রচারবিমুখ নিরব গবেষকের অপ্রকাশিত পুস্তকের কয়েকটি পান্ডুলিপি ও অসংখ্য প্রবন্ধ তার বাসভবনসহ, বিভিন্ন স্থানে, বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকার কথা। মৃত্যুর পরে স্যারের উত্তরার বাসায় গিয়ে এবং অন্যত্র যোগাযোগ পূর্বক পূর্ণ তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারা যায়নি বিধায় 'ড. কে.এ মোহসিনের ইতিহাস চর্চার ধারা ও প্রকৃতি' নিয়ে প্রত্যাশিত রচনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের সম্ভাব্য পরামর্শ ও সহযোগীতা কামনা করছি।

কারিগরি শিক্ষায় ময়মনসিংহ বিভাগে সেরা

মডার্ণ ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি

ইনস্টিটিউট কোড: ৫৮০৫৮

প্রতিষ্ঠাতা: প্রফেসর ড. ইঞ্জি. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধিনে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে
৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে

ভর্তি চলছে

বিভাগ সমূহঃ সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল ও কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং

বিশেষ সুবিধাঃ গাজীপুর এম আই এসটিতে ব্যবহারিক ক্লাস এবং
গাজীপুর এম আই এস টি পরিচালিত দক্ষতা প্রশিক্ষণ শিল্পে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা

যোগাযোগঃ ০১৭৪৫৭৯৯৯৮৪, ০১৭৬৬৫৫৭১৮১, ০১৩১৭৭৩০৩৩০, ০১৭৩৯৩৯৫

মদন রোড, বনুয়াপাড়া, নেত্রকোনা

জামিয়া সাবিলুর রাশাদ গাজীপুর/Sabilur Rashad University Gazipur

কুরআন-সুন্নাহর আদর্শে ও ইসলামী স্বর্ণযুগের আদলে মানবজাতি ও সৃষ্টিকুলের সার্বিক কল্যাণে দক্ষ ও নীতিবান সত্যিকার সেবক জনবল উন্নয়নে পূর্ণাঙ্গ কওমী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠাতা, সভাপতি ও রেক্টর: প্রফেসর ড. ইঞ্জি. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান

ভর্তি চলছে/চলবে

অনুষদ (Faculty/ School)	পর্যায়/বিভাগ/কোর্স (Level/Dept./Course)
১. দ্বীনিশিক্ষা (Religious Study)	নাজেরা, নুরানী, হিফজ, মাদানী নেসাব ও কিতাব বিভাগ (দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত)
২. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা (Informal Education)	বয়স্ক/সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের জন্য আকিদা ও পূর্ণাঙ্গ ইসলাম পরিচিতি, জরুরী ইলম ও ঘরোয়া শিক্ষা
৩. কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (Technical Education & Training)	৩মাস/৬মাস ব্যাপী বিভিন্ন টেকনিক্যাল কোর্সের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান
৪. মৌলিক শিক্ষা (Basic Education)	১ম শ্রেণি হইতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত
৫. ব্যবসায় শিক্ষা (Business Studies)	১.৫ বৎসর মেয়াদী MBA/M.Phill কোর্স

অনুষদ (Faculty/ School)	পর্যায়/বিভাগ/কোর্স (Level/Dept./Course)
৬. টেকসই নেতৃত্ব ও শান্তি শিক্ষা Sustainable leadership and Peace Study	১.৫ বৎসর মেয়াদী M.Phill/৩বৎসর মেয়াদী Ph.D. কোর্স।
৭. সুস্থ রাজনীতি ও সুশাসন (Sound Politics & Good Governance)	
৮. দাওয়া ও সমাজ কল্যাণ (Dawah and Social Welfare)	
৯. সমর বিজ্ঞান ও কৌশল (Military Science & Technology)	
১০. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (Science & Technology)	
১১. মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (Aerospace Science & Technology)	

পূর্ব দেশীপাড়া, ১৯নং ওয়ার্ড, গাজীপুর মহানগর।
মোবা: ০১৭১৫-১৮৬০০৪, ০১৮৮০-৭৫০৩০৯, ০১৬৮৭-৪৪০৩৯১

Regd. No- 4027, The Monthly "ITIHAS ONNESHA" 21th year vol. 1, Jaista-Ashar 1431 June-July 2024, Price TK. 30
186 Inner Circular Road, Arambag, Motijheel, Dhaka-1000, Bangladesh

২৬ তম বর্ষে পদার্পণ

স্থাপিত: ১৯৯৮ইং

MIST GAZIPUR

ভর্তি চলছে

৪ বছর মেয়াদী
ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সসমূহ

- ইলেক্ট্রিক্যাল
- অটোমোবাইল
- সিভিল
- আর্কিটেকচার
- কম্পিউটার
- ইলেকট্রনিক্স
- টেক্সটাইল
- টেলিকমিউনিকেশন
- মেকানিক্যাল
- ফুড
- সার্ভেয়িং

দেশের একমাত্র
ইনস্টিটিউট যা
শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নে
সংযুক্ত
দক্ষতা উন্নয়ন শিল্প
পরিচালনা করে

গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য On-Campus Job এর ব্যবস্থা রয়েছে

মডেল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি লিঃ

ভর্তির যোগ্যতা: দেশের যে কোন শিক্ষাবোর্ড হতে যে কোন শিক্ষাবর্ষে এসএসসি বা সমমান পরিক্ষায় উত্তীর্ণ।

[illegible], ঢাকাস্থ [illegible], গাজীপুর-১৭০৭

মোবা: ০১৬১৯-৩৭২১৭২, ০১৬১৯-৩৭২১৭৩, ০১৮৩৯-৯১১৬২৫ (অধ্যক্ষ)